

ওমর খৈয়াম

সুরেশচন্দ্র নন্দী

প্রণীত

ইতিহাসাচার্য্য

স্যর যদুনাথ সরকার, কে-টি, সি-আই-ই

লিখিত ভূমিকা-সম্বলিত

বসুমতী সাহিত্য মন্দির

(বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড)

১৬৬, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৭০০০১২

বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড
১৬৬, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০১২



মূল্য—আট টাকা

শ্রীমণীন্দ্রলাল দত্ত কর্তৃক
বসুমতী প্রেস হইতে
মুদ্রিত ও প্রকাশিত



পরম শ্রদ্ধাস্পদ

ইতিহাসাচার্য্য

স্যর যদুনাথ সরকার কে-টি, সি-আই-ই

করকমলেষু—

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের অভিমত :

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

ইদানীং আমার শরীর অপটু। এই কারণে আপনার পুস্তিকাখানি রাখিয়া দিয়াছিলাম যে সুস্থ হইলে ধীরে ধীরে পড়িব। কিন্তু সেদিন খুলিবা-মাত্র আর পড়িবার লোভ সামলাইতে পারিলাম না। কয়েক দিনে অল্প অল্প করিয়া আদ্যোপান্ত পড়িয়া ফেলিলাম। বাস্তবিক বাংলা-সাহিত্যকে আপনি একটি অপূর্ব্ব রত্ন উপহার দিলেন। "ওমর খৈয়াম" বুঝিতে হইলে সেই সময়ের কি প্রকার আবেষ্টন ও পারিপার্শ্বিক অবস্থায় মধ্যে কবি লালিত ও বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন, তাহা বিশদরূপে জানা আবশ্যক। এই হিসাবে "মুসলিম দর্শনে গ্রীক প্রভাব" পরিচ্ছেদটি বড় শিক্ষাপ্রদ হইয়াছে। এই পুস্তক লিখিতে আপনি যে কত গ্রন্থ পাঠ করিয়া তাহার মর্ম্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন, তাহা পাদটীকা দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। আমি সঙ্কেত পাইয়া Imperial Library হইতে Arabic Thought and its Place in History, by De Loay O' Lary ও Literary History of Arabs by Nicholson আনাইয়া পাঠ করিতেছি। বাংলা-সাহিত্য আজ গল্প, উপন্যাস ও নভেল প্লাবিত। এককথায় বলিতে গেলে, কথাসাহিত্য বাদ দিলে বাংলা-সাহিত্যের কিছুই থাকে না। আপনার "ওমর খৈয়াম" এই জন্য বড়ই আদরের সামগ্রী। আশা করি, সাহিত্য-সেবিগণ ইহার রসপানে পরিতৃপ্ত হইবেন।

ইউনিভার্সিটি কলেজ অব
সায়েন্স
কলিকাতা
তাং—২।৪।৩১

বিনীত—
শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়

ওমর খৈয়াম

জীবিকা-সংগ্রাম-ক্ষেত্রে যুধ্যমান দরিদ্রের ঘরে
জন্মিয়া, মনীষা-শীর্ষে উঠেছিলে বিধাতার বরে ;
সৃষ্টির মরম-লীন দ্বৈত-হীন একেতে প্রত্যয়
অন্তরে প্রদীপ্ত রাখি' জ্ঞান-রাজ্য করে' গেছ জয় ;
ব্যাখ্যাত জীবন-তত্ত্ব, ছিল সত্য কেতাবে কোরানে,
তুমি তবু অর্থ লাগি, চেয়েছিলে বিশ্ব-গ্রন্থ-পানে ।

●

কালের বিশাল বক্ষ বিদারিয়া শাণিত গণিতে,
দেখে গেছ—কী বীজাণু প্রবাহিত তাহার শোণিতে ;
ব্যাপ্তিরে শতধা করি' জ্যামিতির রেখা-শরজালে
পরীক্ষিলে—কোন্ তথ্য লীলায়িত তা'র অন্তরালে ;
বিকল-প্রাণের কল বায়ু-জল-ওষধির সাথে
যুক্ত কোন্ রসায়নে—দেখিলে তা' ধ্যান-নেত্র-পাতে ।

●

রন্ধ্রে রন্ধ্রে উদ্ঘাটিয়া নক্ষত্রের জ্যোতির্ময় দ্বার,
দ্যুলোকের নিমন্ত্রণ নিয়ে যবে এল অন্ধকার—
বাহিরিলে মহোল্লাসে, শুনিতে কী আলোকিত বাণী
জ্যোতিষ্কের লীলাচক্রে শূন্যে শূন্যে করে কানাকানি ।
মথিয়া জীবন-সিন্ধু—সু-চিহ্নিত সুধা-বিষ তার
কবিতার পানপাত্রে পিপাসুরে দিলে উপহার ।

●

অন্তিমে, চরম-অর্থে কেন্দ্রীভূত একটি নতি-তে
জীবন আহুতি দিলে না-জানি-কি-পরমা-জ্যোতিঃতে—
ভেসে এল শেষ কথা—"অন্তরে তোমারি সন্ধান
করেছি বিচিত্র পথে…আজ বন্ধু…অর্ঘ্য লও প্রাণ"—
নিমীলিত নেত্রযুগ সৌর-দৃশ্যে খুলিল না আর,
শিষ্যেরা মাটির মা'কে সমর্পিল মর্ত্যদেহ তার ।

—শ্রীবিজয়কৃষ্ণ ঘোষ

আত্মকথা

বিভিন্ন সময়ে 'প্রবাসী', 'বসুমতী', 'ভারতবর্ষ', 'কল্লোল' প্রভৃতি মাসিকে প্রকাশিত ওমর খৈয়াম সম্পর্কীয় প্রবন্ধগুলি আবশ্যকমত সংশোধিত হইয়া এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইল। যে সকল পুস্তক হইতে ওমর-সম্বন্ধীয় তথ্য সংগ্রহ করা হইয়াছে, তাহাদের সংখ্যাবাহুল্য পৃথক পৃথক ভাবে কৃতজ্ঞতা স্বীকারের পরিপন্থী হওয়ায় পাদটীকার মাধ্যমে ঋণের নিদর্শন-রূপে দেখানো গিয়াছে। ইতিহাসাচার্য্য পরম শ্রদ্ধাস্পদ স্তর যদুনাথ সরকার কে-টি, সি-আই-ই মহোদয় আমার এই যৎসামান্য গ্রন্থের মূল্যবান ভূমিকা লিখিয়া এই নগণ্যের ললাটে রাজটিকা পরাইয়া সম্মানিত, উৎসাহিত এবং এই পুস্তকের মূল্য বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছেন। এজন্য তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম।

এই পুস্তকে ব্যবহৃত 'রুবাইগুলি' সুলেখক বন্ধুবর শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ ঘোষের অনূদিত 'রোবাইয়াৎ' ও তাহার অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি হইতে গৃহীত। তিনি ওমর খৈয়ামের উদ্দেশে একটি কবিতা লিখিয়া এবং অন্যান্য সাহায্যদানে পুস্তকের সৌষ্ঠব-বৃদ্ধির দিকেও প্রচুর সহায়তা করিয়া অনুগৃহীত করিয়াছেন।

ভারতবর্ষ সম্পাদক অগ্রজপ্রতিম রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত জলধরদাদা ও কল্লোল সম্পাদক বন্ধুবর শ্রীযুক্ত দীনেশরঞ্জন দাশ, যথাক্রমে কবি ওমর, ওমর খৈয়ামের সমাধি এবং জ্যোতির্বিদ ওমরের ব্লক ব্যবহার করিবার অনুমতি দিয়া আমাকে অনুগৃহীত করিয়াছেন।

[signature]

২২, নং ছুতারপাড়া লেন,
কলিকাতা, ভাদ্র, ১৩৩৬

নিবেদন

পরমপূজ্য পিতৃদেব রচিত 'ওমর খৈয়াম' গ্রন্থখানির তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হল। বইখানি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩৩৬ সালে। দীর্ঘকাল পরে মাসিক বসুমতীর তদানীন্তন সম্পাদক ও প্রকাশন বিভাগের অধিকর্তা শ্রদ্ধেয় প্রাণতোষ ঘটকের আগ্রহে ১৩৭০ সালে দ্বিতীয়বার মুদ্রিত হয়। প্রথম প্রকাশের সময় সাহিত্যজগতে বইখানি যেমন সাড়া জাগিয়ে ছিল, দ্বিতীয়বার প্রকাশের সময়ও ঠিক তেমনি আলোড়ন সৃষ্টি করে। কয়েক বছরের মধ্যেই বইখানি নিঃশেষিত হয়ে যায়। তৃতীয় মুদ্রণের জন্য বারবার তাগিদ আসে বিদগ্ধ পাঠকবর্গের কাছ থেকে।

এবার গ্রন্থের পরিশিষ্টে কয়টি বিষয় সন্নিবেশিত করা হল, প্রথম গ্রন্থকার কর্তৃক অনূদিত (ই. এইচ. হুইনফিল্ডের অনুবাদ অনুসরণে) সাতাশটি রুবাই, দ্বিতীয় গ্রন্থকারের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও একটি সুদৃশ্য চিত্র। এবার গ্রন্থের যথাস্থানে দেওয়া হল কবি ওমর খৈয়াম, জ্যোতির্বিদ ওমর খৈয়াম ও ওমর খৈয়ামের সমাধির চিত্র। রুবাইগুলি প্রথম প্রকাশিত হয় আজ থেকে বাহান্ন বছর আগে অধুনালুপ্ত "বাঁশরী" মাসিকপত্রে। সংক্ষিপ্ত লেখক পরিচিতিটি লেখকপুত্র কর্তৃক রচিত। নির্ঘণ্টটি প্রস্তুত করেছেন লেখকের পৌত্র শ্রীমান্ সুব্রতকুমার নন্দী। গ্রন্থের শ্রী ও সৌন্দর্য বর্দ্ধনে নানাভাবে সহায়তা করেছেন অগ্রজপ্রতিম প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীশৌরীন্দ্র কুমার ঘোষ। এঁদের সকলকে আমার সকৃতজ্ঞ অভিবাদন জানাই।

নতুন সংযোজনগুলি আশা করি গ্রন্থের শ্রী এবং সাহিত্যিক মূল্য বৃদ্ধি করবে এবং বিদগ্ধ পাঠক সাধারণের মনোরঞ্জন করতে সক্ষম হবে।

১৬, কালিদাস লাহিড়ী লেন,
কলিকাতা-৩৬
৮ই আষাঢ়

বিনত—
দীপঙ্কর নন্দী

সূচীপত্র

দশম পরিচ্ছেদ

একাদশ পরিচ্ছেদ

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

পরিশিষ্ট

ভূমিকা

স্যর যদুনাথ সরকার, কে-টী, সি-আই-ই লিখিত

প্রাচীনকালে ভূমধ্যসাগরের পাশের দেশগুলিতে যে সভ্যতার বিকাশ হয়, তাহা ক্রমে পূর্ণতা লাভ করিয়া, রোম-সাম্রাজ্যের সাহায্যে সভ্যজগৎ ছাইয়া ফেলে; কিন্তু পরে ঐ সাম্রাজ্যের পতনের সঙ্গে সঙ্গে সে সভ্যতা লোপ পায়। আবার, কয়েক শতাব্দী অতীত হইলে, মধ্য-যুগের শেষে বর্ত্তমান ইউরোপীয় সভ্যতার আবির্ভাব এবং ক্রমবিকাশ হইয়াছিল। সময়ের হিসাবে এই দুই সভ্যতার মধ্যবর্ত্তী হইয়া আরব-সভ্যতা, সেতুর মত এই পুরাতন ও নূতনকে যোগ করিয়া দিয়াছিল, এক হইতে অপরে পৌছান মানবজাতির পক্ষে সম্ভব করিয়াছিল। কারণ, জগতে হঠাৎ-সৃষ্টি বলিয়া কিছুই নাই; প্রত্যেক সভ্যতাই পূর্ব্ববর্ত্তী সমস্ত সভ্যতার নিকট কমবেশী ঋণী; তাহাদের অঙ্গগুলি পরিবর্ত্তিত পরিবর্দ্ধিত করিয়া নিজের কাজে লাগাইয়াছে এবং কালক্রমে নিজে রূপান্তরিত হইয়া পরবর্ত্তী যুগের সভ্যতার বিকাশে সাহায্য করিয়াছে। কোন যুগেই মানব একা দাঁড়ায় না, সে পিতার পুত্র এবং পুত্রের পিতা।

সুতরাং, যেমন নৃতত্ত্ববিদেরা দেখাইয়াছেন যে অবিমিশ্র-রক্তের কোন জাতি নাই, তেমনি ইতিহাস প্রমাণ করিতেছে যে, সব সভ্যতাই একটি মিশ্র-দ্রব্য, নানা স্থান নানা যুগ হইতে ধার করা অংশ দ্বারা গঠিত। এই জন্য আরব-সভ্যতা শুধু মুসলমানদের নিজস্ব সম্পত্তি অথবা একটি জাতিবিশেষের গৌরবের সামগ্রী নহে; ইহাতে জগতের সকলেরই স্বার্থ আছে। আমরা ইহার নিকট ঋণী এবং ইহা আরব নহে এমন জাতি—যেমন, গ্রীক, হিন্দু, আর্য্য-ইরাণীর পূর্ব্বপুরুষদের নিকট ঋণী। এই আরবেরা না থাকিলে সেই প্রাচীন সভ্যতা লোপ পাইত, বর্ত্তমান জগতকে আবার সব জিনিষ নূতন করিয়া গড়িতে হইত, ইহাই আরবজাতির জগতে প্রতিষ্ঠার কারণ।

এই আরবজাতির ইতিহাস ও সভ্যতা শত শত বৎসর ধরিয়া ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা অতি গভীর বিস্তৃত ও সূক্ষ্মরূপে চর্চ্চা করিয়াছেন। তাহার পূর্ব্বে এই বিষয়ে আমাদের জ্ঞান অত্যন্ত কম ও কাঁচা ছিল; অন্ধ প্রশংসা, গোঁড়ামীর বিদ্বেষ, অথবা নবলের নবল ইহার ভিত্তি ছিল। কিন্তু এখন আদিতম ঐতিহাসিক উপাদানগুলির বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে পরীক্ষা ও প্রকাশের ফলে আমাদের জ্ঞান এখন সত্যের দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত, সূক্ষ্ম অথচ পূর্ণাঙ্গ এবং সর্ব্ব বিভাগে ব্যাপক। প্রাচীন কাঁচা লেখার দৃষ্টান্ত **Draper's History of the Intellectual Development of Europe**, আর তাহার ইংরাজী অনুবাদ আমীর আলীর **History of the Saracens**-এ।

এই নবীন ঐতিহাসিক-তত্ত্ব এতদিন পর্য্যন্ত ফরাসী ও জর্ম্মন ভাষায় আবদ্ধ ছিল। অল্প কয়েক বৎসর হইল **Encyclopaedia of Islam** ইংরাজীতে বাহির হওয়ায়, অধ্যাপক ব্রাউন প্রমুখ সাহেবের মৌলিক লেখায়, এবং জর্ম্মন ইস্‌লাম-তত্ত্ববিদ্‌গণের গ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদ আরম্ভ হওয়ায়, ইংরাজী ভাষাবিদেরা ইহার অনেকটা আস্বাদ পাইতেছেন।

এই নব্য সংশোধিত জ্ঞানের বাঙ্গলায় প্রচার আবশ্যক। জগতের জন্য ইসলাম কি করিয়াছে তাহা জানিতে হইলে আমীর আলীর গ্রন্থের বাঙ্গলা অনুবাদের উপর নির্ভর করিবার দিন চলিয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র নন্দীর "ওমর খৈয়াম" এই হিসাবে বিশেষ মূল্যবান। ইহাতে ওমরের কাব্যের লালিত্য ও দর্শনের দিগ্ধতা প্রভৃতি বিষয়ের বিচার আছে বটে, তাহা অন্যত্রও বাঙ্গলায় আলোচনা হইয়াছে। কিন্তু এই গ্রন্থে আরব-সভ্যতার বিকাশ, জ্ঞানের বিভাগগুলি, এবং প্রত্যেক বিভাগে পূর্ব্ব-পরের কি সম্বন্ধ তাহার বর্ণনা ও তুলনামূলক সমালোচনা করিয়া এবং নবীনতম ও প্রামাণিক গবেষণাপূর্ণ গ্রন্থগুলির তথ্য ও মত

উদ্ধৃত করিয়া, লেখক বঙ্গভাষার ইতিহাস-বিভাগের সম্পদ বৃদ্ধি করিয়াছেন। মধ্যযুগে পশ্চিম এসিয়ার সভ্যতার ইতিহাস হিসাবে এই বইখানি বঙ্গভাষায় নবীনতম, সম্পূর্ণ এবং শ্রেষ্ঠ।

ওমরের সময়ে খোরাসানে যে সর্ব্বতোমুখী সভ্যতা দেখা দিয়াছিল, তাহার সুখ-পাঠ্য ও বিশুদ্ধ বর্ণনা এবং সমালোচনা বিস্তৃতভাবে এই গ্রন্থে দেওয়া হইয়াছে। যাঁহারা 'ওমর' বলিতে শুধু বুলবুল ও গোলাপ, মদিরা ও সাকী-র কথা ভাবেন, তাঁহারা দেখিবেন যে লোকটা কবি ও ভোগী মাত্র ছিল না,—কঠোর গণিতবিদ এবং গভীর দার্শনিকও। ওমরের প্রতিভার প্রতি ন্যায়বিচার করিবার জন্য আমরা লেখকের নিকট ঋণী।

ওমরের কবিতার শিক্ষা যে ভোগতন্ত্র নহে,—লোকটা যে "পিত্বা পিত্বা পুনঃ পিত্বা পপাত ধরণীতলে"র দৃষ্টান্ত নহে, তাহা এই গ্রন্থে প্রমাণ করা হইয়াছে। নন্দী মহাশয় লিখিতেছেন,—

"তাঁহার চতুষ্পদীগুলি জীবন ও জগতের বিরাট দায়িত্ব-কথা অতি উজ্জ্বলভাবে চক্ষের সম্মুখে তুলিয়া ধরে * * * সংসারের মোহজালে আবদ্ধ হইয়া ধরণীকেই আবাসস্থল মনে করায় তিনি আপন আত্মাকে তীব্র তিরস্কার করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে আত্মা এক অপার্থিব শক্তি, যাহা পার্থিব আধারের বিলোপে মুক্ত হইয়া উচ্চতর পরিণতি লাভ করিবে। * * * খৈয়ামের আত্ম-অনুভূতি কোন নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মের বা সমাজের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ ছিল না।" (২ পৃষ্ঠা)

আশা করি, এই গ্রন্থের প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে ওমর এবং মুসলমান-জগৎ সম্বন্ধে অনেক ভ্রান্ত বিশ্বাস বঙ্গদেশ হইতে দূর হইবে।

ওমর খৈয়াম

সূচনা

এই দুঃখ-দৈন্য-ক্লিষ্ট ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ সংসার-বক্ষে, জগৎ-জোড়া বিবর্ত্তের মাঝখানে, জীবন-যুদ্ধে ক্ষত ক্লান্ত মানুষের প্রাণে একটা নিরুদ্বেগ আমোদ বা একটু অনাবিল সুখ-সম্ভোগের স্পৃহা স্বভাবতঃই জাগিয়া উঠে। সকলেই আপন আপন রুচি অনুসারে নিত্য-নৈমিত্তিক জীবনের বৈচিত্র্য-হীনতা, অবসাদ ও ক্লান্তিকে যতদূর সম্ভব লঘু করিয়া আনিবার প্রয়াস পাইয়া থাকে।

এ সংসারে যাহা কিছু আছে, সমস্তই অনিত্য ও এক অলঙ্ঘ্য নিয়ম-শৃঙ্খলে আবদ্ধ। আজ যাহা নূতন, কাল তাহা পুরাতন, পরে তাহা ধ্বংস-প্রাপ্ত। আজ যাহা দেখিয়া প্রাণ আনন্দ-চঞ্চল, দুদিন পরে তাহাই বিশেষত্বহীন, পরে তাহা বিলুপ্ত। এই জন্যই, যখন চঞ্চল যৌবনের উদ্দাম গতিবেগে ভাটা পড়ে, প্রভাতের সোনালী স্বপ্ন গোধূলির অন্ধকারে ধূসর হইয়া আসে—চিন্তাপ্রবণ ভাবুক হৃদয় মাত্রেই সে সময় কতকগুলি চিরন্তন প্রশ্ন স্বতঃই উদিত হয়। পৃথিবী কি, আমরা কি, আমাদের জীবন কি, তাহার উদ্দেশ্যই বা কি? কোথা হইতে কেমন করিয়া আসিয়াছি—আবার কোন্‌খানেই বা যাইতে হইবে? জীবন-পথের আরম্ভ কোথায়—পরিসমাপ্তিই বা কোথায়? এই চিরন্তন প্রশ্নগুলি

সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতেই বারংবার মানব-চিত্তে উঠিতেছে অথচ এই দুর্জ্ঞেয় প্রহেলিকার, এই জটিল সমস্যার সমাধান করিতে গিয়া মানব-মন বিভ্রান্ত, অবসন্ন, এমন কি পথভ্রষ্টও হইয়া পড়িতেছে। পারস্যের বৈজ্ঞানিক-কবি ওমর খৈয়ামও তাঁহার অনন্যসাধারণ মনীষা ও বিদ্যাবত্তার ভিতর দিয়া এই সকল প্রশ্ন তুলিয়াছেন এবং উহাদের সহজ সমাধানে সাধারণের সহায়তা করিয়াছেন।

তাঁহার শ্রুতিমধুর ও যুক্তি-নিপুণ চতুষ্পদীগুলি কখনও বা করুণ সুরে, কখনও বা হাস্যকৌতুকের ভিতর দিয়া জীবন ও জগতের বিরাট দায়িত্বের কথা অতি উজ্জ্বলভাবে চক্ষের সম্মুখে তুলিয়া ধরে। এখানে আমরা দেখি যে মানুষ একদিকে যেমন দীন, নিঃসম্বল ও অসহায়, অন্যদিকে সেইরূপ আবার বিঘ্নবিজয়ী, নির্ভীক ও বিশ্ব-শাসক। কেন না "আত্মা" বলিয়া একটি অমূল্য সম্পদ তাহার নিজস্ব, আর সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডই আত্মার অনুশাসনে পরিচালিত। প্রাণিজগৎ, উদ্ভিদজগৎ, পর্ব্বত, নির্ঝর, এককথায় দৃশ্যমান তাবৎ বস্তুতেই আত্মার সত্তা ও তাহার অপ্রতিহত প্রভাব দেদীপ্যমান। আত্মার অনুভূতিই একমাত্র সত্য—অন্য সমস্তই অনিত্য অলীক।

খৈয়ামের দার্শনিক দৃষ্টি এই আত্মার সত্তা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিয়াছিল; তাই সংসারের মোহজালে আবদ্ধ হইয়া ধরণীকেই আবাসস্থল মনে করায় তিনি আপন আত্মাকে তীব্র তিরস্কার করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে আত্মা এক অপার্থিব শক্তি, যাহা পার্থিব আধারের বিলোপে মুক্ত হইয়া উচ্চতর পরিণতি লাভ করিবে। কিন্তু এই আত্মাকে জানিতে হইলে, প্রথমেই সর্ব্বতোভাবে আত্মত্যাগ আবশ্যক; ত্যাগের সাধনা ব্যতীত ইষ্ট-লাভ অসম্ভব, আর আত্মত্যাগে অপারগ হইলে আত্মার উচ্চ পরিণতিও অসম্ভব।

খৈয়ামের আত্ম-অনুভূতি কোন নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মের বা সমাজের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ ছিল না—উহা সেই মূল সত্যকে আশ্রয় করিয়া অভিব্যক্ত, যাহা প্রচলিত ধর্ম্মের যে কোন আকারে সমানভাবে প্রযোজ্য। কি নৈতিক, কি আধ্যাত্মিক, কি জড়বিজ্ঞান-বিষয়ক, সকল ব্যাপার ও অবস্থাতেই উহা খাপ খায়। আত্মার বিভূতি হয় সত্যে, অথবা মিথ্যায়, অথবা অবস্থাবিশেষে ঐ দুয়েরই সংমিশ্রণে সপ্রকাশ। প্রত্যেক বৃহৎ ব্যক্তিত্ব, প্রত্যেক শক্তিদৃপ্ত অস্তিত্ব, হয় সত্য না হয় মিথ্যার প্রতিমূর্ত্তি এবং পরিণামে ঐ আত্মারই একান্ত দ্যোতক। এই আত্মা নশ্বর দেহের পরিসমাপ্তিতে আপন প্রবণতানুরূপ হয় ধর্ম্মরাজ, না হয় পাপহারীর হস্তে আত্মসমর্পণ করে। আর খৈয়ামের মতে ঐ দুই-ই সেই এক সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বর; তিনিই ইষ্ট, তিনিই অনিষ্ট, তিনিই মঙ্গল, তিনিই অমঙ্গল,—এককথায় তিনিই সকল বস্তুর আধার। এই ব্যাপারে কবি অতি স্পষ্ট করিয়া বলিতে চান যে, ভগবৎ-ইচ্ছা ভিন্ন কোন কিছুই হইতে পারে না—বৃক্ষের শুষ্ক পত্রটি পর্য্যন্ত পড়িতে পারে না এবং মানব-প্রাণের সমুদায় আকাঙ্খা ও চরম পরিণতি সেই ইচ্ছাময়ের ইচ্ছারই অধীন; অতএব দুঃখ-সুখ, আনন্দ-বেদনা, মঙ্গল-অমঙ্গল, যাহাই দেখা দিক না কেন, সমস্তই ভগবানের দান মনে করিয়া অবনত ও নিরুদ্বেগ চিত্তে গ্রহণ করাই শ্রেয়।

ঈশ্বরের উপর খৈয়ামের একান্ত নির্ভর তাঁহার কোমলকান্তপদাবলীকে অমর সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত করিয়া দিয়াছে। অনুতপ্ত হৃদয়ের গভীরতম তলদেশ হইতে আপন বিক্ষুব্ধ হৃদয়-মনের জন্য তিনি ভগবানের করুণা ভিক্ষা করিয়াছেন এবং নিষিদ্ধ-সুখান্বেষণে-ধাবমান চরণ ও পানপাত্রবিধৃত করটিকে কঠোর বিচারদৃষ্টিতে না দেখিবার জন্যই আবেদন জানাইয়াছেন।

মানুষের সহায়তা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতাই অমর খৈয়ামের সর্ব্বোচ্চ

বিশেষত্ব। দেশবাসী ও ধর্ম্মান্ধ মোল্লা সম্প্রদায় কর্ত্তৃক পদে পদে প্রপীড়িত ও লাঞ্ছিত হইয়াও, কখনও তিনি মানুষকে ধর্ম্ম-গুরুরূপে অঙ্গীকার করেন নাই। সত্যকে তিনি অতি নিবিড়ভাবে অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং একমাত্র ভগবানের অধিকারেই উহাকে দেখিয়াছিলেন। মানুষের জীবন পদ্মপত্রস্থ জলবিন্দুর মত ক্ষণস্থায়ী,—তাহার শৌর্য্য, বীর্য্য, ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি নিতান্তই নশ্বর—তাই কবির বিদ্রোহী কণ্ঠ বারংবার প্রবল বিক্রমে ঘোষণা করিয়াছে যে—কখনই তিনি মানুষের দ্বারে সাহায্যলাভের আশায় হাত পাতিবেন না; পরন্তু, শুধু তাঁহারই আশায় থাকিবেন, যিনি চিরন্তন, অবিনশ্বর, সর্ব্ববিধ সাহায্যদানে চির-প্রসারিত-কর ও অনাদি আনন্দের সত্যতম ও নিত্যতম উৎস।

সাধারণ নিত্য-প্রত্যক্ষ বস্তুগুলিকে উপলক্ষ্য করিয়া কবি যে চমৎকার দার্শনিক-তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার প্রতিভা ও বৈশিষ্ট্য পরম উপভোগের সামগ্রী হইয়া উঠিয়াছে। মৃৎপাত্রের প্রতি বালুকণায় লোকান্তরিতা রূপসীর মোহন হাস্য ও মধুর আস্য, প্রতি ইষ্টকখণ্ডে কোনো-না-কোনো সম্রাটের মস্তক; রূপ-যৌবনের গরিমা, ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির মহা পরিণাম, ঐ ধূলিকণা। এই নিত্য পরিবর্ত্তনশীল সীমাহারা ব্রহ্মাণ্ডের চারিদিকেই ভাঙ্গা-গড়ার এক তাণ্ডবলীলা চলিয়াছে —'আমার' বলিয়া আঁকড়িয়া ধরিবার কিছুই কোনদিকে নাই—যেদিকে চাওয়া যায়, সেইদিকে ধ্বংস ও বিরাট শূন্যতার মূর্ত্তিমান অট্টহাস্য! এখানে বাঁচিয়া থাকে, শুধু সত্য।

মানুষ যখন পরিণতবয়সে আপনার যুক্তি ও অভিজ্ঞতার আলোকে এই বিশ্ব-ব্যাপার আলোচনা করিয়া এবং সংস্কারাচ্ছন্ন সমসাময়িক জনমণ্ডলীর অন্ধ মতামত ও আপন পরিবেষ্টনীর বৈচিত্র্য শূন্যতা সম্বন্ধে সচেতন

হইয়া জাগতিক বস্তুনিচয়ের অনিত্যতার বিষয় চিন্তা করিতে বসে—তখন তাহার প্রাণের বেদনাকে নিমজ্জিত করিয়া রাখিবার উপযোগী যে কোন প্রকারের একটা তরল উৎসব আয়োজনের দিকে বুঝিবা স্বভাবতঃই ঝুঁকিয়া পড়ে। শেষে পার্থিব আমোদ-প্রমোদেও যখন সান্ত্বনা পায় না, তখনি সে সর্ব্বশোকতাপহারী ভগবৎ-চিন্তায় আপনার প্রাণ-মন সমর্পণ করে। তাই বলিয়া প্রত্যেক মানুষের হৃদয় স্বভাবতঃই যে ভাগবত-সন্ন্যাসে ভরিয়া উঠে, তাহা নহে। জীবনের এই সঙ্কট মুহূর্ত্তে সুরা-বিলাসে আত্ম-সমর্পণের দৃষ্টান্তও বিরল নহে। অন্ততঃ ওমর খৈয়ামে আমরা এই উভয় দৃষ্টান্তই পাশাপাশি দেখিতে পাই। তাঁহার রুবাই-গুলিতে সুরা ও সাকীর প্রতি ওমরের অত্যুগ্র আকর্ষণ ও আনুরক্তি দেখিয়া বিভিন্ন সমালোচক তাহাকে বিভিন্ন অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন।

বিজ্ঞান ও দর্শনে খৈয়ামের অসাধারণ পাণ্ডিত্য সে যুগে তাঁহাকে জ্ঞানিগণাগ্রগণ্য করিয়া তুলিলেও, এই জগৎসংসার ও তাঁহার স্রষ্টা সম্বন্ধে অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন হইলেও, আপনার অজ্ঞতার বিষয়েই তিনি বারংবার ইঙ্গিত করিয়া গিয়াছেন। বস্তুতঃ মানুষের জ্ঞান যে কিরূপ সীমাবদ্ধ এবং মানুষের অজ্ঞতা যে কত বেশী, তাহা আপন জীবন-ব্যাপী সাধনা ও অভিজ্ঞতার সাহায্যে খৈয়াম মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিয়া গিয়াছেন। খৈয়ামের ঐকান্তিক ভগবৎ-নির্ভরতা অপর সমস্তকেই ছাপাইয়া গিয়াছে। এই ভগবৎ-শক্তি সম্বন্ধে ওমর খৈয়াম সম্পূর্ণ সচেতন এবং তাঁহার এতদ্বিষয়ক উক্তিগুলি অপরের চিত্তাকর্ষক। ভগবৎ-করুণা-ভিক্ষায় অবিশ্রান্ত সুখ ও পরম আনন্দ লাভের জন্য কর্ম্মভারক্লিষ্ট এই দুঃখময় সংসারে ওমর যথেষ্ট করিয়াছেন; তাঁহার সম্বন্ধে বিশ্ব-প্রকৃতির বদান্যতা নিশ্চয়ই অপব্যয়িত হয় নাই; তিনি আপনাকে স্বদেশের সুযোগ্য সন্তান ও জগদ্বাসীর আদরের বন্ধুরূপেই প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন।

খৈয়ামের দর্শন করুণ ও বিষণ্নসুরে জীবনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য যে-ভাবে অভিব্যক্ত করিয়াছে, তাহা নির্দোষ ও অনাবিল আমোদ, অন্যের প্রতি সদয় ব্যবহার, ঐশ্বর্য্য জাঁকজমকে ঔদাসীন্য, গর্ব্বিত ধনী-সম্প্রদায়ের সহিত বাধ্য-বাধক সম্বন্ধ হইতে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ও আত্ম-সন্তোষের আকারেই দেখা দিয়াছে। অনাড়ম্বর জীবন-যাপন, মার্জ্জিত রুচি, উচ্চ চিন্তা, মহৎ-পরিণতির জন্য লক্ষ্য, উদরান্নের দুর্ভাবনায় কাতর না হওয়া (কারণ, ভগবানই উহা যোগাইয়া থাকেন) এবং সত্যানুসন্ধিৎসায় অকাতর পরিশ্রম—এইগুলিই ওমর-দর্শনের প্রচার্য্য। কপটতা বা মিথ্যাচার ওমরের চক্ষে একান্তই জঘন্য ও বিষবৎ পরিত্যাজ্য। নিষ্ঠা ও অনুরাগই সত্যে পৌছিবার একমাত্র সোপান—আর ঐ সত্য, ওমর খৈয়ামের প্রজ্ঞা-দৃষ্টিতে, একমাত্র ঈশ্বরেই বিদ্যমান—অন্য কোথাও নহে—অন্য কোথাও নহে। যাহা কিছু ঈশ্বর হইতে স্বতন্ত্রভাবে অবস্থিত, তাহাই ভ্রান্তি ও মিথ্যা। এককথায়, অদ্বৈতবাদকে বিশ্ববাসীর হিতে প্রয়োগ করাই ওমর-দর্শনের চরম লক্ষ্য। আর এই জন্যই তাঁহার চরম বাণী—

গাঁথেনিকো মাল্য ওমর পুণ্য কাজের মুক্তা দিয়া
পাপ-আগাছাও হৃদয় হ'তে ফেলেনি সে উৎপাটিয়া ;
ব্রহ্ম কৃপায় তাহার দাবী কম তবু নয় কারুর চেয়ে
একেকে যখন তুলেও কভু পড়েনি সে দুই ভাবিয়া।

প্রথম পরিচ্ছেদ

ওমর খৈয়ামের জন্মভূমি

খোরাসান—নিশাপুর

পারস্যের ইতিহাসে খোরাসান ও তাহার রাজধানী নিশাপুর, পারস্যের মধ্যযুগে ও পরে, দর্শন, সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্পকলা, বাণিজ্য ও রাষ্ট্রনৈতিক ব্যাপারের জন্য সবিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল।

ভৌগোলিক বিবর

খোরাসান পারস্যের উত্তর-পূর্ব্ব কোণে অবস্থিত। উত্তরে রুশীয় তুর্কিস্থান ও দক্ষিণে আফগানিস্থানের পার্ব্বত্য প্রদেশ। দক্ষিণ এবং পশ্চিম দিকে পারস্যের অন্যান্য প্রদেশ কীরমান, সেমনান এবং দামঘান।

খোরাসানের উত্তর দিকে রাজধানী নিশাপুর। নিশাপুর পারস্যের মধ্যে অতি প্রাচীন শহর। পিসাদদিয়েন্ বংশীয় শাহ্ তাম্বুরস্ প্রথমে এই নগর প্রতিষ্ঠা করেন (১)। তখন এই নগর 'নিশাপুর' নামে পরিচিত ছিল না। শাহ্ তামুরস্ কর্তৃক এই নগর নির্ম্মিত হইবার পর ভূমিকম্পে ধ্বংস হইয়া যায়। কিছু-কাল পরে পুনরায় ইহা পারস্যের শাহ্ আর দাশির বাপাকান কর্ত্তৃক পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি ইহার 'নি' (২) নামকরণ করেন। তাঁহার পুত্র প্রথম সাপুর খোরাসানের শাসনকর্ত্তা ছিলেন; তিনি পিতার অনুমতিক্রমে

নিশাপুর নগর প্রতিষ্ঠা

১। আজা-ইব-উল-বিলাদান।

২। নি শব্দের অর্থ শহর।

'নি' শব্দের সহিত নিজ নাম "সাপুর" যোগ করিয়া ইহার "নিশাপুর" (সাপুর নগর) নামকরণ করেন।(১)

নিশাপুরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য বিশ্ববিখ্যাত। ভগবান নিশাপুরকে: বিশ্বের রম্য উদ্যান—প্রকৃতিরাণীর লীলাকুঞ্জরূপে রচনা করিয়াছেন। ইহার চতুর্দ্দিক ফল-পুষ্পোদ্যান ও ছায়া-শীতল বৃক্ষবাটিকায় পূর্ণ। নগরের উত্তরদিকস্থ পর্ব্বতগাত্রবাহী অসংখ্য নির্ঝর অবিরাম ঝর ঝর ধারায় নির্ম্মলসলিলা শাকার ক্রোড় আলিঙ্গন করিতেছে। গুলিস্তাঁ বিবিধ বর্ণরাগসমুজ্জ্বল নানা জাতীয় পুষ্প ও বুস্তানের ফলভারাবনত বৃক্ষের প্রত্যেক শাখায় পীচ, ন্যাসপাতি, বাদাম, দ্রাক্ষা, খর্জ্জুর প্রভৃতি নানা জাতীয় সুপক্ক সরস ফলের যেন মেলা বসিয়াছে। চারিধারেই সবুজের ক্ষেত্রে। জলবায়ুও চমৎকার, স্বাস্থ্যের অনুকূল; দেশবাসী স্বাস্থ্যোজ্জ্বল দেহে আনন্দোজ্জ্বল প্রাণে জীবনযাপন করিতেছে। প্রচুর শস্য, প্রচুর ফল. প্রচুর আহার্য্য দান করিয়া ভগবান এ দেশবাসীর কাহারও কোন অভাব রাখেন নাই। সকলেরই হৃদয়—সৌন্দর্য্য-সুষমায় মণ্ডিত। এ স্বপ্নপুরীতে স্বপ্ন-সুন্দরীর মায়াদণ্ডস্পর্শে কাহারও কোন প্রকার অভাব নাই।—সকলেরই ভাণ্ডার পূর্ণ।

প্রাকৃতিক দৃশ্য

মিরগান (শরৎকাল) সময়ে, আপেল, পীচ প্রভৃতি ফল নিশাপুর-কুমারীর গণ্ডদেশের রক্তিম-রাগ চুরি করিয়া রক্তাভ হইয়া শরৎ-সুন্দরীর জয় ঘোষণা করে। আপেল, গোলাপ, পীচ, ন্যাসপাতি, মেহেদি ও পুদিনা পুষ্প এখানে বন-লক্ষ্মীর সুষমা বিস্তার করে। লোলচর্ম্মা জরাগ্রস্তা শীতের পর বসন্ত-সুন্দরী আপন কনক লাবণ্যে খোরাসান—নিশাপুরের সমতলভূমি পুষ্প-ভূষিত করিয়া আবির্ভূত হন।

১। মুজহৎ-উল-কুলাব।

দ্রাক্ষা, পীচ, বাদাম, ন্যাসপাতি, আপেল ও খর্জ্জুর-বৃক্ষের ঘন-পল্লব মধ্যে আত্মগোপন করিয়া বুলবুল্ আপন মনে শিষ দিয়া দিকে দিকে বসন্তোৎসব বারতা ঘোষণা করে ;—সমগ্র দেশটি যেমন হাস্যমুখর, নানা-বর্ণরাগসমুজ্জল প্রস্ফুটিত পুষ্পের এবং সুপক্ক ফলের সৌরভে, ঝরনার অবিরাম জলতরঙ্গ সুরে ও বুলবুলের অশ্রান্ত ঝঙ্কারেও তেমনি ঝঙ্কৃত। কবি-বুলবুলগণও এই মাদকতাপূর্ণ সুর-তরঙ্গের সহিত আপন আপন বীণার ঝঙ্কার মিশাইয়া নিশাপুরের প্রাকৃতিক শোভা-সম্পদের বর্ণনায় আপন আপন কাব্য পূর্ণ করিয়া গিয়াছেন।

খোরাসান—নিশাপুর যে কেবলমাত্র প্রাকৃতিক শোভা-সম্পদের জন্যই বিখ্যাত ছিল, তাহা নহে। অসংখ্য কবি, সাহিত্যিক, দার্শনিক, জ্যোতির্বিদ, চিকিৎসক ও বৈজ্ঞানিকের প্রতিভালোকে খোরাসান ও তাহার রাজধানী নিশাপুর আলোকিত হইয়াছিল। ইঁহারা সকলেই নিশাপুরকে সৌন্দর্য্যের আকর, প্রতিভার সূতিকাগার রূপে বর্ণনা করিয়া ইহার গৌরব প্রচার করিয়া গিয়াছেন।

খোরাসান—নিশাপুর কবিত্বের লীলাভূমি ছিল। খোরাসানী ও নিশাপুরী কবিগণের কাব্য-লীলা-চাতুর্য্যেই পারস্যের প্রথম যুগের সাহিত্য অপূর্ব্ব শোভা সম্পদে অলঙ্কৃত হইয়াছিল। আব্বাস বংশীয় খলিফা এবং গজনীর রাজবংশের রাজত্বকালীন সকল কবিই—মহাকবি পর্য্যন্ত—সকলেই খোরাসান—নিশাপুরের রম্য-কুঞ্জকাননের বুলবুল ছিলেন। অন্ধকবি রূদকী, কীশাই, দকীকী এবং অন্যান্য স্বল্পখ্যাত কবিগণও খোরাসান—নিশাপুরের অধিবাসী ছিলেন। ইঁহাদিগের কবিত্ব-লীলা-স্রোতে খোরাসান—নিশাপুর ভাসমান হইয়াছিল।

খোরাসানী ও নিশাপুরী কবিবৃন্দের কাব্য-লীলা-চাতুর্য্য

বস্তুতঃ, নিশাপুর কবি-দার্শনিক-জ্যোতির্বিদ-চিকিৎসক-বৈজ্ঞানিকের

প্রতিভা বিকাশের সম্পূর্ণ অনুকূল ছিল বলিয়াই পারস্যের প্রথম ও দ্বিতীয় কবি পয়গম্বর (১) যথাক্রমে ফির্দৌসী ও আন্ওয়রী ফির্দৌসী-সাহিত্য গুরু কবি আসাদী, সুফী-কবি ফরিদউদ্দিন আত্তর, কবি নিজাম-ই-আসিরী, কবি-সাহিত্যিক নিজামী অরুসি, কবি রাফি-ই-নিশাপুরী, জ্যোতির্বিদ হকিম-ই-মওসিলি, কবি-জ্যোতির্বিদ ওমর খৈয়াম, দূরবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কারক বৈজ্ঞানিক হাবান, সাহিত্যিক ও রাজনীতিবিৎ হাসান ইবনে ইশাক্, দার্শনিক আবু ইমাম গজ্জালি, ঐতিহাসিক ও সাহিত্য-সমালোচক অল-বৈহাকী, দার্শনিক ও দার্শনিকগণের বিবরণী লেখক অল-শহরস্তানি প্রমুখ অসংখ্য মনীষী জন্মগ্রহণ করিয়া খোরাসান ও তাহার রাজধানী নিশাপুরকে চিরগৌরবান্বিত করিয়া "প্রতিভার সূতিকাগার" বাক্যের সার্থকতা সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন।

প্রতিভার সূতিকাগার

নিশাপুরের শিক্ষাবিস্তৃতি এতই সুলভ ছিল যে, দেশে অশিক্ষিত ছিল না বলিলে অত্যুক্তি করা হয় না। নিশাপুরের আটটি মাদ্রাসায় শিক্ষাদান করা হইত। এই সমস্ত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে তৎকালীন যুগশ্রেষ্ঠ বিচক্ষণ বিদ্বানগণ মুসলিম ধর্ম্মতত্ত্ব, বিজ্ঞান, দর্শন ও সাহিত্য অধ্যাপনা কার্যে নিযুক্ত হইতেন এই কারণেই সমগ্র পারস্যের জনসাধারণ ও ধনী আমীর-ওমরাহগণ তাঁহাদিগের পুত্রগণকে জ্ঞানসঞ্চয়ের জন্য এই সকল শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ করিতেন। জ্ঞান-বিজ্ঞান-আলোচনা ও সভ্যতার কেন্দ্র-রূপেই নিশাপুর পারস্যের মধ্যযুগে প্রথম নগররূপে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল।

১। পয়গম্বর মহম্মদ বলিয়াছিলেন, "যদিও আমার পর আর কোন পয়গম্বর জন্মগ্রহণ করিবে না; তথাপি কবিদের মধ্যে তিনজন কবি ভগবৎ প্রেরণায় সিদ্ধিলাভ করিয়া পয়গম্বররূপে জনসাধারণের ভক্তি ও শ্রদ্ধা লাভ করিবে। ফির্দৌসী বীররস কাব্যে, আনওরী কসিদা ও শেখ সাদী গজল রচনায় চির অমরত্ব লাভ করিবে।"

জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চ্চা দ্বারা খোরাসান যে নিজেই সভ্যতা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের কেন্দ্রস্থল হইয়াছিল, তাহা নহে ; এই দেশের সভ্যতা ও জ্ঞান-বিজ্ঞান, আরব জাতির উপরও প্রভূত প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। যে আরবজাতি গ্রীস, মিশর, পারসিক প্রভৃতি জাতির মত সভ্যতা ও জ্ঞানে উন্নত হইবার আকাঙ্খা হৃদয়ে পোষণ করিত না,—যে জাতির মর্ম্মকোষে রাজ্যশাসনোপযোগী সামান্য জ্ঞান, যুদ্ধ, লুণ্ঠন ও হত্যা দ্বারা বিপুল অর্থ-সংগ্রহ-চিন্তা ভিন্ন অন্য কোনপ্রকার চিন্তা স্থান পাইত না —সেই রণোন্মাদ স্বভাব-কঠোর আরব জাতির নরপতিও খোরাসান অধিকার করিয়া খোরাসানী সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া, একেবারেই রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছিলেন—ইহার ফলে, আরবী সাহিত্যের সমৃদ্ধির দিকেও তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়।

আরব জাতির উপর খোরাসানী সভ্যতার প্রভাব

বাস্তবিকই এ দেশটি মায়া-সৌন্দর্য্যের পুরী। সৌন্দর্য্য-দেবতা নিজ শিল্প-চাতুর্য্যের পরিচয় দিবার জন্যই যেন এ দেশটি রচনা করিয়াছিলেন। চারিধারে সৌন্দর্য্যের ছবি! চারিধারে সত্য-শিব-সুন্দরের জয়গান। এমন সত্য-শিব-সুন্দরের রাজ্যে জন্মগ্রহণ না করিলে কি মনীষার অবতার, জ্ঞানিগণাগ্রগণ্য, বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক-কবি ওমর খৈয়ামের নবনবোন্মেষ-শালিনী প্রতিভার বিকাশ হয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বিদ্যালয়ে ওমর ও তিন বন্ধুর গল্প

৪৭০ হিজরাব্দে (১০১৭ খ্রীঃ) বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক-কবি ওমর খৈয়াম ইতিহাস-প্রসিদ্ধ খোরাসানের রাজধানী নিশাপুরে জন্মগ্রহণ করেন। ঐতিহাসিক ও ভূগোল-বিদ্যা-বিশারদ হামদুল্লা মুস্তওফি (১) বলেন, কবির সম্পূর্ণ নাম গিয়াসউদ্দিন আবুল ফতেহ ওমর-বিন-ইব্রাহিম অল্-খৈয়ামী। (২) ওমর তাঁহার নাম, গিয়াসউদ্দীন (বিশ্বাস আশ্রয়ী) উপাধি, আবুল ফতেহ (সাফল্যের চূড়ান্ত) পারিবারিক নাম, বিন-ইব্রাহিম (ইব্রাহিমের পুত্র), খৈয়াম তাঁহার তখ্‌ল্লুস (ভণিতা)। কবির স্বদেশবাসিগণ কবিকে "গিয়াস্‌উদ্দীন" উপাধি দান করিয়া সম্মানিত করেন। "গিয়াস্‌উদ্দীন," "মহীউদ্দীন" প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ উপাধি সকল সাধারণতঃ তৎকালীন বিশিষ্ট বিদ্বানগণকেই প্রদত্ত হইত। ইহা হইতে অনুমিত হয় যে, ওমর খৈয়াম তাঁহার যুগে একজন সর্ব্বজনবরেণ্য ও স্বীকৃত হকিম (বিদ্বান) ও ইমাম (আচার্য্য) ছিলেন। ওমর খৈয়াম চিরকুমার ছিলেন বলিয়া তাঁহার কুন্নিয়াৎ (পারিবারিক নাম) আবুল ফতেহ বাক্যের কোন প্রকার

জন্ম ও পিতৃ-মাতৃ পরিচয়

১। পারস্যের অন্তর্গত কুয়াজিম প্রদেশের অধিবাসী বিখ্যাত ঐতিহাসিক ও ভূগোল-বিদ্যাবিশারদ; ইনি তারিখ-ই-গুজিদা ও নুজহৎ উল-কুলাব নামক দুই খণ্ড বিখ্যাত গ্রন্থ রচনা করেন। ৭৫০ হিজরাব্দে (১৩৪৯ খ্রীঃ) দেহত্যাগ করেন।

২। তারিখ-ই-গুজিদা।

অর্থ করিতে পারা যায় না। তবে তাঁহার সর্ব্ব বিষয়ে সাফল্যই যে তাঁহাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিদ্বানে পরিণত করিয়াছিল, তাহা বলাই বাহুল্য। যে রত্নগর্ভা ভাগ্যবতী রমণী কবিকে গর্ভে ধারণ করিয়া স্নেহ-ক্রোড়ে লালন-পালন করিয়াছিলেন, বড়ই দুঃখের বিষয়, তাঁহার পরিচয় কিছুই জানা যায় না।

ওমর খৈয়ামের পূর্ব্বপুরুষগণ কোন্ বৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবনযাপন করিতেন, তাহা জানা যায় না। প্রবাদ আছে, কবির পিতা বস্ত্রবয়ন কার্য্যদ্বারা জীবনযাপন করিতেন। পরে তিনি এই কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া বস্ত্রাবাস নির্ম্মাতার কর্ম্ম করেন। এই কারণেই তাঁহাকে "খৈয়ামী"—তাঁবু-নির্ম্মাতা নামে অভিহিত করা হইত। আমাদের দেশে যেমন মৌলিক উপাধি হইতে জাতিগত বৃত্তি নির্ণয় করা হয়, পারস্য দেশেও এইরূপ ভাবে জাতি বা সম্প্রদায় নির্ণয় করা হইত। এ প্রথা পৃথিবীর সকল সভ্য-সমাজেই প্রচলিত আছে।

কবির তখল্লুস "খৈয়াম" শব্দ হইতে কোন কোন লেখক অনুমান করেন যে, তিনি পিতৃ-পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া পৈতৃক ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। কবির প্রাচীন চরিতাভিধানে ওমরের এই ব্যবসায় অবলম্বন সম্বন্ধে কোন প্রকার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না; আমাদের মনে হয়, তিনি রূপক হিসাবেই এই ভণিতা ব্যবহার করিতেন; তিনি নিজেও একটি রুবাইয়ে লিখিয়াছেন—

সুদীর্ঘকাল জ্ঞানের তাঁবু সৃজন করি ওমর খৈয়াম,
দগ্ধ হ'ল ধ্বংস হ'ল,—লুপ্ত হ'ল তাহার সুনাম;
জীবন-সূত্র ছিন্ন হল, অদৃষ্টেরি অস্ত্রাঘাতে,
বৃথাই সে যে বিক্রী হল মৃত্যুরূপী দালাল হাতে।

এই শ্লোক হইতে অনুমতি হয় যে, তিনি কখনও পিতৃ-পদাঙ্ক

অনুসরণ করেন নাই। পরন্তু, মৃত্যুর পূর্ব্বমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত জ্ঞানের তাঁবুই স্থাষ্ট করিয়া গিয়াছেন। অর্থাৎ সারাজীবন একাগ্র সাধকের মত জ্ঞানের তপস্যা দ্বারা জীবন অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন।

একাদশ খৃষ্টাব্দে খোরাসান—নিশাপুর জ্ঞান-বিজ্ঞানের কেন্দ্রস্থানে পরিণত হইয়াছিল। তৎকালীন সভ্যতানুসারে সকল ব্যক্তিই বিদ্যাশিক্ষা করিত। দেশে অশিক্ষিতের সংখ্যা ছিল না বলিলে অত্যুক্তি করা হয় না। দেশমধ্যে ধর্ম্ম ও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান উভয়েরই সুবন্দোবস্ত ছিল। মসজিদে মোল্লারা ধর্ম্মোপদেশ দান করিতেন; বিদ্যালয়ে ইমামগণ অধ্যাপনা করিতেন; বিদ্যালয়ে বালকগণ বিদ্যা অধ্যয়ন, সঙ্গীত ও ব্যায়াম অনুশীলন করিত; তর্কদ্বারা ছাত্রগণের মানসিক বৃত্তি ও মৌলিক চিন্তাশক্তির উৎকর্ষ সাধন করা হইত; মনোবৃত্তির উৎকর্ষ ও চিন্তাশক্তিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রগণ সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, গণিত, জ্যোতিষ, চিকিৎসা, রসায়ন প্রভৃতি অধ্যয়ন করিত।

বাল্যজীবন ও বিদ্যাশিক্ষা

জ্ঞান-বিজ্ঞানালোচনার পীঠস্থান নিশাপুরের বিদ্যালয়েই ওমর বিদ্যাশিক্ষা করেন। ওমর বাল্যকাল হইতেই চিন্তাশীল, তীক্ষ্মমেধা ও স্মরণশক্তিসম্পন্ন ছিলেন। উত্তর জীবনে তাঁহার তীক্ষ্ণ স্মরণশক্তির কথা পারস্যদেশে প্রবাদ বাক্যের মত প্রচারিত হইয়াছিল। যথাস্থানে আমরা সে কথার আলোচনা করিব। তাঁহার মুখমণ্ডল ও চক্ষু প্রতিভা-দীপ্ত এবং দৃঢ়তাব্যঞ্জক ছিল। বাল্যকাল হইতে তাঁহার অনুসন্ধিৎসা-প্রবৃত্তি অতিশয় প্রবল ছিল।

ওমরের বাল্যজীবন সম্বন্ধে সঠিক কোন সংবাদ জানা যায় না। ওমরের পিতা মধ্যবিত্ত গৃহস্থ ছিলেন। তাঁহার আর্থিক অবস্থা খুব সচ্ছল না হইলেও পুত্রের উচ্চশিক্ষার দিকে তাঁহার সবিশেষ দৃষ্টি ছিল। আর্থিক অসচ্ছলতা সত্ত্বেও তিনি ওমরকে নিশাপুরের শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট করাইয়া

ছিলেন। পুত্র যাহাতে সুশিক্ষিত হয়, তজ্জন্য তিনি যথেষ্ট প্রয়াস পাইয়াছিলেন।

ওমর যে শিক্ষাগুরুর শ্রীচরণতলে বসিয়া বিদ্যা অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তাঁহার নাম ইমাম মওয়াফিক উদ্দিন। আচার্য্য মওয়াফিক উদ্দিন খোরাসানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ছিলেন। আপামর সাধারণ তাঁহাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিত। তিনি আজীবন অধ্যাপনা করিয়া সুদীর্ঘ আশী বৎসর বয়সে উপনীত হইয়াছিলেন। তিনি সুন্নী সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। তাঁহার অধ্যাপনার খ্যাতি তৎকালে সমগ্র পারস্য দেশময় বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। আচার্য্য মওয়াফিক উদ্দিনের অধ্যাপনাগুণে দেশ-দেশান্তর হইতে দলে দলে ছাত্রগণ আসিয়া তাঁহার বিদ্যালয়ে সমবেত হইত। তৎকালে পারস্যদেশে এরূপ জনশ্রুতি প্রচলিত ছিল যে, ছাত্র আচার্য্য মওয়াফিক উদ্দিনের নিকট কোরান, হদিশ, তপসির প্রভৃতি মোসলেম ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করিবে, সেই-ই উত্তরজীবনে সুবিখ্যাত ও সর্ব্বজনবরেণ্য হইবে। ওমরের জীবন আলোচনা করিলে এ কথার যাথার্থ্য উপলব্ধি হয়। যেমন গুরু, তেমনি তাঁহার উপযুক্ত ছাত্র। ওমর আচার্য্য মওয়াফিক উদ্দিনের বিদ্যালয়ে মুসলিম ধর্ম্মতত্ত্ব, হদিশ, কোরান ও মুসলিম ব্যবস্থাশাস্ত্র (Jurisprudence) অধ্যয়ন করেন। তিনি যখন এই বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হন, তখন তাঁহার বয়স তেইশ বৎসর। এই বিদ্যালয়ে প্রবেশের পূর্ব্বে তিনি কোন্ বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, এ সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। আচার্য্যদেব ছাত্রগণের প্রতি যেমন স্নেহশীল ছিলেন, ছাত্রসম্প্রদায়ও তেমনি তাঁহার প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিল।

শিক্ষাগুরু মওয়াফিক উদ্দিন

ওমর খৈয়াম ছয় বৎসরকাল আচার্য্য মওয়াফিক উদ্দিনের বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন। তৎকালীন ছাত্রগণের পাঠ্য তালিকা নিম্নে লিখিত হইল,—

পারস্য ও আরবী ভাষা, সাহিত্য, ব্যাকরণ, কোরান, মোসলেম ধর্ম্মতত্ত্ব, আরব এবং পারস্যদেশীয় জ্ঞানিগণের বাণী, কুবাস নামা, হামিদি, লকানী অল-হরিরী, অল-হামদানীর গ্রন্থাবলী, অল-বালামী, আহমদ ই-হাসানি এবং আবু নসর কুন্দুরীর অনুশাসন (Rescripts) আরব কবিগণের কাব্য-গ্রন্থাবলী, মুতানব্বি, আবীউয়ার্দ্দি, এবং ঘাজীর দীওয়ান ; পারস্য কবিগণের মধ্যে ফির্দ্দৌসীর শাহ্‌নামা, রুদকী এবং আনসারীর কাব্য-গ্রন্থাবলী। (১)

ওমরের সময়ে ছাত্র-গণের পাঠ্যপুস্তক

নিশাপুরের বিদ্যালয়ে ওমর খৈয়াম, হাসান-বিন-সব্বা ও হাসান-আলী ইবন ইশাক (যিনি নিজাম-উল-মুল্ক না'মে সুবিখ্যাত ছিলেন)—এই তিন কিশোর সহপাঠী বালকের মধ্যে বালসুলভ বন্ধুত্বের যে গল্প ঐতিহাসিক রশিদ উদ্দিন লিখিত জ্যামিয়ৎ তওয়ারিখ গ্রন্থে স্থান পাইয়া এতাবৎকাল পর্য্যন্ত সত্য ঘটনা হিসাবে চলিয়া আসিতেছিল, উহা ঐতিহাসিক ভিত্তি-শূন্য এবং সম্পূর্ণ কাল্পনিক। বাস্তবিকই তাঁহারা কোনকালেই সহপাঠী ছিলেন না ; একমাত্র ঘটনাসমূহের তারিখ এবং পৌর্ব্বাপর্য্য নির্দ্দেশের অভাবেই (On chronological difficulties) উহা ভ্রান্তি বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়াছে। (২)

তিন বন্ধুর গল্প ঐতিহাসিক ভ্রান্তি

ওমর সুদীর্ঘ ছয় বৎসরকাল আচার্য্য মওয়াফিক উদ্দিনের বিদ্যালয়ে মোসলেম ধর্ম্মতত্ত্ব, হদিশ, মোসলেম-স্মৃতি, সাহিত্য, দর্শন, গণিত ও জ্যোতিষ প্রভৃতি বিজ্ঞানশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া সবিশেষ ব্যুৎপন্ন হয়েন।

১। চহার মকালা।

২। Literary History of Persia vol. ii ; স্বর্গীয় অধ্যাপক E. G. Browne লিখিত Yet more light on Umar Khayyam. প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য ; J. R. A. S. 1899.

গণিত ও জ্যোতিষশাস্ত্রে তাঁহার সবিশেষ অনুরাগই তাঁহাকে তৎকালে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গণিতবিদ ও জ্যোতির্বিদরূপে পরিণত করিয়াছিল। ওমর আবাল্য অনুসন্ধিৎসু ছাত্র ছিলেন। এই অনুসন্ধিৎসা-প্রবৃত্তিই তাঁহাকে জগদ্বিখ্যাত সত্যানুসন্ধিৎসু ও সত্য-সাধকে পরিণত করিয়া হুজ্জৎ-উল্-হক্ (সত্য প্রমাণকারী) অভিধায় সম্মানিত করিয়াছিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ওমর-গুরু আবু আলি সিনা

পারস্যদেশে মৌলিক চিন্তা, মতবাদ প্রচার, পাণ্ডিত্য ও গবেষণা দ্বারা যে-সমস্ত মনস্বী ব্যক্তি প্রসিদ্ধিলাভ করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়াছেন, তন্মধ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞান-পাণ্ডিত্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী, আবু আলি সিনার নাম সসম্মানে ইতিহাসে উল্লিখিত হইয়াছে। পারস্যদেশে আবু আলি সিনার মত চিন্তাশীল লেখক, সাহিত্য-স্রষ্টিকার, বৈজ্ঞানিক, চিকিৎসক, দার্শনিক ও সুকবি অতি অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। একাধারে সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার এরূপ একত্র সম্মেলন জ্ঞানিগণাগ্রগণ্য বৈজ্ঞানিক-কবি ওমর খৈয়াম ভিন্ন অন্যের মধ্যে অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার দর্শন ও বিজ্ঞান শাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্যের খ্যাতি পারস্য-দেশে একসময়ে প্রবাদ বাক্যের মত প্রচারিত হইয়াছিল। দর্শন ও বিজ্ঞানে সুপ্রসিদ্ধ গ্রীক দার্শনিক আরিস্তোতল (Aristotle) ও গ্রীক চিকিৎসক হেপোক্রেতস (Hepocratos) ও গ্যেলেনের (Gallen) মতানুসরণকারী হইলেও, তিনিই মধ্যযুগের ইয়োরোপের জ্ঞান-গুরু হইয়া অজ্ঞান-অন্ধকার দূর করিয়াছিলেন। তাঁহার স্বাধীন চিন্তা ও মতবাদ পারস্যের জ্যোতির্বিদ্-কবি ওমর খৈয়ামের উপর অশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। আবু আলি সিনার মৃত্যুর পর ওমর যখন বৈজ্ঞানিক গবেষণার দ্বারা নূতন তথ্য আবিষ্কার করিয়া পারস্যের পণ্ডিত-সমাজকে চমৎকৃত করিতেছিলেন,

চিন্তানায়ক আবু-সিনা

ওমর যখন নিজ মৌলিক চিন্তা ও মতবাদ প্রচার দ্বারা সমগ্র দেশে বিপ্লব উপস্থিত করেন, তৎকালীন পারস্যের জনসাধারণ ওমর খৈয়ামকে "আবু আলি সিনার অবতার" আখ্যায় সম্মানিত করিয়াছিল। ওমর আবু আলি সিনাকে গুরুপদে বরণ করিয়া, তাঁহারই অসমাপ্ত বাণী প্রচার দ্বারা পারস্যদেশে বিদ্রোহের পতাকা উড়াইয়া ছিলেন। আবু আলি সিনার সহিত ওমর খৈয়ামের সর্ব্ববিষয়ে সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। আবু আলি সিনা যেরূপ অসাধারণ জ্ঞানী, অলৌকিক প্রতিভাসম্পন্ন ছিলেন, তাহাতে তাঁহার অনন্যসাধারণ জ্ঞান-পাণ্ডিত্য-প্রতিভার প্রভাব উপযুক্ত ক্ষেত্রেই পতিত হইয়াছিল। যে মনস্বীর অপূর্ব্ব প্রতিভা প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইয়া ওমর খৈয়ামের বৈশিষ্ট্য ফুটিয়া উঠিয়াছিল, সেই জ্ঞান-বিজ্ঞানের আধার আবু আলি সিনার পরিচয় নিম্নে প্রদত্ত হইল।

ওমর খৈয়ামের উপর আবু সিনার প্রভাব

আবু-সিনা পারস্যের বোখারা শহরে ৩৭৩ হিজরাব্দে (৯৮০ খৃঃ) জন্মগ্রহণ করেন। (১) আবু-সিনার পূর্ব্বপুরুষগণ বলখ্ নগরের অধিবাসী ছিলেন। তাঁহার পিতা বোখারার নিকটবর্ত্তী খারমাইসেন প্রদেশের আমিল (রাজস্ব সংগ্রাহক) ছিলেন। রাজকর্ম্ম উপলক্ষে তিনি বলখ্ ত্যাগ করিয়া বোখারায় থাকিতে বাধ্য হন। (২) ইবন খল্লি-কান (৩) বলেন, দশ বৎসর বয়সের সময় আবু-সিনা সমগ্র কোরান,

১। তারিখ-উল-হুক্মা। **Bankipore Catalogue. Arabic medical works vol. iv.**

২। ইবন খল্লি খানের চরিতাভিধান।

৩। ইনি দামস্কাসের অধিবাসী বিদ্বান। ৬০৮ হিঃ অব্দে (১২১১ খৃঃ) জন্মগ্রহণ করেন; তিনি সুকবি, জীবনচরিতকার, সম্পাদক ও ঐতিহাসিক, এককথায় সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ ছিলেন; তাঁহার ওয়াফৎ অল-আয়নান বিখ্যাত চরিতাভিধান। এই বিশ্ববিখ্যাত চরিতাভিধানখানির একটি ইংরাজী সংস্করণ আছে।

সাহিত্য, মুস্‌লিম ধর্ম্মতত্ত্ব, পাটীগণিত ও বীজগণিতে এরূপ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন যে, এই সুকুমার বয়সেই সর্ব্বোচ্চ শিক্ষার শ্রেষ্ঠ উপাধি-সকল লাভ করেন।(১) তিনি আত্ম-জীবনীতেও লিখিয়াছেন যে ধর্ম্মতত্ত্ব, আরব-সাহিত্য ও গণিত বিজ্ঞানেও অসামান্য জ্ঞানের পরিচয় দিয়া প্রতি-বাসিগণের বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিলেন।

আবু-সিনার জন্ম, বিদ্যা শিক্ষা ও চিকিৎসকরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ

ইহার পর তিনি মিশর দেশীয় এক সুবিখ্যাত চিকিৎসকের নিকট চিকিৎসা-শাস্ত্র, ন্যায়শাস্ত্র, জ্যামিতি ও সুপ্রসিদ্ধ টলেমীর গ্রন্থসমূহ পাঠ করেন। সুবিখ্যাত সুফী ইসমাইলের নিকট সুফী-ধর্ম্মতত্ত্ব ও ব্যবস্থা বিজ্ঞানে জ্ঞানলাভ করেন। ইহার পর তিনি পদার্থ-বিজ্ঞান, চিকিৎসা-বিজ্ঞান ও অপরাপর বিজ্ঞান শাস্ত্র একজন খৃষ্টান চিকিৎসকের নিকট অধ্যয়ন করেন। অধ্যয়ন শেষ করিয়া আবু-সিনা চিকিৎসা-বিজ্ঞানের গবেষণায় মনোনিবেশ করেন। তিনি যখন গভীর গবেষণায় নিযুক্ত থাকিতেন, তখন বাহ্য-জগতের সহিত তাঁহার কোন সম্পর্ক থাকিত না। দিনের পর দিন, রাত্রির পর রাত্রি—কোন দিক দিয়া চলিয়া যাইত, তাহা তিনি জানিতে পারিতেন না। যখন অক্লান্ত পরিশ্রমে কোন জটিল সমস্যা-সমাধানে অপারগ হইতেন, তখন তিনি সমস্ত দিন উপবাসী থাকিয়া মসজিদে গিয়া সমস্যা-সমাধান-শক্তির প্রার্থনা করিতেন।(২)

চিকিৎসা-বিজ্ঞানে তিনি অসামান্য পারদর্শিতা লাভ করিয়া এতই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন যে সতের বৎসর বয়সে "দ্বিতীয় হিপোক্রেতস"

১। ওয়াফত অল আয়ন্যান। Oriental Biographical Dictionary Beal.

২। ইব্‌ন খল্লি খান।

নামে সম্মানিত হন। শুধু ইহাই নহে, এই সুকুমার বয়সেই সমানী বংশীয় রাজকুমার মনসুরের চিকিৎসার জন্য রাজপ্রাসাদে তাঁহার আহ্বান হইয়াছিল। তৎকালীন প্রধান ও সমসাময়িক চিকিৎসকগণ জ্ঞান-বৃদ্ধ তরুণ যুবক আবু-সিনার নিকট চিকিৎসা-বিজ্ঞানের অনেক জটিল সমস্যা সমাধান ও উপদেশ লাভ করিতে আসিতেন। আবু-সিনাই পারস্যদেশে আরিস্টোটলের মত পদচারণা করিতে করিতে চিকিৎসা-বিজ্ঞান-শিক্ষার এক অভিনব প্রণালীর প্রবর্তক।(১)

রাজকুমার আবু-সিনার চিকিৎসাধীন থাকিয়া অতি অল্পদিনের মধ্যে রোগমুক্ত হন এবং তাঁহার প্রতি কৃপাদৃষ্টি করেন। রাজকুমার মনসুর বিদ্যানুরাগী ও সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার পাঠাগার দুষ্প্রাপ্য ও মূল্যবান গ্রন্থরাজিতে পূর্ণ ছিল। রাজকুমার আবু আলি সিনার চিকিৎসা-নৈপুণ্যে এতই মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তিনি তাঁহাকে রাজ-পাঠাগার ব্যবহার করিবার অধিকার প্রদান করেন। পাঠাগারে সংরক্ষিত প্রচীন গ্রীকদার্শনিকগণের গ্রন্থাবলী পাঠ করিয়া অসাধারণ জ্ঞানের অধিকারী হওয়া তাঁহার দার্শনিক হিসাবে প্রসিদ্ধির অন্যতম কারণ। এই সুবৃহৎ পাঠাগার অমূল্য ও দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থাবলীতে পূর্ণ। এই সকল অমূল্য গ্রন্থাবলীর নাম পূর্ব্বে অতি অল্প লোকেই শুনিয়াছে। এরূপ মূল্যবান ও দুষ্প্রাপ্য পুস্তকাবলীপূর্ণ দ্বিতীয় পুস্তকাগার সে যুগে ছিল না।(২)

রাজকুমারের অনুগ্রহ ও রাজ-পাঠাগার ব্যবহার অধিকার লাভ

কিছুকাল পরে দুর্ভাগ্যক্রমে এই অমূল্য পাঠাগারটি হঠাৎ অগ্নিদগ্ধ হইয়া ভস্মীভূত হইয়া যায়। আবু-সিনার প্রতি রাজকুমারের অনুগ্রহ-

---

১। Encyclo Britanica 9th edition.

২। চহার মকালা ; Literary History of Persia voll ii.

দৃষ্টি অনেক আমির-ওমরাহগণের ঈর্ষ্যানলে ঘৃতাহুতি প্রদান করে। যে অশুভ মুহূর্ত্তে রাজ-পাঠাগার অগ্নিদগ্ধ হয়, সেই সময় আবু-সিনার শত্রুগণ চক্রান্ত করিয়া প্রচার করে যে, আবু-সিনা নিজে ইচ্ছাপূর্ব্বক পাঠাগারে অগ্নিসংযোগ করিয়া দিয়াছে। সে পাঠাগারের সমস্ত পুস্তক অধ্যয়ন করিয়া প্রচুর জ্ঞান সঞ্চয় করিয়াছে, যাহাতে অপর কোনো ব্যক্তি এই পাঠাগার ব্যবহার করিয়া জ্ঞান সঞ্চয়পূর্ব্বক তাহার সমকক্ষতা লাভ করিতে না পারে, এই আকাঙ্খার বশবর্ত্তী হইয়া সে ইচ্ছাপূর্ব্বক পাঠাগারে অগ্নিসংযোগ করিয়াছে।

আবু-সিনার বিরুদ্ধে চক্রান্ত

আবু-সিনার দ্বারা এই অপকর্ম্ম সাধিত হইয়াছে জানিতে পারিয়া রাজকুমার মর্ম্মান্তিক দুঃখিত ও অতিশয় ক্রুদ্ধ হন। তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাকে বোখারার সীমানা ত্যাগ করিতে আদেশ দেন। খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর শেষ ভাগে তিনি বোখারা ত্যাগ করেন। ঠিক এই সময়ে তাঁহার পিতৃ বিয়োগ হয়। তখন তাঁহার বয়স তেইশ বৎসর। বোখারা ত্যাগের পর হইতে আবু সিনা ভ্রাম্যমাণের জীবন যাপন করেন। যখন যে রাজার রাজ্যে তিনি গমন করিতেন, তৎক্ষণাৎ তিনি বিদ্বানের যোগ্য প্রচুর সম্মান ও শ্রদ্ধা লাভ করিতেন। কখনও কখনও তিনি রাজা ও শাসনকর্ত্তাগণের অনুরোধে তাঁহাদিগের রাজ্যে বিদ্বান-পারিষদ অথবা মন্ত্রিরূপেও অবস্থান করিতেন। বিধাতা যাঁহার অদৃষ্টে যাযাবর-জীবন-যাপন লিখিয়াছেন, তিনি মন্ত্রিরূপেই হউক, অথবা পারিষদরূপেই হউক, কোথাও স্থিরভাবে জীবন যাপন করিতে পারেন না। খোয়ারেশমশাহ মামুনের রাজ্যে তিনি যখন বিদ্বান পারিষদরূপে অবস্থিত, সেই সময় ইতিহাস-প্রসিদ্ধ সুলতান মামুদ, অধীনস্থ

রাজকুমারের বিষদৃষ্টিতে পতিত; বোখারা ত্যাগ; যাযাবর জীবনযাপন।

রাজা মামুনকে তাঁহার বিদ্বান-পারিষদ আবু-সিনাকে মামুদের দরবারে প্রেরণ করিবার জন্য পত্রাদেশ করেন। সুলতান মামুদ আবু আলি সিনার পাণ্ডিত্য-প্রতিভায় মুগ্ধ হইয়া অন্তরে অন্তরে তাঁহাকে অতিশয় শ্রদ্ধা করিতেন। খোয়ারেশমশাহ আবু-সিনাকে সুলতান মামুদের পত্রাদেশের বিষয় জ্ঞাপন করিলে, তিনি গোপনে এই রাজ্য ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। সুলতান আশায় নিরাশ হইয়া আবু-সিনাকে বন্দী করিয়া গজনীতে প্রেরণ করিবার জন্য, তাঁহার চল্লিশখানি চিত্র অঙ্কিত করিয়া দেশে দেশে প্রেরণ করেন ও প্রচুর পুরস্কার ঘোষণা করেন। [১]

আবু-সিনা খাওয়ারজাম শহর হইতে পলায়ন করিয়া কিছুকাল আত্ম-গোপন করিয়া বাস করিতে থাকেন। এই সময় তিনি কুবাসের রাজার এক আত্মীয়কে কঠিন পীড়া হইতে মুক্ত করেন; রাজ-আত্মীয় তদীয় চিকিৎসক আবু আলি সিনাকে রাজদরবারে উপস্থিত করেন। রাজা প্রথম দর্শনেই সুলতান মামুদ প্রেরিত চিত্র হইতে আবু-সিনাকে চিনিতে পারেন। তিনি সবিশেষ শ্রদ্ধা ও সম্মানের সহিত আবু সিনাকে নিজ দরবারে আশ্রয় দেন। তিনি এই সময়ে কুবাস রাজের মন্ত্রিপদে অধিষ্ঠিত হয়েন। মন্ত্রিপদে অধিষ্ঠিত হইয়া রাজকর্ম্মের অবসরে তিনি প্রত্যহ দুই পৃষ্ঠা করিয়া তাঁহার প্রসিদ্ধ দার্শনিক গ্রন্থ "সীফা" রচনা করেন। (২) কুবাস শহরে তিনি অধিক দিন বাস করিতে পারেন নাই। সুলতান মামুদের অত্যাচারের ভয়ে অল্পদিন পরেই আবু সিনা রাজ-আশ্রয় ত্যাগ করিয়া রায়নগরে পলায়ন করেন। এইরূপ পুনঃ পুনঃ ভ্রাম্যমান জীবন

১। চহার মকালা।

২। চহার মকালা; Carra de Vaux.

তাঁহার পক্ষে বড়ই অসহ্য হইয়া উঠে।(১) অবশেষে একদিন মরুভূমি অতিক্রম করিবার সময় হঠাৎ উদরের পীড়ায় আক্রান্ত হন এবং মৃত্যুর পূর্ব্বের তিনদিন প্রার্থনা ও কোরান পাঠ করিতে করিতে ৪৭২ হিজরাব্দে (১০৩৭ খ্রীঃ) হামদান নগরে ৫৪ বৎসর বয়সে দেহ-ত্যাগ করেন। (২)

আবু আলি সিনার গ্রন্থসংখ্যা আজিও স্থিরনিশ্চয় করিয়া কেহ নির্দ্দেশ করিতে পারে নাই। তাঁহার যতগুলি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে চিকিৎসা-বিজ্ঞান বিষয়ক একশত চল্লিশ, গণিত-বিজ্ঞান সম্বন্ধে দশ, দর্শনশাস্ত্র সম্বন্ধে পনের, উদ্ভিদ-বিজ্ঞান সম্বন্ধে পাচ, জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্বন্ধে আট এবং কুড়ি খণ্ডে সম্পূর্ণ বিশ্বকোষ উল্লেখযোগ্য; ইহা ব্যতীত তিনি আরিস্তোতলের গ্রন্থাবলী গ্রীক হইতে আরবী ভাষায় অনুবাদ করেন।(৩) আবু-সিনা তাঁহার চিকিৎসা-বিজ্ঞান-গ্রন্থ "কিতাব-উল-কানুন" এবং দার্শনিক গ্রন্থ "সীফা"র জন্যই সুবিখ্যাত। শেষোক্ত সুবৃহৎ গ্রন্থখানি আঠার খণ্ডে সম্পূর্ণ। ইহাতে পদার্থ বিজ্ঞান, ধর্ম্মতত্ত্ব এবং গণিতবিজ্ঞান আলোচিত হইয়াছে। তাঁহার "কিতাব-উল-কানুন" পূর্ব্ববর্ত্তী প্রসিদ্ধ চিকিৎসক রাজী, হালি আব্বাস রচিত গ্রন্থের তুল্য ও সমশ্রেণীস্থ হইলেও প্রচুর গবেষণা, অসাধারণ পাণ্ডিত্য এবং গ্রীকচিকিৎসা-প্রণালী অনুসারে শৃঙ্খলাবদ্ধ প্রণালীতে লিখিত বলিয়া চিকিৎসা-বিজ্ঞান-জগতে প্রামাণ্য ও প্রথম শ্রেণীর চিকিৎসা-বিজ্ঞান-গ্রন্থরূপে প্রসিদ্ধিলাভ করে। কিন্তু শল্য-

আবু-সিনার গ্রন্থাবলী

১। চহার মকলা।

২। ইব্রন খল্লিখান।

৩। Literary History of the Arabs. Nicholsnn.

চিকিৎসা-বিজ্ঞান-হিসাবে আবু-সিনার এই গ্রন্থ তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী চিকিৎসকগণের গ্রন্থের তুলনায় নিম্নশ্রেণীর বলিয়া বিবেচিত হয়।(১)

আবু সিনা রাজনীতি-বিজ্ঞানেও অল্প পারদর্শী ছিলেন না, তাঁহার জফর-নামা (Book of victory) রাজনীতি বিজ্ঞান সাহিত্যের অমূল্য-সম্পদ। এই গ্রন্থ তাঁহার রাষ্ট্র-বিজ্ঞানে অসামান্য পাণ্ডিত্যের ও রাজনীতি-কুশলতার পরিচায়ক। এই গ্রন্থখানি আবু সিনা সমানী রাজবংশীয় রাজকুমারের আদেশে রচনা করেন। এই গ্রন্থ মধ্যে প্রজার প্রতি রাজার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে নৈতিক উপদেশ; রাজনৈতিক-বাণী এবং পারস্থের সুপ্রসিদ্ধ ন্যায়বান নরপতি নওশেরওয়াঁ ও তাঁহার বিজ্ঞ মন্ত্রী বুজর্কমিহরের রাজ্যশাসন সংক্রান্ত কথোপকথন দৃষ্ট হয়।(২) চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যেরূপ তিনি হিপোক্রেতস ও গ্যেলনের মতানুসারী, দর্শনের ক্ষেত্রেও সেইরূপ আরিস্তোতল, (Aristole), প্লেতো (Plato) ও প্লাটিনাসের (Plotinus) মতানুসারী ছিলেন।

আবু-সিনার কবিতায় নারী ও সুরার স্তুতি

উপরোক্ত গ্রন্থাবলী ভিন্ন আবু-সিনা পারস্থ ও আরবী ভাষায় বহুসংখ্যক কবিতা রচনা করেন। প্রাচ্যভাষাবিৎ জর্ম্মন পণ্ডিত Dr. Hermann Ethe অসামান্য পরিশ্রম ও গবেষণায় পারস্থ ও আরব্য কবিতাগুলি সংগ্রহ

১। Catalogue of Persian and Arabic manuscripts kept in the Oriental Public Library Bankipore vol. IV, Arabic medical works 1910,

২। Catalogue of Persian manuscripts kept in the India office Library.

করিয়া জর্মন ভাষায় অনুবাদ ও সম্পাদন করিয়াছেন।(১) এই সকল কবিতা মূর্ত্তিমান "বিদ্রোহ"। এই বিদ্রোহ-অভিযান দেশাচার, সুফীধর্ম্ম, ভণ্ডামি ও গোঁড়ামীর বিরুদ্ধে। আবু-সিনা অত্যন্ত পিয়ালা-বিলাসী ছিলেন। তাঁহার অনেক কবিতা সুরা, সুরাপাত্র ও নারীর প্রশংসা-বাক্যে পূর্ণ। যে কারণে ওমরের কবিতা তাঁহার স্বদেশবাসীর চিত্তাকর্ষণ করিতে যে কারণে ওমরের কবিতা তাঁহার স্বদেশবাসীর চিত্তাকর্ষণ করিতে পারে নাই, ঠিক সেই কারনেই আবু-সিনার কবিতাও পারস্যদেশে প্রসার লাভ করে নাই।

১। A Literary History of Persia vol ii.

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পৃষ্ঠপোষক বন্ধুলাভ

ইমাম মওয়াফ্ফিক উদ্দিনের বিত্যালয়ে সর্ব্বোচ্চ শিক্ষার পাঠ সমাপনান্তে ওমর গৃহে ফিরিয়া জ্ঞান-বিজ্ঞানের গবেষণা দ্বারা বিশেষজ্ঞের জীবন যাপন করিতে মনস্থ করেন। এই সময় তাঁহার পিতৃ-বিয়োগ হয়। তিনি মধ্যবিত্ত গৃহস্থের সন্তান ছিলেন; তাঁহার গৃহ সংস্থান এমন সচ্ছল ছিল না, যদ্দারা তিনি বিনা উপার্জ্জনে জ্ঞানালোচনায় জীবনযাপন করিতে পারেন। পিতার মৃত্যুর পর গৃহে আসিয়া ওমর দারুণ অর্থকষ্ট ভোগ করেন। অর্থাভাবের কঠোর তাড়না যখন তাঁহাকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের গবেষণার পথ ত্যাগ করিতে প্রবুদ্ধ করিতেছিল; গবেষণাকার্য্য ত্যাগ করিয়া অর্থোপার্জ্জনে বহির্গত হইবেন কি না, এই মহা সমস্যার সন্ধিস্থলে যখন তাঁহার চিত্ত দোতুল্যমান; ঠিক সেই সময় ওমর শ্রীভগবানের আশীর্ব্বাদ লাভের মত একজন সহৃদয় গুণগ্রাহী আমীরের স্বতঃপ্রবৃত্ত অর্থ-সাহায্য-প্রতিশ্রুতি লাভ করিয়া ধন্য হয়েন। ওমরের গুণগ্রাহী উদার-হৃদয় পৃষ্ঠপোষকের নাম আবু তাহির। নিজাম-উল-মুল্ক হাসান ইবন ইশাকের বন্ধু ভিন্ন আবু তাহিরের আর কোন পরিচয় জানা যায় না।

পাঠ সমাপনান্তে ওমরের গৃহে আগমন, দারিদ্র্য সমস্যা

পৃষ্ঠপোষক বন্ধুলাভ

রোমক-কবি ভার্জ্জিল যেমন ম্যাসিনাসকে পৃষ্ঠপোষক বন্ধুরূপে লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন, ওমরও আবু তাহিরকে পৃষ্ঠপোষক বন্ধুরূপে

পাইয়া তদ্রূপ ধন্য হয়েন। দরিদ্র কবি ভার্জ্জিল ম্যাসিনাসকে পৃষ্ঠপোষক বন্ধুরূপে না পাইলে, তাঁহার যেমন ভার্জ্জিলত্ব প্রকাশ পাইত না; ওমর খৈয়ামও আবু তাহিরকে পৃষ্ঠপোষক বন্ধুরূপে না পাইলে ওমরের ওমরত্ব প্রকাশ পাইত কিনা সন্দেহের বিষয়। আবু তাহিরের বন্ধুত্ব লাভ করিবার পর হইতে তাঁহার সৌভাগ্য-সূর্য্যের উদয় হয়। তাঁহার অর্থ সাহায্যই ওমরের বৈজ্ঞানিক-গবেষণার পথ উন্মুক্ত করিয়া দেয়। ওমর অর্থচিন্তা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া নিশ্চিন্ত মনে বৈজ্ঞানিক-গবেষণায় মনোনিবেশ করেন। বাল্যকাল হইতেই গণিত-জ্যোতিষ বিজ্ঞানে তাঁহার সাতিশয় অনুরাগের পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। বয়োবৃদ্ধির সহিত এই অনুরাগ অনুসন্ধিৎসায় পরিণত হয়। গণিত-জ্যোতিষের অনুশীলন দ্বারা সত্যান্বেষণ ও সত্যনির্দ্ধারণই তাঁহার সমধিক প্রিয়কার্য্য ছিল। তাঁহার জীবন অনুসন্ধিৎসায় পূর্ণ। সত্যান্বেষী ওমর তপস্বীর মত একাগ্র সাধনায় গণিত-জ্যোতিষ-বিজ্ঞানের গবেষণার দ্বারা সত্যান্বেষণে প্রবৃত্ত হন।

ম্যাসিনাস্ ও আবু তাহির

গবেষণায় মনোনিবেশ

আরব-ধর্ম্ম-গুরু মহম্মদের উদ্দীপনাপূর্ণ ধর্ম্ম প্রচারের ফলে, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত আরব জাতি যে তাঁহার প্রচারিত বাণীমন্ত্রে দীক্ষালাভ করিয়া কেবল একত্রিত হইয়াছিল, তাহা নহে; তাহারা জ্ঞান বিজ্ঞান মন্ত্রেও দীক্ষিত হইয়া সজীব হইয়াছিল। নব দীক্ষার ফলে সমগ্র আরব-জাতি দ্রুতগতিতে জ্ঞান সঞ্চয় করে। দেশমধ্যে তাহারা যেমন জ্ঞান বিস্তার করিতেছিল, তেমনি জগতের অন্যান্য উন্নতিশীল জাতির চিন্তা জ্ঞান বিজ্ঞান আহরণ করিয়া দেশের জ্ঞান-ভাণ্ডারও পূর্ণ করিতেছিল।

আরবজাতির জ্ঞানচর্চ্চা

সিন্ধুদেশ খলিফা মনসুরের (৭৫৩-৭৭৪ খৃঃ) শাসনাধীন হওয়ায় ভারতবর্ষের সহিত বোগদাদের মানসিক চিন্তা-জ্ঞানের আদান-প্রদানের যোগসূত্র সংস্থাপিত হয়। ভারতীয় জ্ঞান-চিন্তা-ধারা ভিন্ন ভিন্ন যুগে দুইটি বিভিন্ন পথ দিয়া বোগদাদে উপস্থিত হয়। একটি ভারতবর্ষ হইতে সোজাসুজি ভাবে, অপরটি ইরাণ দেশ হইয়া বোগদাদে উপস্থিত হয়। প্রথম সংস্কৃত হইতে আরবী এবং অপরটি প্রাকৃত ও পালি হইতে পহলবী এবং শেষোক্ত হইতে আরবী।

বোগদাদের সহিত ভারতের সম্বন্ধ

খলিফা হারুণ-অর-রসিদের (৭৩৮-৮০৮ খৃঃ) রাজত্ব সময়ে ভারতীয় জ্ঞান-প্রবাহ (Influx of Hindu Learning) মুসলিম জাতির উপর অশেষ প্রভাব বিস্তার করে। এই সময় বলখ্ নগরের বারমাক (১) রাজবংশ উন্নতির চরম শিখরে উঠিয়াছিল। ইঁহারা ভারতীয় চিকিৎসা-বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য ভারতবর্ষে বিদ্বান পাঠাইতেন; ইহা ব্যতীত তাঁহারা হিন্দু বিদ্বানগণকে বোগদাদে সাদর-আহ্বান করিয়া, সংস্কৃত হইতে আরবী ভাষায় চিকিৎসা-বিজ্ঞান-গ্রন্থ অনুবাদ করিয়াছিলেন। শুধু ইহাই নহে, হিন্দু চিকিৎসকগণকে তাঁহাদিগের রুগ্নাবাসের প্রধান চিকিৎসকরূপেও তাঁহারা নিযুক্ত করিতেন।

মুসলিম-জগতের উপর ভারতীয় জ্ঞান-প্রবাহের প্রভাব

খলিফা মামুনের (৮১৩-৮৩৩ খৃঃ) রাজত্ব-সময়েও ভারতীয় জ্ঞান-রশ্মিধারা পুনরায় মুসলিম-জ্ঞান-ভাণ্ডারে পতিত হইয়া তাহাকে ঔজ্জ্বল্য প্রদান করে। ইহার পর মুসলিম-জগৎ গ্রীক প্রভাবান্বিত হয়।

১। বারমাক রাজবংশের পূর্ব্বপুরুষগণ বৌদ্ধবিহার— নববিহারের অধ্যক্ষ ছিলেন। বারমাক শব্দ পালি পরামক শব্দের রূপান্তর। ইহার অর্থ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অর্থাৎ বিহারের অধ্যক্ষ।

আরবেরা ভারতীয় এবং গ্রীক সাহিত্য, বিজ্ঞান ও দর্শনচর্চ্চা করিয়া অশেষ জ্ঞানলাভ করিয়াছিল। ভারত-গ্রীক-চিন্তা-ধারা আরব-চিন্তা-ধারা'র সহিত মিলিত হইয়া ভারত-গ্রীক-আরব-জ্ঞানের সমন্বয় ঘটাইয়াছিল। এই অপূর্ব্ব সমন্বয়ের ফলে আরব নরপতিগণের রাজত্বসময়ে বাগদাদ যেমন জ্ঞান-বিজ্ঞানের কেন্দ্র হইয়াছিল, তেমন তাঁহাদিগের দরবার-গৃহও পৃথিবীর নানা জাতীয় বিদ্বানগণের মিলন-মন্দিরে পরিণত হয়। এই জ্ঞান-বিজ্ঞানের নবজাগরণের যুগই বোগদাদের সুবর্ণ-যুগ।

ভারত-গ্রীক-আরব চিন্তাধারার সমন্বয়

খলিফা মামুন সত্যই বুঝিয়াছিলেন যে, মানব-জীবনের সুখ ও জ্ঞান শিক্ষার উপর নির্ভর করে; সেইজন্য তিনি ভারতীয় পণ্ডিতগণকে তদীয় রাজসভা অলঙ্কৃত করিবার জন্য আহ্বান করেন। আটজন ভারতীয় পণ্ডিত গণিত-জ্যোতিষ-চিকিৎসা-বিজ্ঞান সমেত বোগদাদে উপস্থিত হয়েন।(১) এই সকল হিন্দু পণ্ডিতগণের রচিত গ্রন্থাবলী তৎকালীন মুসলিম সভ্যতার উপর অশেষ প্রভাব বিস্তার করে।(২) অসাধারণ জ্ঞানী খলিফা মামুন ভারতীয় এবং গ্রীকগ্রন্থসমূহ স্বয়ং অনুবাদ আরম্ভ করেন। এই বিরাট কর্ম্ম তাঁহার দ্বারা সম্পন্ন হয় নাই; তাঁহার উপযুক্ত পুত্র কর্ত্তৃক যোগ্যতার সহিত সুসম্পন্ন হয়। এইরূপে আরবজাতি, ভারতীয় এবং গ্রীক-বিদ্যা-জ্ঞানের ভাণ্ডার হইয়া উঠে। আরবীয় প্রতিভার নবজাগরণের ফলে আরবে অনেকগুলি

খলিফা মামুন কর্ত্তৃক বোগদাদে ভারতীয় পণ্ডিতগণের আহ্বান

১। Civilization of Ancient India. R. C. Dutt; Encyclo Britanica 11th edition; History of Sanskrit Literature. Macdonell.

২। Literary History of the Arabs.—Nicholson.

সুপণ্ডিত জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহারা সাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞান (গণিত-জ্যোতিষ-চিকিৎসা-রসায়ন) শাস্ত্রের আলোচনা দ্বারা সুপ্রসিদ্ধ হয়েন।

পারস্যের খোরাসান খলিফাগণের রাজত্ব সময়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানে সমৃদ্ধ হইয়া বোগদাদের মতই জ্ঞানানুশীলনের পাদপীঠ ও বিদ্বানগণের মিলন-মন্দিরে পরিণত হইয়াছিল। বোগদাদ রাজসভা, যেমন খলিফার রাজত্ব-সময়ে গ্রীক এবং ভারতীয় বিদ্বানগণ কর্তৃক সমলঙ্কৃত হইয়াছিল, খোরা-সানও তদ্রূপ আরব-পারস্যের দার্শনিক-বৈজ্ঞানিক-কবি-প্রতিভাচ্ছটায় উজ্জ্বল হইয়াছিল। আরব-পারস্যের সুবর্ণ-যুগের মধ্যাবস্থায় মনীষী ওমর খৈয়ামের বৈজ্ঞানিক-প্রতিভার বিকাশ হয়।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

গণিতবিদ ওমর খৈয়াম

দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসারর পর বৎসর, ঋতুর পর ঋতু চলিয়া যাইতেছে; গুলাবকুঞ্জে বুলবুল নিত্য ঝঙ্কার দিতেছে; গুলাব-হেনাকুঞ্জে তীব্র মধুর সুবাস ছড়াইয়া খোরাসানের পীচ-ন্যাসপাতি-খর্জ্জুর-দ্রাক্ষা-কুঞ্জ-শোভিত চতুষ্পার্শ্বস্থ পল্লীতে স্বপ্ন-রাজ্য রচনা করিতেছে। কত কুন্দধবল জ্যোৎস্না নিভৃত দ্রাক্ষাকুঞ্জান্তরালবর্ত্তী ওমরের পর্ণ-কুটীরে আসিয়া ফিরিয়া যাইতেছে। জ্ঞান-যোগী ওমরের সেদিকে দৃষ্টি নাই—ভ্রূক্ষেপ নাই। সত্যসাধক ধ্যান-জগতে বিচরণ করিতেছেন—সত্যের সন্ধানে ব্যস্ত! কখনো সংখ্যা-বিজ্ঞানের সাহায্যে, কখনো বা বর্ণমালার অক্ষরগুলিকে সংখ্যা স্বরূপ ধরিয়া, সাঙ্কেতিক চিহ্নদ্বারা রাশি-বিষয়ক সিদ্ধান্ত সকল যুক্তি-সহকারে সংস্থাপনপূর্ব্বক, অল-জবর ওয়াল মোকাবলা দ্বারা সত্য-নির্ণয়ে ব্যস্ত। কখনো বা গ্রহ-নক্ষত্রের গতিবিধি পর্য্যালোচনা করিতেছেন। কখনো বা জ্যোতিষের কূটতর্ক লইয়া ব্যস্ত! কখনো বা—শারদীয় নভোমণ্ডল যখন মেঘশূন্য হইয়াছে এবং শরতের নীল নির্ম্মল আকাশে তারকাপুঞ্জ পূর্ণ জ্যোতিতে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, তখন জ্ঞান-তপস্বী ওমর ত্রিলোকদর্শী ঋষির মত একাগ্র মনে, অন্বেষণের নয়নে, দূরবীণ হস্তে আকাশের দিকে তাকাইয়া, নব-নক্ষত্রের সন্ধানে, প্রহরের পর প্রহর অতিবাহিত করিতেছেন।

এইরূপ সুদীর্ঘকালব্যাপী ধ্যান-ধারণা, গভীর গবেষণা, যোগ-সাধনার

স্বরূপ ওমর একখণ্ড অল-জবর ওয়াল মোকাবলা প্রণয়ন করেন। আরবীয় প্রাচীন গণিত-বিজ্ঞান-গ্রন্থে এই নামের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। গণিতের কোন শাখার সাধারণ মূলসূত্র বা নিয়মসমূহের প্রণালীবদ্ধ বিবৃতি অথবা বর্গীয় সমীকরণ সমাধান প্রণালীই তৎকালে অল-জবর ওয়াল মোকাবলা নামে পরিচিত ছিল। অল-জবর অর্থে পুনঃসংস্থাপন (restoration) এবং মোকাবলা অর্থে বর্গীয় সমীকরণ (equation) বুঝায়। আরব-গণিতবিদ্গণ কিন্তু এই সিদ্ধান্ত (theory) স্বীকার করিতেন না।(১) আরব-গণিতবিদ্ বহা-অল-দ্দিন অল-অমিলি তাঁহার গণিতগ্রন্থই খুলাসৎ-অল হিসাব (গণিতসার) গ্রন্থে অল-জবর ওয়াল মোকাবলার সংজ্ঞা এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—কোন সমীকরণের যে পার্শ্বে বিয়োগ সংখ্যা থাকে, তাহার অপর পার্শ্বে ঠিক সমান সংখ্যা যোগকরতঃ পূর্ব্ব পার্শ্বের বিয়োগ সংখ্যা তুলিয়া উহার পুনঃসংস্থাপনকে অল-জবর এবং উত্তর পার্শ্ব হইতে একই বা সমান সংখ্যক রাশি বিয়োগ করার নামই অল-মোকাবলা। আরবীয় প্রাচীন গণিত-গ্রন্থ ইলম্ অল-জবর ওয়াল মোকাবলায় কোন প্রকার সংজ্ঞা দৃষ্ট হয় না।(২)

ওমরের অল জবর ওয়াল মোকাবলা রচনা; প্রাচীন আরবীয় বীজ গণিতের জন্মকথা

কালক্রমে মোকাবলা শব্দের প্রচলন হ্রাস হয়। আবু জকারিয়া অল হস্‌র তাঁহার গণিত-গ্রন্থে কেবলমাত্র "অল-জবর" শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন; এই নামই প্রতীচ্য গণিতবিদ্গণ প্রাচ্য হইতে গ্রহণ করিয়াছেন এবং অদ্যাপি ইহাই ইংরাজীতে Algebra নামেই পরিচিত। যোগ বা বিয়োগ চিহ্নদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী কোন রাশির অংশ আরবীয় গণিতবিদ্গণ

১। Encyclo of Islam.
২। Encyclo of Islam.

কর্তৃক আবিষ্কৃত অথবা গ্রীক বা হিন্দু গণিতবিদ্‌গণের গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত, ইহা আজিও প্রমাণিত হয় নাই।(১) ওমরের অল-জবর ওয়াল মোকাবলা প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে আরব দেশে তিনখণ্ড অল-জবরা প্রকাশিত হয়। ইহারা যথাক্রমে নবম, দশম ও একাদশ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রথম খণ্ডের রচয়িতা মহম্মদ ইবন মুসা অল-খোয়ারেশমী; হিন্দুগণিতবিদ্‌ আর্য্যভট্ট ও গ্রীক গণিতবিদ্‌ দাওফেন্‌টাসের (Diophantus) মত ইনি আরবীয় অল-জবরার সৃষ্টিকর্ত্তা; এই অল-জবরার পূর্ব্বে আরব-গণিত বিজ্ঞানে এই জাতীয় কোন গ্রন্থ ছিল না।(২) সুপ্রসিদ্ধ গণিতবিদ্‌ গস্‌ (Gauss) বলিয়াছেন, গণিত-বিদ্যা বিজ্ঞানের মহারাণী।(৩) মহারাণী অঙ্কগণিতের জন্ম ভারতবর্ষে। অষ্টম ও নবম শতাব্দীতে ভারতীয় গণিতবিদ্‌গণ বীজগণিত (Algebra) এবং অঙ্কগণিতে (Arithmetic) প্রাচীন মুসলিম গণিতবিদ্‌গণের গুরু ছিলেন।(৪)

ওমরের অল জবর ওয়াল মোকাবলার পূর্ব্বে আরবীয় বীজগণিত

অল-কিন্দীয় গণিত-গ্রন্থ প্রকাশিত হইবার পর হইতে প্রাচীন মুসলিম গণিতবিদগণ ভারতীয় গণিত-বিজ্ঞান শাস্ত্রের সহিত সম্যক পরিচয় লাভ করেন। এই সময় হইতেই ভারতীয় গণিত-বিজ্ঞান-শাস্ত্র তাঁহাদিগের নিকট প্রিয় বস্তুরূপে পরিগণিত হইয়াছিল।(৫) ইহার ফলে মুসা-পুত্র মহম্মদ ৮২০ খৃষ্টাব্দে হিন্দু আদর্শেই তাঁহার অল-জবর

১। Encyclo of Islam.

২। Encyclo Britanica 11th edition, 1910.

৩। History of Mathematics.

৪। History of Sanskrit Literature—Macdonell.

৫। Alberuni's India, Preface, Sachau.

ওয়াল মোকাবলা রচনা করেন। তিনি আরবীয় গণিতবিজ্ঞানসাহিত্যের পুষ্টির জন্য খলিফা অল্-মামুনের আদেশে বিভিন্ন ভাষা হইতে ইহা সঙ্কলন করিয়া এই গ্রন্থের "অল্-জবর ওয়াল মোকাবলা" নামকরণ করেন।

আরব বীজগণিত-বেত্তাগণ

এই গ্রন্থ হইতে গ্রন্থকারের হিন্দু জ্যোতিষ ও গণনা-জ্ঞানের সবিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। ইনি ভারতীয় সংখ্যাবিজ্ঞানের সাহায্যে পাটি-গণিতও রচনা করেন। (১)

দ্বিতীয় খণ্ডের রচয়িতা আবুল ওয়াফা। ইনি গণিতবিদ্ মহম্মদ-রচিত অল্-জবর অবলম্বনে একখণ্ড টীকাগ্রন্থ রচনা করেন। গ্রীক গণিতবৈজ্ঞানিক দাওফেনটসের গ্রন্থাবলী আবুল ওয়াফা কর্ত্তৃক অনূদিত হয়। (২)

গ্রীক এবং ভারতীয় গণিত-বিজ্ঞানে জ্ঞানলাভ করিয়া আরবীয়েরা একনিষ্ঠা ও ব্যগ্রতা সহকারে গণিত-বিজ্ঞান-সাহিত্য সমৃদ্ধ করিতে সচেষ্ট হইলেও নবম ও দশম খৃষ্টাব্দের মধ্যে আরবীয় অল্-জবরার বিশেষ কোন উন্নতি হয় নাই। প্রকৃতপক্ষে আরবীয় অল-জবরার উন্নতির সূত্রপাত হয় একাদশ খৃষ্টাব্দে। উপযুক্ত সময়েই যোগ্য ব্যক্তির আবির্ভাব হইয়া থাকে। মুসা-পুত্র মহম্মদ এবং আবুল ওয়াফার পরই গণিতবিজ্ঞান-ক্ষেত্রে যে অসাধারণ প্রতিভাশালী গণিতবিদের আবির্ভাব হয়,—তিনি ওমর খৈয়াম। এই যুগেই গণিত-বিজ্ঞান-প্রতিভার অপ্রতিদ্বন্দ্বী সাধক ওমর খৈয়াম অল্-জবরার প্রকৃত পুষ্টিসাধন করেন।

তৃতীয় খণ্ডের রচয়িতা ফারুহি দেশ অল্-ফারুহি। ইনি গ্রীক

১। Encyclo Britanica, 9th editton, 1875.

২। Colebro k's Dissertation.

আদর্শে অল্-জবর প্রণয়ন করেন। এবং জ্যামিতি ও অল্-জবর সাহায্যে বর্গীয় সমীকরণ (Quadratic equation) সমাধান করেন। কেবল-মাত্র জ্যামিতির সাহায্যেই যে ঘন সমীকরণ সমাধান (Cubic equation) করিতে পারা যায়, ওমর খৈয়াম প্রচুর গবেষণার দ্বারা তাহা সপ্রমাণ করিয়া বৈজ্ঞানিক জগংকে চমংকৃত করেন। (১) তিনিই নূতন প্রণালীর উদ্ভাবক এবং এই প্রণালীই তাঁহার সময় হইতে, পারস্য ও আরব দেশে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। (২)

ওমরের গণিত-প্রতিভা

ওমর-রচিত নূতন অল্-জবরা একদিকে যেমন তাঁহাকে তংকালীন গণিতবিদ পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসন প্রদান করিয়াছিল, ৩) তেমনি অন্যদিকে গণিত-বিজ্ঞান-সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়া পৃথিবীর ইতিহাসে তাঁহার কীর্ত্তি চিরস্মরণীয় করিয়াছে। ঐতিহাসিক হামদুল্লা মুস্তওফি বলিয়াছেন, বিজ্ঞান-শাস্ত্রের নানা বিভাগে ওমরের কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া গেলেও, প্রকৃতপক্ষে তিনি গণিত-জ্যোতিষ-বিজ্ঞানেই চরমোংকর্ষ লাভ করিয়াছিলেন। (৪)

অন্তরীক্ষে কোন নূতন গ্রহ বা নক্ষত্র উদয় হইলে জ্যোতির্বিদমণ্ডলী যেমন আনন্দ-কোলাহল করিয়া বিস্ময়বিস্ফারিতলোচনে তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করে, ওমরের অল-জবরা প্রকাশিত হইবার পর গণিতবিদ্ পণ্ডিতমণ্ডলী গ্রন্থকারের জ্ঞান, পাণ্ডিত্য ও অদ্ভুত গবেষণা তেমনি

গণিত-বিজ্ঞানে অপ্রতিদ্বন্দ্বী সাধক ওমর খৈয়াম

১। Encyclo of Education vol ii ; Encyclo Britanica IIth- edition 1910.

২। History of Mathematics,

৩] Encyclo-Britanica, 9th edition. 1875.

৪। তারিখ-ই-গুজিদা।

সবিস্ময়ে নিরীক্ষণ করিয়াছিল। এই গ্রন্থ প্রচারের পর ওমরের প্রতিভা পাণ্ডিত্য ও যশ পারস্য ও আরবের চতুর্দ্দিকে বিস্তৃতি লাভের সঙ্গে-সঙ্গে শুধুই যে তৎকালীন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতমণ্ডলীর যশঃপ্রভা নিষ্প্রভ করিয়াছিল তাহা নহে ; উপরন্তু আরব ও পারস্য দেশকে জগতের চিন্তা-রাজ্যের শীর্ষদেশে উপনীত করিয়াছিল (১) সমগ্র পণ্ডিতসমাজ শ্রদ্ধার সহিত একবাক্যে ওমরকে গণিত-বিজ্ঞানে বিশেষজ্ঞ বলিয়া স্বীকার করিয়াছিল। চরিতাভিধানকার অল কুয়াজুনিরের উক্তি হইতে আমরা এ কথার যাথার্থ্য উপলব্ধি করিতে পারি। তিনি লিখিয়াছেন, ওমর দর্শন ও বিজ্ঞানবিশারদ ছিলেন বটে, কিন্তু গণিত-বিজ্ঞানে এরূপ বিশেষজ্ঞ ও সুপণ্ডিত ছিলেন যে, তৎকালে তাঁহার সমকক্ষ কেহই ছিল না। (২) ওমরের অল জবরা বহু শতাব্দী ধরিয়া পাঠ্যপুস্তকরূপে ব্যবহৃত হইয়া তাঁহার অতুলনীয় প্রতিভার সাক্ষ্য দিয়াছে।

ইহার পর ওমর, হেন্দেসা (জ্যামিতি) মসাহাবা (পরিমিতি) এবং ত্রিকোণমিতির কঠিন উপসিদ্ধান্তগুলির (corrolarie) টীকা রচনা করেন। অল-জবরা রচনার সময় আরবীয় গণিতবিদ্‌গণ ভারতীয় এবং গ্রীক আদর্শ গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু জ্যামিতি রচনার সময় সম্পূর্ণ গ্রীক আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া জ্যামিতি রচনা করেন। আরবীয় গণিত-বৈজ্ঞানিকগণ গ্রীক গণিত-বিজ্ঞানচর্চ্চা ও গ্রন্থ অনুবাদের ফলে গ্রীক প্রভাবান্বিত হইয়া পড়েন। এই কারণে তাঁহারা গ্রীক আদর্শে জ্যামিতি রচনা করেন। গণিত-বিজ্ঞানের এই বিভাগে সূচিচ্ছেদ গণিত সাহায্যে

ওমরের জ্যামিতি ও পরিমিতি রচনা

১। Cycło of Education, Munroe. vol iv.

২। আসর-উল-বিলাদ।

অল-জবরার সমীকরণ সমাধান দ্বারা (by solution of Algebric equations by intersecting conics) তাঁহারা কিছু জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছিলেন বটে কিন্তু ইহার কোন নির্দ্দিষ্ট প্রণালী ছিল না। একাদশ শতাব্দীতে ওমর খৈয়াম আরবীয় জ্যামিতিকে নির্দ্দিষ্ট প্রণালীতে আবদ্ধ এবং ইহার সংস্কার দ্বারা ইহাকে নূতন রূপ দান করেন। ওমর অল-জবরার ন্যায় জ্যামিতিকে উপপত্তিপরম্পরা (Theory) দ্বারা সংস্কার করিয়া সমৃদ্ধ করেন। (১)

ওমর কর্ত্তৃক জ্যামিতির নূতন রূপদান

ইহার অব্যবহিত পরেই ওমর পাটীগণিতের বর্গমূল ও ঘনফল (square and cube root) বিষয়ক আর একখানি গ্রন্থ প্রচার করেন। গণিত-বিজ্ঞান বিষয়ক উপরোক্ত গ্রন্থগুলি প্রচারিত হইলে খোরাসানের পণ্ডিতমণ্ডলী অসাধারণ প্রতিভাশালী মনস্বী আবু আলি সিনার অসামান্য প্রতিভার সহিত ওমরের নবনবোন্মেষশালিনী প্রতিভার তুলনা করিয়া তাঁহাকে "আবু আলি সিনার অবতার" আখ্যায় অভিহিত করিয়াছিল। (২) যাঁহার নবনবোন্মেষশালিনী প্রতিভা গণিত-বিজ্ঞানের দুরূহ সমস্যার সমাধান বিষয়ে তাঁহার বহু পূর্ব্ববর্ত্তী মনীষী ইউক্লিডের অপূর্ব্ব প্রতিভাকেও অতিক্রম করিয়াছিল; (৩) তিনি যে আবু আলি সিনার সহিত তুলিত হইয়া 'অবতার' আখ্যায় অভিনন্দিত হইয়া দেশবাসীর শ্রদ্ধালাভ করিবেন, ইহাতে আর বিচিত্রতা কি?

আবু আলি সিনার অবতার

আমীর আবু তাহির দরিদ্র ওমরের জ্ঞান ও প্রতিভায় চমৎকৃত

১। Encyclo Britanica 11th edition, History of Mathematics.

২। গ্যাঞ্জে দানিশ।

৩। বাজমারাই।

হইয়া যে কেবলমাত্র তাঁহাকে অর্থ-সাহায্য করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন, তাহা নহে, তিনি ওমরের প্রকৃত বন্ধু ও শুভাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। আমীর যেমন স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ওমরকে অর্থ সাহায্য করিয়া তাঁহার বৈজ্ঞানিক গবেষণার পথ উন্মুক্ত করিয়া গিয়াছিলেন, তেমনি শুভকামনা করিয়া তাঁহার পাণ্ডিত্য-প্রতিভার কথা সুলতান মলিক শাহের মন্ত্রী, বন্ধু নিজাম-উল-মুল্কের কর্ণগোচরও করেন; এবং পরে ওমরকে সুপণ্ডিত নিজাম-উল-মুল্কের সহিত পরিচিত করিয়া দেন। নিজাম-উল-মুল্ক নিজে যেরূপ বিদ্যোৎসাহী ও গুণগ্রাহী ছিলেন, তেমনি সাহিত্য-রসিক ও সুপণ্ডিত ছিলেন। আমীর আবু তাহিরের মত, তিনিও ওমরের প্রতিভায় মুগ্ধ হইয়া বৈজ্ঞানিক গবেষণা-কার্য্যে তাঁহাকে উৎসাহিত করেন। এই সময় হইতে দরিদ্র ওমর সুপণ্ডিত নিজাম-মুল্কের অনুগ্রহদৃষ্টিতে পতিত হইয়া তাঁহার বন্ধু-শ্রেণীভুক্ত হন।(১)

নিজাম-উল মুল্কের অনুগ্রহ-দৃষ্টিলাভ

ইহার কিছুদিন পরেই ওমরের অল্-জবরা প্রকাশিত হয়। ওমর কোনকালেই অকৃতজ্ঞ ছিলেন না। যাঁহার উদার ও স্বতঃপ্রবৃত্ত অর্থ-সাহায্য তাঁহাকে দারিদ্র্য-মুক্ত করিয়া তাঁহার বৈজ্ঞানিক গবেষণার পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিল, যাঁহার স্নেহ-শীতল উদার হৃদয়ে স্নেহসিক্ত বন্ধুর স্থান পাইয়া ধন্য হইয়া ছিলেন, ওমর খৈয়াম তাঁহার প্রথম গ্রন্থ অল্-জবরা বন্ধুত্ব ও শ্রদ্ধার নিদর্শন-স্বরূপ সেই উদার হৃদয় বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষক আবু তাহিরের নামে উৎসর্গ করেন। মন্ত্রী নিজাম-উল-মুল্ককেও ওমর তাঁহাব গণিত গ্রন্থ উপহার প্রদান করিয়া ধন্য হয়েন। আমীর আবু তাহিরের মত, মন্ত্রীও ওমরের প্রকৃত বন্ধু ও শুভাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। তিনি

অল-জবরা উৎসর্গ

১। Maarif 1925.

এই নবপ্রচারিত অল্-জবরা গ্রন্থে ওমরের অসাধারণ অধ্যবসায়, অতুলনীয় পাণ্ডিত্য ও অভূতপূর্ব্ব গবেষণার পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হয়েন। বন্ধু ওমরের বিজ্ঞান-প্রতিভা যাহাতে রাজ-সম্মানে ভূষিত ও পুরস্কৃত হয়, তাহার জন্য তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার পাণ্ডিত্য ও প্রতিভার কথা সুলতান মলিক শাহের কর্ণগোচর করেন। সুলতান মন্ত্রীর মুখে ওমরের পাণ্ডিত্য-প্রশংসাবাদ শ্রবণ করিয়া ওমরকে দরবারে উপস্থিত করিবার জন্য আজ্ঞা প্রদান করেন। সুলতানের আজ্ঞা তৎক্ষণাৎ প্রতিপালিত হয়; রাজদূত প্রধান মন্ত্রীর আজ্ঞায় নিশাপুরে ওমরের পর্ণকুটীরে উপস্থিত হইয়া রাজ-দরবারে উপস্থিত হইবার জন্য মন্ত্রী প্রেরিত আহ্বানপত্র প্রদান করে। ওমর সুলতানের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া নিজাম-উল মুল্ককেরও গৃহে উপস্থিত হন। মন্ত্রী সমস্ত ঘটনা ওমরকে জ্ঞাত করেন। কৃতজ্ঞতায় ওমরের দুই চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠে। ওমর যথাসময়ে দরবারে উপস্থিত হইলে নিজাম-উল-মুল্ককেও সুলতানের সহিত ওমরের পরিচয় করিয়া দেন। এই সময় হইতে ওমর খৈয়াম সুলতানের দরবারের অন্যতম বিদ্বান-পারিষদরূপে সম্মানিত হন। ইহার পর ওমর নিশাপুরের পর্ণকুটীর ত্যাগ করিয়া রাজধানী মারভ নগরে অবস্থান করিতে থাকেন।

ওমর-প্রতিভার সম্মান

বিদ্বান পরিষদ

সত্যসাধক ওমরের গণিত-বিজ্ঞান পুস্তকাবলী আজকাল আর পাওয়া যায় না; তবে তন্মধ্যে দুই-একখণ্ড পুস্তক ইয়োরোপের কোন কোন প্রসিদ্ধ পাঠাগারে আজিও শ্রদ্ধায় সহিত রক্ষিত হইয়া পাঠাগারের সংগ্রহের মূল্য বৃদ্ধি করিতেছে। ওমরের অল্-জবরার প্রতিলিপি হল্যাণ্ডের লীডেন পাঠাগারে অদ্যাবধি সযত্নে রক্ষিত আছে। ১৭৪২ খৃষ্টাব্দে

ওমরের গণিত-বিজ্ঞান গ্রন্থাবলী

ডচ্ (Dutch) গণিতবিদ্ জেরল্ড মুরম্যান (Gerald Murmann) তাঁহার "Specimen Calculi Fluxionals" নামক পুস্তকের উপক্রমণিকায় ওমরের অল্-জবরার বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে গণিতবিদ্ শেডিলো (Shedilot) Nouv Jour. Asiatique পত্রিকায় বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। (১) প্যারিস ও লীডেন পাঠাগারে ওমরের অল-জবরার যে পাণ্ডুলিপি রক্ষিত আছে, ইতালীয় গণিতবিদ্ লিব্রী (Libri) প্রথমে উহা আবিষ্কার করেন। (২) উহাই ফরাসী গণিত-বৈজ্ঞানিক মুঁশো উপেক (M. F. Woepeck) ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে ফরাসী ভাষায় অনুবাদ ও সম্পাদন করেন। অনূদিত পুস্তকের বামদিকে মূল আরবী ও দক্ষিণদিকে ফরাসী অনুবাদ দৃষ্ট হয়। সুপণ্ডিত মুশোঁ উপেক এই অল্-জবরার অন্তর্গত অনুশীলনীর শ্রেণীবিভাগ, সূক্ষ্ম এবং সঠিক শৃঙ্খলাপুর্ণ অনুশীলন প্রণালীর বিষয় উচ্ছ্বসিত ভাষায় তাঁহায় অনূদিত পুস্তকের উপক্রমণিকায় শ্রদ্ধার সহিত উল্লেখ করিয়াছেন।

ওমর-রচিত ইউক্লিডের জ্যামিতির স্বীকার্য্য বিষয়ক আর একখানি টীকা-গ্রন্থ লীডেন পাঠাগারে অদ্যাপি সযত্নে রক্ষিত আছে। ওমরের গণিত-বিজ্ঞান-বিষয়ক আরবী ভাষায় লিখিত মূল পুস্তকগুলি লীডেন, প্যারিস ও ইণ্ডিয়া পাঠাগারে রক্ষিত আছে। লীডেন পাঠাগারে পাটীগণিতের দুর্বোধ্য সমস্যা নিরাকরণ বিষয়ক আর একখানি গ্রন্থ রক্ষিত আছে। এই গ্রন্থখানির নাম "মুসকিলাত-ই-হিসাব।"(৩)

১। Historc of Mathematics ; Encyclo of Britanica. 1910.

২। Historic des sciences mathematiques en Itali.'

৩। Cyclo of Education. Monroe.

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

মুসলিম জ্যোতির্বিজ্ঞান

প্রাচীন মুস্‌লিম সম্প্রদায় জ্যোতির্বিজ্ঞানকে "ইল্‌ম্‌-উং-তানজিম" নামে অভিহিত করিতেন। ইহাতে ফলিত জ্যোতিষ ইল্‌ম্‌-আহ্‌কাম্‌-উম্‌-নুজুম (Science of art of the decrees of the stars) এবং গণিত জ্যোতিষ ইল্‌ম্‌-উন-নুজুম (Science or art of stars) উভয়কেই বুঝাইত। ইব্‌নে রোশদ্‌ (১) গণিত-জ্যোতিষকে (Astronomy) প্রত্যক্ষৈকবাদ নক্ষত্র-বিজ্ঞান (Experimental art of stars) এবং ফলিত জ্যোতিষকে (Astrology) গণিত-বিজ্ঞান-মূলক নক্ষত্র-বিজ্ঞান (Mathemetical art of stars) নামে অভিহিত করিয়াছেন।(২)

আরব জ্যোতির্বিজ্ঞান

প্রাচীনকালে পারস্য দেশে জ্যোতির্বিজ্ঞানের সবিশেষ সমৃদ্ধি হইয়াছিল। পারশিক যাজকমণ্ডলী, জ্যোতির্বিজ্ঞানে সবিশেষ পারদর্শী

১। ইহার সম্পূর্ণ নাম আবুল ওয়ালিদ মহম্মদ বিন আহমদ। স্পেনের অন্তর্গত কর্ডোভা শহরে ১১৪৯ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন; ইনি দর্শন, বিজ্ঞান, ব্যবস্থাশাস্ত্র, দেবতত্ত্ব, গণিত-বিজ্ঞান ও জ্যোতির্বিজ্ঞানে অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। আরিস্তোতলের গ্রন্থাবলী আরবী ভাষায় অনুবাদ, ব্যাখ্যা ও টীকা প্রচার করেন।

২। Encyclo of Religion and Ethics.

ছিলেন। তৎকালে পারশিকগণের প্রত্যেক জাতীয় উৎসব, ধর্মানুষ্ঠানে চন্দ্র, সূর্য্য ও নক্ষত্রের পূজা হইত।(১) পারশিক ধর্মের প্রবর্ত্তক জোরাস্তার

জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক জোরাস্তার

শ্রেষ্ঠ জ্যোতির্বিদ ছিলেন (২)। তিনি জ্ঞানী ও পয়গম্বর বা ঈশ্বরের বর্ত্তাবহরূপে যেমন গ্রীক পণ্ডিতগণের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন, তেমন জ্যোতির্বিদরূপেও শ্রদ্ধান্বিত ছিলেন।(৩)

পঞ্চম খৃষ্টাব্দে পারশ্যপতি নওশেরওয়াঁ পারশ্যের পশ্চিম-প্রান্ত-দেশ—জামদিশপুরে দর্শন ও বিজ্ঞান অনুশীলনের জন্য এক মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। এই মাদ্রাসায় গ্রীক জ্ঞানানুশীলনের যে সূচনা হয়, পরে উহা জ্ঞান বিজ্ঞান অনুশীলনের কেন্দ্রস্থানে পরিণত হইয়া আব্বাসবংশীয় খলিফাগণের রাজত্ব ওময় পর্যন্ত জ্ঞানালোক বিতরণ করিয়াছিল।(৪)

দ্বিতীয় হিজরাব্দে (খৃঃ সপ্তম খৃষ্টাব্দে) পারাশ্যর মুসলিম রাজত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার পর হইতে আব্বাসবংশীয় খলিফাগণের উৎসাহ ও যত্নে জ্যোতির্বিজ্ঞানের সমূহ উন্নতি হয়।

ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, মুসলিম পণ্ডিতগণ প্রথমে

জ্যোতির্বিজ্ঞানের বিরুদ্ধবাদী দল

জ্যোতির্বিজ্ঞানকে বিজ্ঞান হিসেবে গণ্য করেন নাই।(৫) অধিকাংশ মুসলিম দার্শনিক ধর্মতত্ত্ব ও ব্যবস্থাশাস্ত্রবিদ্ জ্যোতির্বিজ্ঞানের বিরোধী ছিলেন। কেবলমাত্র অল-কিন্দী এবং ফখরুদ্দীন রাজী বিরুদ্ধবাদী ছিলেন

১। Essays on the Religion of the Parsis, Haug.
২। Zoraster Jackson
৩। Encyclo of Religion and Ethics.
৪। Encyclo Britanica 9th edition 1875.
৫। Encyclo of Islam.

না। জ্যোতির্বিজ্ঞানের বিরুদ্ধবাদী দল সৃষ্টি হইবার একমাত্র কারণ—গ্রীক প্রভাব। কারণ দেখা যায় যে, দ্বিতীয় হিজরাব্দের শেষ ভাগে মুসলিম দার্শনিকগণ গ্রীক দার্শনিক আরিস্তোতলের (Aristotle) গ্রন্থাবলী পাঠ করিয়া অসাধারণ জ্ঞানের অধিকারী হন। ইহার ফলে তাঁহারা দেশ মধ্যে প্রচার করেন যে, জ্যোতির্বিজ্ঞান কুসংস্কার ও কাল্পনিক ভিত্তির উপর স্থাপিত এবং অনুশীলনের অযোগ্য। সুতরাং জ্ঞান-রাজ্যে ইহার কোন স্থান নাই। অল-ফ্যারাবী, আবু সিনা ও ইবেন রোশদ্ প্রমুখ যুগ-প্রসিদ্ধ দার্শনিকগণ এই মত প্রচার করেন। গ্রীক-জ্ঞান-প্রতীক আবু-সিনা প্রমাণ করেন যে, জ্যোতির্বিজ্ঞানের কোন প্রকার ভিত্তি বা কোন প্রকার সিদ্ধান্তাত্মক সত্য (Theoretical truth) নাই; পরন্তু অন্ধ কুসংস্কারে পূর্ণ। সুতরাং এরূপ বিজ্ঞান অনুশীলনের অযোগ্য। আবু-সিনার মত অল্-ফ্যারাবী ও ইবনে রোশদ্ গ্রীক দর্শনে অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। ইহারাও আপন আপন যুক্তি দ্বারা জ্যোতির্বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে মত প্রচার করেন। কেবলমাত্র দার্শনিক অল-কিন্দীই ইহার অনুকূলে মত প্রচার করিয়াছিলেন। একমাত্র তিনিই জ্যোতির্বিজ্ঞানকে দর্শন-শাস্ত্রের সম্পূরক অংশ (integral part of philosophy) বলিয়া প্রচার করেন। নিজ মত প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য তিনি এই বিজ্ঞানের ভিত্তি বা উৎস পর্য্যন্ত অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। গণিত-বিজ্ঞান ব্যতীত তিনি প্রাকৃত ও অধ্যাত্ম দর্শনের মতবাদের মধ্যেও ইহার ভিত্তি অনুসন্ধান করিয়াছিলেন।(১)

কারণ

আবু-সিনা ও জ্যোতির্বিজ্ঞান

দার্শনিকগণের পর, ধর্মতত্ত্ব ও ব্যবস্থাশাস্ত্রবিদগণও স্থির ছিলেন না।

১। Encyclo of Islam. Encyclo of Religion and Ethics.

মানুষের কার্য্যের বা শক্তির উপর গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাব কিরূপ, তাহাই তাঁহারা লক্ষ্য করিতেছিলেন; জ্যোতির্বিদগণ যখন গণনার দ্বারা স্থির করিয়া অকুতোভয়ে প্রচার করিল যে, নবোত্থিত ইস্‌লামের স্থায়িত্ব বা স্থিতিকাল অধিক দিন নহে, তখন তাঁহারা অধৈর্য্য হইয়া ইহাদিগের প্রগল্‌ভ যুক্তি বা গণনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। (১)

দার্শনিক, ধর্ম্মতত্ব ও ব্যবস্থাশাস্ত্রবিদগণ ও জ্যোতির্বিজ্ঞান

অনুকূল-প্রতিকূল-অবস্থার মধ্য দিয়া জ্যোতির্বিজ্ঞান ধীরে ধীরে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছিল। প্রথমে যাঁহারা এই বিজ্ঞানের বিরুদ্ধবাদী ছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই আপনাদিগের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া পুনরায় ইহার অনুকূলে মত প্রচার করেন। উদাহরণস্বরূপ বিরুদ্ধবাদী দলের অগ্রণী আবু-সিনার নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি অবশেষে স্বীকার করেন যে, জ্যোতির্বিজ্ঞান বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর স্থাপিত এবং ইহা সিদ্ধান্তাত্মক সত্যে পূর্ণ। ইস্পাহানে অবস্থান-কালে তিনি জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্পর্কে অনেকগুলি সুবৃহৎ পুস্তকও রচনা করেন। (২) এই সময় হইতে মুসলিম সম্প্রদায়ের বহু বিদ্বান এই বিদ্যাকে (Science) বিজ্ঞান-হিসাবে অনুশীলন করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।

বিরুদ্ধবাদী দলের ভ্রম সংশোধন

ইস্‌লামের প্রারম্ভকালে জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্বন্ধে আরব জাতির মোটামুটি সাধারণ জ্ঞান ছিল। যাযাবর-জীবনযাপনকারী বেদুঈনগণ প্রখর সূর্য্যালোক অপেক্ষা রাত্রিকালই, স্নিগ্ধচন্দ্রকিরণস্নাত মরুভূমি

১। Encyclo of Religion and Ethics.

২। Encyclo of Religion and Ethics.

অতিক্রমণের প্রশস্তকাল স্থির করিয়াছিল। নিশাভ্রমণে, চন্দ্রদেব ও নক্ষত্ররাশিই তাহাদিগের পথি-প্রদর্শকের কাজ করিত। চন্দ্র এবং নক্ষত্ররাশির গতিবিধি, উদয় এবং অস্তকাল হইতেই তাহারা মোটামুটি রাত্রির কাল নির্দ্ধারণ করিত। চন্দ্র এবং নক্ষত্রপুঞ্জের গতিবিধি এবং অবস্থিতি পরিদর্শন করিয়া বেদুঈনগণ সমস্ত ঋতুকালও মীমাংসা করিত।(১)

মুস্লিম জ্যোতির্বিজ্ঞানের উৎপত্তি হিন্দু, গ্রীক, পারশিক এবং মিশরীয় জ্ঞান-উৎস হইতে। (২ প্রথম মুস্লিম জ্যোতিষ গ্রীক-প্রভাবান্বিত ছিল। গ্রীক পণ্ডিতগণের গণনা ও সিদ্ধান্তানুসারে মুস্লিম সম্প্রদায় জ্যোতির্বিজ্ঞান আলোচনা করিতেন। দ্বিতীয় হিজরাব্দ (সপ্তম খৃষ্টাব্দ) হইতে তাঁহারা হিন্দু প্রভাবান্বিত হইয়া হিন্দু জ্যোতির্বিদ ব্রহ্মগুপ্ত (৫৯৮ খৃঃ) প্রণীত ব্রহ্মস্ফুটসিদ্ধান্ত অবলম্বনে জ্যোতির্বিজ্ঞান অনুশীলন করেন। ৩ ব্রহ্মগুপ্তের স্ফুটসিদ্ধান্ত ৬২৮ খৃষ্টাব্দে রচিত ও ৭৭১ খৃষ্টাব্দে বোগদাদে আনীত হয়। জ্যোতির্বিদ ইব্রাহিম বিন-হবিব-অল-খাজারি এবং ইয়াকুব-বিন্-তারিখ তৎকালীন প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদগণ স্ফুটসিদ্ধান্ত অবলম্বন করিয়া মুস্লিম জ্যোতির্বিজ্ঞান গ্রন্থ রচনা করেন। (৪) ইহার পর আর্য্যভট্ট (৪৭৬ খৃঃ) রচিত আর্য্যসিদ্ধান্ত অবলম্বনে আবুল-হাসান-অল-আহোয়াজী গ্রহগণের গতির তালিকা। (Tables of Planatery movements) প্রস্তুত করেন। আর্য্যভট্টের সিদ্ধান্ত পুস্তক পাঁচশত খৃষ্টাব্দে রচিত। ব্রহ্মস্ফুট-

মুস্লিম জ্যোতির্বিজ্ঞানের উপর ভারতীয় সিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলীর প্রভাব

১। Encyclo of Islam.

২। Encyclo of Religion and Ethics.

৩। Encyclo of Islam.

৪। Encyclo Britanica 11th edition; Alberuni's, India, preface Sachau.

সিদ্ধান্ত ও আর্য্য-সিদ্ধান্ত একই সময়ে বোগদাদে আনীত হয়। উপরোক্ত ভারতীয় গ্রন্থাবলী তৎকালে মুসলিম্ জ্যোতির্বিদমণ্ডলীর উপর অশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।(১)

স্ফুটসিদ্ধান্ত ও আর্য্যসিদ্ধান্ত গ্রন্থদ্বয় জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর গতিবিধির অসংখ্য তালিকা এবং সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যায় পূর্ণ। এই তালিকাগুলি কৃত্রিম সহস্র চক্রানুসারে গ্রথিত। তৎকালপ্রচলিত বিশ্বাস ছিল যে, সৃষ্টির প্রাক্কালে চন্দ্র এবং গ্রহ সকল যেমন দ্রাঘিমান্তরে সমান ভাবে মিলিত হইয়াছিল, সহস্র সহস্র বৎসর পরেও পুনরায় ঠিক সেইরূপ সমান ভাবে মিলিত হইবে। পঞ্চম হিজরাব্দ পর্য্যন্ত এই সিদ্ধান্ত অনুসারে মুসলিম জ্যোতির্বিদগণ জ্যোতির্বিজ্ঞান রচনা করিয়া ইহার "অল্-সিন্ধ-হিন্দ" (হিন্দু-সিদ্ধান্ত নামকরণ করেন।(২) হিন্দু পণ্ডিতগণের রচিত পুস্তকাবলী হইতে মুস্‌লিম সম্প্রদায় ত্রিকোণমিতির জ্যা ব্যবহার প্রণালী শিক্ষা করেন।(৩)

ইহার পর মুসলিম জ্যোতির্বিদগণ পহলবী ভাষায় রচিত জ্যোতিষিক-তালিকার (জীক্-অল্-শাহী) সাহায্যে নিজ নিজ জ্যোতিষিক-তালিকা রচনা করেন এবং ইহার আরবী অনুবাদও প্রচার করেন। জীক্-অল-শাহী শাসানিয়া রাজবংশের রাজত্বকালে রচিত হইয়াছিল।

ইহার অব্যবহিত পর তাঁহারা মিশরীয় পণ্ডিত টলেমীর বিশ্ববিশ্রুত জ্যোতিষগ্রন্থ "অল-মাজেস্ত" অবলম্বনে জ্যোতির্বিজ্ঞান অনুশীলন করেন।

১। Encyclo of Britanica 11th edition.

২। Encyclo of Britanica 11th edition.

৩। Encyclo of Islam.

খৃষ্টীয় নবম শতাব্দী হইতে দেখা যায় যে, অন্তরীক্ষ জগৎ পর্য্যবেক্ষণ কার্য্যের সুবিধার জন্য মুসলিম জ্যোতির্বিদগণ মান-মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন।

মান-মন্দির প্রতিষ্ঠা

পারস্যের বুয়াইদ্ সুলতানগণের উৎসাহে ও যত্নে মুসলিম জ্যোতি-র্বিজ্ঞানের সমূহ উন্নতি হয়। বুয়াইদ সুলতানগণ বিদ্যোৎসাহী ও বিদ্বানগণের উৎসাহদাতা ছিলেন।

অসাধারণ জ্ঞানী, বিদ্বান, বিশ্ববিখ্যাত ঐতিহাসিক, ভারত-পর্য্যটক আবু-রাইহান-অল-বেরুণী মুসলিম জ্যোতির্বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব্ব সংস্কার ও উন্নতি সাধন করেন। তাঁহার জ্যোতির্বিজ্ঞান গ্রন্থাবলী বিজ্ঞান-সাহিত্যকে যেরূপ সমৃদ্ধ করিয়াছিল, বৈজ্ঞানিক-জগতেও তদ্রূপ নবযুগের সৃষ্টি করিয়াছিল।

ওমরের আবির্ভাব

ইহার পরই সেলজুক নরপতিগণের উৎসাহে জ্যোতির্বিজ্ঞানের অভাবনীয় উন্নতি হয়। সুলতান মলিক শাহ, ৪৬৭ হিজরাব্দে (১০৭৪ খৃঃ) মান মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। এই যুগেই পারস্যের শ্রেষ্ঠ জ্যোতির্বিদগণের প্রতিভা ম্লান করিয়া জ্ঞান-প্রতিভার উজ্জ্বল বর্ত্তিকা হস্তে বিশ্ববিশ্রুত বৈজ্ঞানিক-কবি ওমর খৈয়াম বিজ্ঞান-জগতে আবির্ভূত হন। সুলতান মলিক শাহের আদেশে প্রতিভার অবতার জ্যোতি-র্বিদ্যাগ্রগণ্য বিশ্ববিখ্যাত ওমর খৈয়াম ১০৭৯ খৃষ্টাব্দে চান্দ্রমাসের পরিবর্ত্তে সৌরমাস গণনার প্রথা প্রচলিত করিয়া পারস্যের প্রচলিত পঞ্জিকার সংস্কার করিয়া পৃথিবীর ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়েন।

ওমরের নবনবোন্মেষশালিনী বৈজ্ঞানিক-প্রতিভা কেবলমাত্র বৈজ্ঞানিক ওমরকে বিশ্ব-ইতিহাস-পৃষ্ঠায় চিরস্মরণীয় করিয়াছে তাহা নহে,—তাঁহার সহিত সেলজুক সম্রাট মলিক শাহের নামও চিরস্মরণীয় করিয়াছে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

জ্যোতির্বিদ ওমর খৈয়াম

ওমর খৈয়াম প্রথম জীবন হইতেই দার্শনিক ছিলেন। তিনি গৃহে বসিয়া দর্শনের অধ্যাপনা করিতেন। তৎকালে জনসাধারণের দর্শন শাস্ত্রে অনুরাগ না থাকায়, অল্প লোকেই উহা অধ্যয়ন করিত। সেই কারণ তিনি দর্শন শাস্ত্র অধ্যাপনা দ্বারা উদরান্নের সংস্থান করিতে পারেন নাই। তিনি যখন সুলতান মলিক শাহের রাজত্ব সময়ে (৪৬৫—৪৮৫ হিঃ) মারভে আগমন করেন, তখন তিনি দার্শনিকরূপে যশের উচ্চশিখরে অধিষ্ঠিত ছিলেন। জ্যোতির্বিদরূপেই তিনি অর্থোপার্জ্জন করেন। একথা তিনি দুঃখের সহিত তাঁহার "অল-জবর ওয়াল মোকাবলা" নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থের উৎসর্গপত্রে বিবৃত করিয়াছেন।

ইতিহাস-প্রসিদ্ধ, ভারত-পর্য্যটক, জ্যোতির্বিদ আবু রাইহান অল-বেরুণী জ্যোতিঃশাস্ত্রের সংজ্ঞা এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন :—

যে শাস্ত্র পাঠ করিলে জ্যোতিপথস্থিত জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর (Heavenly bodies) স্বরূপ, সঞ্চার, পরিভ্রমণকাল, গ্রহণ, পরস্পরের অন্তর ও তৎসম্বন্ধীয় ঘটনাবলী এবং তাহাদিগের গতি, স্থিতি ও সঞ্চারানুসারে মানব জীবনের শুভাশুভ বিষয় নিরূপণ করিতে পারা যায়, তাহাকে জ্যোতির্বিজ্ঞান কহে।

জ্যোতির্বিজ্ঞানের সংজ্ঞা

অল্-বেরুণী জ্যোতির্বিদের সংজ্ঞা এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন—যিনি (১) গণিত বিজ্ঞান (Mathemetics), (২) সৃষ্টি-বিজ্ঞান

(Cosmography) এবং (৩) ফলিত জ্যোতিষ (Judicial astrology)—এই তিন বিদ্যায় (Science) সবিশেষ পারদর্শিতা লাভ না করিবেন, তিনি "জ্যোতির্বিদ" নামে অভিহিত হইবার যোগ্য নহেন।

মূনাজ্জিম-ই-শাহী

মনীষার মূর্ত্ত অবতার ইমাম ওমর খৈয়াম, সুলতান মলিক শাহের দরবারে বিদ্বান-পারিষদ শ্রেণীভূক্ত হইবার পর, নিজ প্রতিভাগুণে "মুনাজ্জিম-ই-শাহীর" (রাজ-জ্যোতিষী) উচ্চপদে উন্নীত হন।(১) সুলতান মলিক শাহের আদেশে তিনি ইরাণ দেশের প্রচলিত পঞ্জিকার সংস্কার দ্বারা জ্যোতির্বিজ্ঞানে চরম জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়া গণিত-বিজ্ঞানের মত জ্যোতির্বিজ্ঞানেরও অভূতপূর্ব্ব সংস্কার ও ঐ সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেন।

সুলতানের পঞ্জিকা সংস্কারের ইচ্ছা

সুলতান মলিক শাহ বহুকাল হইতে পারস্যের প্রচলিত পঞ্জিকার সবিশেষ সংস্কার আকাঙ্খা মনে মনে পোষণ করিতেছিলেন, কিন্তু উপযুক্ত ব্যক্তির অভাব ও পঞ্জিকা-সংস্কার-কার্য্য মুসলিম ধর্ম্মশাস্ত্রানুমোদিত হইবে কি না চিন্তা করিয়া এই কার্য্যে প্রথমতঃ অগ্রসর হইতে পারেন নাই। তিনি যে কারণে ইরাণের প্রচলিত পঞ্জিকার আমূল সংস্কার-প্রয়াসী হইয়াছিলেন. তাহা নিম্নে বিবৃত হইল।

সংস্কারের কারণ

পারস্য দেশ যখন মুসলমান নরপতিগণের অধিকারে আইসে, সেই সময় তাঁহারা বিজিত জাতীয় আচার-ব্যবহারের উপর হস্তক্ষেপ করিতেন না; হিজরাব্দ প্রচলিত থাকা সত্ত্বেও তাঁহারা পারস্যের পুরাতন অব্দই বজায় রাখিয়াছিলেন। ৪৬৫ হিজরাব্দে (১০৭৩ খৃঃ) পারস্য রাজতন্ত্র শেলজুক সুলতান জলাল উদ্দিনের

১। Geographie d'Abulfeda, Reinaud.

অধীনস্থ হয়। সুলতান আলপ আরসলানের মৃত্যুর পর মলিক শাহ রাজ্যভার গ্রহণ (৪৬০ হিঃ) করিয়া সুলতান পদে অধিষ্ঠীত হয়েন। তাঁহার রাজ্য-রশ্মি গ্রহণ করিবার পরও দেশপ্রচলিত পঞ্জিকানুসারেই রাজ্যশাসন এবং রাজস্ব গ্রহণ কার্য্য চলিতেছিল ; কিন্তু ইহা পারস্যের প্রাচীন পঞ্জিকানুযায়ী ছিল না বলিয়া তাঁহার মনঃপূত হয় নাই। কারণ তৎকালে সৌরমাস (১) হিসাবে রাজস্ব গ্রহণ এবং চান্দ্রমাস (২) হিসাবে ব্যয় নির্ব্বাহ করা হইত। ইহাতে হিসাব রক্ষা কার্য্যের নানারূপ অসুবিধা হইত। এইভাবে রাজস্ব গ্রহণ ও ব্যয়ের হিসাবে দেখা যায় যে, এক বৎসরে (৪৬৭ হিঃ ১০৭৫ খৃঃ) রাজকোষ কপর্দ্দকশূন্য হইয়াছে। এই কারণে সুলতান প্রচলিত পঞ্জিকার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া রাজস্ব গ্রহণ, রাজ্যশাসনকার্য্য এবং ব্যয় নির্ব্বাহের সুবিধার জন্য চান্দ্রমাসের পরিবর্ত্তে সৌরমাস গণনা করাইয়া ইহার আমূল সংস্কারের জন্য দৃঢ় প্রয়াসী হন।

এই কারণ তিনি প্রথমেই ধর্ম্মতত্ত্ববিদ্ বিচক্ষণ উলেমাগণের সহিত এই বিষয়ে পরামর্শ করিয়া কবিসা (পরিবর্ষ Leap year) প্রবর্ত্তনের ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

সুলতান প্রথমে উলেমাগণের নিকট জানিতে চাহেন যে, উক্ত সংস্কার মুসলিম ধর্ম্মশাস্ত্র বিরোধী কিনা। ইহার উত্তরে উলেমাগণ একবাক্যে বলেন, নূতন পঞ্জিকার প্রবর্ত্তন ইস্লাম-বিরোধী কর্ম্ম নহে। তাঁহারা

১। সূর্য্যের এক রাশি অতিক্রম করিতে যতদিন অতিবাহিত হয়, ততদিন এক মাস হয় এবং ঐ মাসকে সৌরমাস কহে।

২। এক তিথিতে এক চান্দ্র দিবস ; ৩০ তিথিতে অর্থাৎ এক প্রতিপদ হইতে অমাবস্যা পর্য্যন্ত অথবা অন্য যে-কোন এক তিথি হইতে তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী তিথি পর্য্যন্ত ৩০ তিথিতে এক চান্দ্রমাস হয়।

সুলতানকে আরও জানান যে রাষ্ট্রীয় এবং রাজ্যশাসন কার্য্যের পরিচালনার সুবিধার জন্য চান্দ্রমাসের পরিবর্ত্তে সৌরমাস প্রচলন মুসলিম বিধি-ব্যবস্থার বিরোধী হইবে না। কোরান কেবলমাত্র ন্যসি (১) ব্যবহার করিতেই নিষেধ করিয়াছেন। এই কারণেই কোরান বলিতেছেন, মাস পিছাইয়া দেওয়া ঈশ্বরনিন্দাসূচক অপকর্ম্মের তুল্য দূষণীয়। এরূপ কর্ম্ম দ্বারা ধার্ম্মিকগণকে প্রকৃত ধর্ম্মপথ হইতে বিচ্যুত করা হইবে; তাহারা কোন বৎসরের এক মাসকে কখনও শাস্ত্রীয় এবং পরবৎসরে উহাকেই অশাস্ত্রীয় মাস হিসাবে গণ্য করিবে। তাহাদিগের এই দেবনিন্দাসূচক অপকর্ম্ম আল্লা ক্ষমা করিবেন না—তাহাদিগকে মুক্তিও দান করিবেন না।(২)

মোটের উপর জাগতিক ক্রিয়াকর্ম্মের জন্য চান্দ্রমাসের পরিবর্ত্তে সৌরমাস প্রচলন দূষণীয় নহে। এই কারণেই বিচক্ষণ উলেমাগণ সুলতান মলিক শাহকে চান্দ্রমাসের পরিবর্ত্তে সৌরমাস প্রচলনে আদেশ দিয়া তাঁহার শুভ সঙ্কল্প—সংস্কার কার্য্য একবাক্যে অনুমোদন করেন।

ওমরের পঞ্জিকা সংস্কারের দায়িত্বভার গ্রহণ

সুলতান, মন্ত্রী নিজাম-উল-মুল্কের সহিত পরামর্শ করিয়া মুনাজ্জিম-ই-শাহী সুপণ্ডিত ওমর খৈয়ামকে পঞ্জিকা-সংস্কার কার্য্যের সম্পূর্ণ উপযুক্ত ব্যক্তি স্থির করিয়া তাঁহাকেই এই কার্য্যের গুরুভার অর্পণ করেন। সুলতানের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া জ্যোতির্বিদগণাগ্রগণ্য ওমর খৈয়াম সানন্দে পঞ্জিকা-সংস্কার কার্য্যের গুরুদায়িত্বভার গ্রহণ;

১। আরবজাতির মধ্যে শান্তির মাস বলিয়া পরিচিত। এই মাসে তাঁহারা যুদ্ধ হত্যা, লুণ্ঠন ও অভিযানে বহির্গত হন না।

২। সুরাৎ-উৎ-তৌবা।

করেন। ওমরের পঞ্জিকা-সংস্কার কার্য্যের সুবিধার জন্য সুলতান মলিক শাহ্ ৪০৬ হিজরাব্দে (১০৭৩ খৃঃ) মানমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন।

মন্ত্রণা-পরিষদ

৪৭১ হিজরাব্দে (১০৭৯ খৃষ্টাব্দের ১৫ই মার্চ্চ) ওমর পঞ্জিকা-সংস্কার কার্য্য আরম্ভ করেন। সাতজন সুবিখ্যাত জ্যোতির্বিদ লইয়া মন্ত্রণা-পরিষদ গঠিত হয়। এই সাতজন জ্যোতির্বিদ ইমাম্ ওমর কর্তৃক নির্ব্বাচিত হন। ওমর পরিষদের সভাপতিরূপে কার্য্য করেন। যে সাতজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ জ্যোতির্বিদ লইয়া মন্ত্রণা-পরিষদ গঠিত হয়, তাঁহাদিগের সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

১। খোয়াজা আবু হাতিম উল-মুজাফর্ ইসফারাজি। ইনি ওমরের সমসাময়িক, বন্ধু ও গণিত-জ্যোতিষ-খগোলশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। এই তিন বিষয়ে তিনি অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। এই গ্রন্থগুলি তাঁহার পাণ্ডিত্য-প্রতিভার পরিচায়ক। তিনি বহু পরিশ্রম ও মস্তিষ্ক চালনা করিয়া বৈজ্ঞানিক-রীতিতে একটি তুলাদণ্ড প্রস্তুত করেন। এই তুলাদণ্ড সম্বন্ধে একখণ্ড নাতিবৃহৎ গ্রন্থও (Treatise) প্রস্তুত করেন। এই গ্রন্থে তিনি তুলাদণ্ড সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, এই তুলাদণ্ড দ্বারা সূক্ষ্ম তৌল এবং বিশুদ্ধ অথবা খাদ-মিশ্রিত স্বর্ণ অথবা রৌপ্য বুঝিতে পারা যাইবে। রাজকীয় ধনাগারের কঞ্চুকীর নিকট পরীক্ষার জন্য তিনি এই তুলাদণ্ডটি প্রেরণ করেন। কঞ্চুকীর নিজ চৌর্য্যবিদ্যা প্রকাশ হইবার ভয়ে এই মূল্যবান সূক্ষ্ম তুলাদণ্ডটির এক অংশ ভগ্ন করিয়া কার্য্যের বহির্ভূত করিয়া দেয়। বহুদিবসের পরিশ্রম এবং মস্তিষ্ক চালনাপ্রসূত মূল্যবান তুলাদণ্ডটি কঞ্চুকী কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইয়াছে, সংবাদ পাইয়া তিনি শোকে কাতর হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন।

২। আবুল ফতেহ আবদুর রহমান খাজানি। ইনি মারভ প্রদেশস্থ এক ধনীর ক্রীতদাস, গণিত-বিজ্ঞানে অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। সুলতান সঞ্জর শেলজুকীর রাজত্বকালে পঞ্জিকা সংস্কার করেন। এই পঞ্জিকা "সঞ্জরী পঞ্জিকা" নামে ইতিহাসে অভিহিত।

৩। মহম্মদ কাজীন। ইঁহার পরিচয় কিছুই জানা যায় না। গণিত এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানে তিনি নিশ্চিতই সুপণ্ডিত ছিলেন, তাহা না হইলে তিনি কখনই ওমর কর্তৃক নির্ব্বাচিত হইতেন না।

৪। হকিক আবুল আব্বাস লোক্‌রী। ইনি মারভের প্রধান শহর পানজ্‌দে প্রদেশের অন্তর্গত লোকর নগরের অধিবাসী আমীর। ইতিহাসে হকিম (বিদ্বান) লোক্‌রী নামেই পরিচিত। খোরাসানের সুপ্রসিদ্ধ বিদ্বান্‌ ও গণিতজ্ঞ বামান্‌ ইয়ারের ছাত্র। খোরাসানে গণিত-বিজ্ঞান অনুশীলনের প্রচার হকিম লোক্‌রীর দ্বারাই হয়। তিনি গণিত-বিজ্ঞানে এরূপ সুপণ্ডিত ছিলেন যে, তাঁহার সমসাময়িক সুপণ্ডিত ইবন্‌ কোশাক্‌ এবং ওস্তি পর্য্যন্ত পাণ্ডিত্যে ইঁহার সমকক্ষ ছিলেন না।

৫। মায়মুন ইবন্‌ নজিব ওস্তি। ইনি প্রসিদ্ধ চিকিৎসক ও গণিতজ্ঞ। উজীর নিজাম-উল-মুল্ক তাঁহাকে অতিশয় শ্রদ্ধা করিতেন। তাঁহার গণিত-বিজ্ঞান গ্রন্থাবলী তৎকালে সাতিশয় প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল।

৬। মহম্মদ বিন আহমদ মামুরি বাহকি। ইনি গণিত-বিজ্ঞানে অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। পরিমিতি বিষয়ক গ্রন্থ তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক এবং মূল্যবান বলিয়া তৎকালে সাতিশয় প্রসিদ্ধি-লাভ করিয়াছিল। সুলতান মলিক শাহ তাঁহাকে ইস্পাহানের মান-মন্দিরে গণিত এবং জ্যোতিষ অনুশীলনের নিমিত্ত আহ্বান করেন। ওমর খৈয়াম তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ গণিতজ্ঞ হিসাবে সাতিশয় শ্রদ্ধা করিতেন।

৭। আবুল ফতেহ ইবন্ কুশাক্। সুলতান সঞ্জরের রাজত্বকালীন সুপ্রসিদ্ধ গণিতবিদ্। তৎকালে গণিতজ্ঞ হিসাবে তাঁহার যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। গণিত-বিজ্ঞান সম্বন্ধে কতকগুলি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। সুলতান সঞ্জয় তাঁহার গ্রন্থাবলী শ্রদ্ধার সহিত রাজ-পাঠাগারে স্থান দান করিয়াছিলেন।

ওমরের পঞ্জিকা সংস্কার ও সুলতানের নামে উৎসর্গী করণ

সুদীর্ঘ তিন বৎসরকাল অনন্যসাধারণ অধ্যবসায়, প্রাণপাত পরিশ্রম ও মস্তিষ্ক চালনা করিয়া ওমর খৈয়াম সৌরমাস হিসাবে গণনা করিরা ইরাণের প্রচলিত পঞ্জিকার আমূল সংস্কার করেন। এই সংস্কৃত পঞ্জিকা সুলতান জলালউদ্দিন মলিক শাহের নামে উৎসর্গ করেন। ইহাই 'তারিখ-ই জলালী' নামে ইতিহাসে বিঘোষিত।

জলালি অব্দ ৪৭১ হিজরাব্দ ১০ই রমজান সাব-ই-জুম্মার দিন (শুক্রবার ১৫ই মার্চ্চ, ১০৭৯ খৃঃ) হইতে আরম্ভ হয়। জলালি অব্দ প্রচলনের পূর্ব্বে সূর্য্য মীনলগ্নের অর্দ্ধ মধ্যাবস্থায় অবস্থান করিত বলিয়া ওমর খৈয়াম ফারওয়ারদিন (১) মাসের প্রথম হইতে যে সময় দিবা এবং রাত্র সম অবস্থায় (Equinox) বিরাজ করিত, ঠিক সেই সময় হইতে বৎসর গণনা আরম্ভ করেন। যদিও এই সময় বৎসরের ২৮ দিন অতীত হইয়াছিল, তত্রাচ তিনি ফারওয়ারদিন মাস হইতেই বৎসর গণনা আরম্ভ করেন। খৈয়াম-পঞ্জিকায় নববৎসরের নাম "নওরোজ-ই-সুলতানী" নামে অভিহিত হয়। পঞ্জিকা সংস্কাররূপ দুরূহ এবং দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য সমাধা করিয়া ওমর প্রচুর পুরস্কার, রাজসম্মান ও জায়গীর লাভ করেন। (২)

ওমরের বৈজ্ঞানিক প্রতিভার পুরস্কার

১। চৈত্রের প্রথম হইতে বৈশাখের তৃতীয় সপ্তাহ পর্য্যন্ত ফারওয়ার দিন মাস।

২। Geographie d' Abulfeda, Reinaud.

১৫৮২ খৃষ্টাব্দে রোমীয় ধর্ম্মসম্রাট ত্রয়োদশ গ্রেগরীর রাজত্ব সময়ে খৃষ্ট-পঞ্জিকার সংস্কার হয়। খৃষ্ট-পঞ্জিকার সহিত ওমরের পঞ্জিকার তুলনা করিয়া পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতমণ্ডলী একবাক্যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, গ্রেগরীর পঞ্জিকা অপেক্ষা জলালী পঞ্জিকা সুসংস্কৃত (Perfect) এবং সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ।(১) ওমর যে প্রণালী অবলম্বন করিয়া পঞ্জিকা সংস্কার করেন, তাহা সর্ব্বাবস্থায় রাজ্যশাসন কার্য্যের সুবিধাজনক হইয়াছে।(২) অপিচ ওমরের সংস্কার গ্রেগরীয় সংস্কার হইতে সূক্ষ্ম ও সমীচীন।(৩) সুপ্রসিদ্ধি ঐতিহাসিক এডওয়ার্ড গীবন (Edward Gibbon) জুলিয়স সীজর প্রবর্ত্তিত পঞ্জিকার সহিত ওমরের পঞ্জিকা তুলনা করিয়া বলিয়াছেন, জলালি পঞ্জিকা গণনার সূক্ষ্মতা ভ্রমশূন্য হিসাবে জুলিয়স সীজর প্রবর্ত্তিত পঞ্জিকাকেও উৎকর্ষে অতিক্রম (Surpass) করিয়াছে।(৪) দুর্ভাগ্যের বিষয় জলালি অব্দ অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই। মোট চৌদ্দ বৎসর কাল— যতদিন সুলতান মলিক শাহ জীবিত ছিলেন—ততদিন পর্য্যন্ত স্থায়িত্ব লাভ করিয়াছিল। সুলতানের সমাধিলাভের সহিত তাঁহার সাধের "জলালি অব্দ"ও সমাধি লাভ করে। সুলতানের উত্তরাধিকারিগণ এই অব্দ রহিত করিয়া দিলেও ওমরের নবনবোন্মেষশালিনী প্রতিভার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান—"জলালি পঞ্জিকা" —যতদিন পৃথিবীতে জ্ঞানচর্চ্চার আদর থাকিবে, ততদিন অসামান্য

জলালী পঞ্জিকা ও পৃথিবীর অন্যান্য পঞ্জিকা তুলনায় সমালোচনা

১। Muslim Theology. Macdonald.

২। Introduction. The quatrains of Omar Khayyam translated by Whinfield.

৩। Geographied' Abul Feda. Renaud.

৪। Decline and fall of the Roman Empire by E. Gibbon.

প্রতিভার অধিকারী, বৈজ্ঞানিক-শ্রেষ্ঠ ওমর খৈয়ামের নাম—কীর্ত্তি স্মৃতি চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবে। ওমর যদি অন্য কোন গ্রন্থ রচনা না করিয়া একমাত্র পঞ্জিকা-সংস্কার করিয়া যাইতেন, তাহা হইলেও তাঁহার কীর্ত্তি-স্মৃতি পৃথিবীতে অক্ষয় হইয়া থাকিত।

সুলতান মলিক শাহের দরবারে মুনাজ্জিম-ই-শাহী (রাজ-জ্যোতিষী) রূপে ওমর যে কেবল পঞ্জিকা সংস্কার করিয়াছিলেম, তাহা নহে। পঞ্জিকা সংস্কার ব্যতীত গণিতবিদ্ ও জ্যোতির্বিদগণের গণনা কার্য্যের সুবিধার জন্য জীচ (জ্যোতিষিক তালিকা) প্রণয়ন করেন। হাজী খলিফা বলিয়াছেন, জলালি পঞ্জিকার মত ইহাকেও তিনি রাজভক্তির নিদর্শনস্বরূপ সুলতান মলিক শাহের নামে উৎসর্গ করেন। এই তালিকাই ইতিহাসে "জীচ-ই-মলিকশাহী" নামে পরিচিত।

জীচ-ই-মলিকশাহী

গণিতবিদ্ ও নজুমী (ফলিত জ্যোতিষী) রূপে ইমাম ওমর খৈয়ামের যশঃ সমগ্র ইরাণের বাহিরেও বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। ওমর খৈয়ামকে অনেক সময় অন্যান্য জ্যোতির্বিদগণের গণনা, ভবিষ্যদ্বাণীর বিচার ও গণনার সত্যাসত্য সম্বন্ধে অভিমত প্রদান করিতে হইত। তৎকালীন যুগে জ্যোতির্বিদগণ সুলতানের উচ্চ রাজকর্ম্মচারী, আমীর ওমরাহগণের আদেশে যুদ্ধে জয়-পরাজয়, অভিযানের শুভ মুহূর্ত্ত নির্দ্দেশ, গণনা ও বিচার করিতেন। যদি তাঁহাদের বিচার ফল ভবিষ্যদ্বাণীর সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে না পারিত, তাহা হইলে সুলতানের আদেশে তাহাদিগকে দণ্ডগ্রহণ করিতে হইত। অথবা যদি কোন জ্যোতিষী গণনার ফল অশুভ দেখিয়া উহা গোপন করিয়া শুভ বলিয়া নির্দ্দেশ করিত, অথবা গণনার অশুভ ফল সুলতানের গোচর না করিয়া পলায়ন করিত,

তাহারাও সুলতানের বিষদৃষ্টি এড়াইতে পারিত না। ওমর খৈয়াম শেষোক্ত অপরাধে অপরাধী এক জ্যোতিষীকে কারাদণ্ড হইতে মুক্ত করেন। ঘটনাটি নিম্নে বিবৃত হইল;—সুলতান ঘিয়াত-উদ্ দুনিয়া ওয়াদ্-দিন মহম্মদ বিন মলিক শাহের রাজত্ব সময়ে আরব-নরপতি সদাকা বিদ্রোহের পতাকা উড়াইয়া পঞ্চাশ হাজার সৈন্যসহ হিল্লা হইতে বোগদাদ অভিমুখে যাত্রা করেন। সুলতান বিদ্রোহ-দমন-অভিযানের শুভ মুহূর্ত্ত স্থির করিবার জন্য ইস্পাহানের এক জ্যোতিষীকে আদেশ করেন। জ্যোতিষী গণনা করিয়া দেখেন যে এক সপ্তাহের মধ্যে কোন শুভ মুহূর্ত্ত নাই। তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহার বিচারফল সুলতানের গোচর করেন। সুলতান সত্বর শুভ মুহূর্ত্ত নির্দ্দেশ করিবার জন্য পুনরায় আদেশ করেন। জ্যোতিষী প্রাণভয়ে ইস্পাহান ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। ইস্পাহানে এক বিদেশী জ্যোতিষী বাস করিত। এই জ্যোতিষী জ্যোতির্বিজ্ঞানে সবিশেষ পারদর্শী ছিল না। সে কোন লোকমুখে ইস্পাহানের জ্যোতিষীর পলায়ন সংবাদ শুনিয়াছিল। রাজ-অনুগৃহীত কোন ব্যক্তির সাহায্যে সে সুলতানের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া জানায়, সুলতান যদি অনুগ্রহ করিয়া আদেশ করেন, তাহা হইলে সে সুলতানের বিদ্রোহ দমন যাত্রার শুভ মুহূর্ত্ত নির্দ্দেশ করিয়া দিবে। সুলতান তাহার কথায় সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে শুভলগ্ন স্থির করিবার আদেশ দেন। বিদেশী জ্যোতিষী সেইদিনই শুভলগ্ন বাহির করিয়া সুলতানের গোচর করিল। সুলতান আনন্দিত হইয়া জ্যোতিষীকে দুইশত খণ্ড নিশাপুরী দীনার পুরস্কার প্রদান করেন। পলাতক জ্যোতিষী পথিমধ্যে ধৃত হইয়া বন্দী হয়। সুলতান বিদেশী জ্যোতিষী কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত শুভলগ্নে বিদ্রোহ-দমনে বহির্গত হইয়া আরব নরপতি সদাকাকে পরাজিত করিয়া বন্দী করেন। উল্লাসে উৎফুল্ল হইয়া তিনি

ইস্পাহানে উপস্থিত হইয়া পুনরায় বিদেশী জ্যোতিষীকে পুরস্কৃত করেন। বন্দী জ্যোতিষীকে আনয়ন করিবার জন্য সুলতান আদেশ দেন। শৃঙ্খলিত বন্দী সুলতান সম্মুখে নীত হইলে, সুলতান তাহাকে বলেন, তুমি শুভলগ্ন নির্দ্দেশ করিতে পার নাই, অন্য এক জ্যোতিষী উহা নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছে। আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি, তুমি বিদ্রোহী সদাকার উৎকোচ গ্রহণ করিয়া এইরূপ করিয়াছ। শৃঙ্খলিত জ্যোতিষী তৎক্ষণাৎ নতজানু হইয়া সাশ্রুনয়নে বলে, গণনায় যে সব লগ্ন পাওয়া গিয়াছিল, সে সমস্তই অশুভ; জ্যোতিষীরা অশুভ লগ্নে কোন কার্য্য করিবার পরামর্শ দিতে অত্যন্ত ভয় পায়। সেই কারণ আমি পলায়ন করিয়াছিলাম। আমার গণনার সত্যাসত্য বিচারের জন্য নিশাপুরে খোয়াজা ইমাম ওমর খৈয়ামের নিকটে দূত প্রেরণ করুন, তাহা হইলে সত্য ঘটনা বুঝিতে পারিবেন। সুলতান তৎক্ষণাৎ নিশাপুরে ওমরের নিকট লগ্নফল বিচার করিবার জন্য দূত প্রেরণ করেন। ওমর বিচার করিয়া সুলতানকে জানান যে ইস্পাহানের জ্যোতিষীর গণনা নির্ভুল এবং এক সপ্তাহের মধ্যে বিদ্রোহ-দমন অভিযানের কোন শুভলগ্ন ছিল না। সুলতান তখন বন্দী জ্যোতিষীকে শৃঙ্খলমুক্ত করিবার আদেশ দেন।(১)

এতক্ষণ আমরা ওমরের সৃষ্টি-বিজ্ঞান বিষয়িণী প্রতিভার পরিচয় দিলাম। এইবার আমরা ফলিত-জ্যোতিষ শাস্ত্রে তাঁহার পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছি। অল-বেরুণী এককথায় ফলিত-জ্যোতিষ সম্বন্ধে বলিয়াছেন, ফলিত-জ্যোতিষ প্রাকৃত বিজ্ঞানের শাখা মাত্র এবং ভবিষ্য কথন (prognostication) সম্পর্কেও ব্যবহৃত হয়; জ্যোতিষ-গণনায় ওমরের ভবিষ্যদ্বাণী কিরূপ সফলতা লাভ করিয়াছিল, তাহা

ফলিত জ্যোতিষে ওমরের প্রতিভা

১। চহার মকালা।

তাঁহার প্রিয় ছাত্র সুপণ্ডিত নিজামী অরূসী প্রদত্ত বিবরণ হইতে বুঝিতে পারা যায়।

নিজামী অরূসী লিখিয়াছেন,—৫০৬ হিজরাব্দে (১১১২-১৩ খৃঃ) খোয়াজা ইমাম ওমর খৈয়াম এবং খোয়াজা ইমাম মুজাফর-ই-ইসফারাজী বলখ নগরে আমীর আবু সা'দের গৃহে উৎসব-আমন্ত্রণে গমন করেন। আমিও নিমন্ত্রিত হইয়া এই উৎসব-সভায় উপস্থিত ছিলাম। আমরা একত্র ভোজনে বসিয়াছি। সরস কথাবার্ত্তার সহিত আমাদের ভোজন চলিতেছে। আমাদের কথাবার্ত্তার মাঝখানে "হুজ্জৎ-উল্-হক্" (সত্যে প্রমাণ-স্বরূপ) ওমর খৈয়াম বলিলেন, "আমার সমাধি এমন স্থানে হইবে, যেখানকার পুষ্পবৃক্ষ আমার সমাধির উপর বৎসরে দুইবার পুষ্প বর্ষণ করিবে।" তাঁহার এই অদ্ভুত ভবিষ্যদ্বাণী তখন আমি মোটেই বিশ্বাস করিতে পারি নাই। উপরন্তু অসম্ভব বলিয়াই আমার মনে হইয়াছিল। খোয়াজা ইমাম ওমর খৈয়াম মিথ্যাকথা বলিবার লোক ছিলেন না, ইহাও জানিতাম। তত্রাচ তখন আমি তাঁহার কথা বিশ্বাস করিতে পারি নাই। পঁচিশ বৎসর পরে আমার এ ভ্রম ঘুচিয়াছিল। ৫৩০ হিজরাব্দে (১১৩৫-৩৬ খৃঃ) আমি যখন নিশাপুরে উপস্থিত হই, তিনি তখন ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। সেই সময়ে তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণীর কথা স্মরণ হয়। তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণী কিরূপ সফল হইয়াছে, দেখিবার জন্য একজন পথিপ্রদর্শক সঙ্গে লইয়া সাব-ই-জুম্মার দিন(১) সন্ধ্যার সময় তাঁহার সমাধি-মন্দির দর্শন করিতে যাই। পথিপ্রদর্শক আমাকে "হীরা" সমাধি-উদ্যানে উপস্থিত করে। এই

নিজামী আরূসীর লিখিত বিবরণ

১। শুক্রবার দিন আত্মীয়-বন্ধু-গুরুজনের সমাধিদর্শন করিবার শ্রেষ্ঠ দিবস।

সমাধি-উদ্যানের বাম কোণের দেওয়ালের নিকট তাঁহার সমাধি অবস্থিত। সমাধির চারিধার লাল পীচ এবং ন্যাসপাতি ফুলে এরূপ আচ্ছাদিত যে, উহার চিহ্নমাত্র খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। বলখ নগরে উচ্চারিত তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণীর প্রত্যেক বাক্যটি আমার স্মরণপথে উদিত হয়। তাঁহাকে স্মরণ করিয়া আমি তাঁহার সমাধির পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া কেবল ক্রন্দন করিয়াছি। ভগবান্ তাঁহার পরলোকগত আত্মার কল্যাণ করুন এবং তাঁহাকে শান্তিতে রাখুন। তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণীর প্রত্যেক বাক্যটি সফল হইয়াছে দেখিয়া আমি তাঁহার উদ্দেশ্যে বার বার প্রণাম করি।(১)

নিজামী অরুসী ওমর খৈয়ামের আর একটি ভবিষ্যদ্বাণীর উল্লেখ করিয়াছেন। ৫০৮ হিজরাব্দে (১১১৪-১৫ খৃঃ) বোখারার সুলতান খাকান-শামস্-উল-মুল্ক মারভ নগরে তাঁহার মন্ত্রী সদরউদ্দিন মহম্মদ বিন-অল-মুজাফরকে আদেশ করেন,--জ্যোতির্বিদ ওমর যেন তাঁহার শিকার যাত্রার শুভদিন স্থির করিয়া দেন। এই দিনটির আকাশ যেন পরিষ্কার ও মেঘশূন্য হয়। ইমাম ওমর খৈয়াম এই সময় মন্ত্রীর গৃহে অবস্থান করিতেছিলেন। তুই দিন বিশেষ সাবধানতার সহিত গণনা করিয়া তিনি সুলতানের আদেশমত শিকার যাত্রার শুভদিন স্থির করেন। ওমর খৈয়ামও সুলতানের শিকার যাত্রার সঙ্গী হন। সুলতান ঘোটকে আরোহন করিয়া কিয়দ্দুর গমন করিলে, আকাশ আশ্চার্য্যরূপে মেঘাচ্ছন্ন হয়। রাজপারিষদবর্গ ওমরের উদ্দেশ্যে বিদ্রূপোক্তি করিতে থাকেন। সুলতান বিমর্ষচিত্তে গৃহে প্রত্যাগমনের আদেশ দেন। খোয়াজা ইমাম ওমর সুলতানকে প্রবোধ দিয়া বলেন, সুলতান! আপনার চিহ্নিত

১। চহার মাকালা

হইবার কোনই কারণ নাই, এক ঘণ্টার মধ্যে শীঘ্রই আকাশ মেঘশূন্য হইবে; এমন কি পাঁচদিন পর্য্যন্ত আকাশের অবস্থা এইরূপ থাকিবে। সুতরাং গৃহে ফিরিবার প্রয়োজন নাই। সুলতান ওমরকে অতিশয় শ্রদ্ধা করিতেন, তাঁহার কথার উপর নির্ভর করিয়া পুনর্যাত্রা করেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই পাঁচদিনের একদিনও বৃষ্টিপাত হয় নাই।(১)

অল-বেরূণী জ্যোতির্বিদের যেমন সংজ্ঞা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, তেমনি জ্যোতিষীর কি কি থাকা আবশ্যক, তৎসম্বন্ধেও আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—কুশাগ্রবুদ্ধিসম্পন্ন, স্থিরচিত্ত, দৃঢ়-চরিত্র ও তীক্ষ্ণ স্বাভাবিক জ্ঞানসম্পন্ন হওয়া জ্যোতিষীর সর্ব্বতোভাবে আবশ্যক। ইহার একটির অভাব ঘটিলে এই ব্যবসায়ে তিনি উন্নতিলাভ করিতে পারিবেন না।

ওমর খৈয়াম সূক্ষ্ম গণনা বা বিচার দ্বারা যে সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার স্থিরচিত্ততা, তীক্ষ্ণ স্বাভাবিক জ্ঞান ও কুশাগ্রবুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। এই সকল গুণগ্রামের অধিকারী না হইলে তিনি কখনই পঞ্জিকা সংস্কাররূপ দুরূহ কার্য্য সমাধা করিয়া সুপণ্ডিত অল-বেরূণীর বাক্যের যাথার্থ্য সম্পাদন করিতে পারিতেন না। পক্ষান্তরে এই সকল গুণগ্রামের অধিকারী ছিলেন বলিয়াই জ্যোতি-র্বিজ্ঞানে অতুলনীয় প্রতিভার পরিচয় প্রদান এবং মুসলিম জ্যোতি-র্বিজ্ঞান-সাহিত্যকে অভাবনীয়রূপে সমৃদ্ধ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

সারণী বা জ্যোতিষিক-তালিকা রচনা ব্যতীত ইমাম ওমর খৈয়াম জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্বন্ধে অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন; তাঁহার

১। চহার মকালা।

অন্যান্য গ্রন্থের মত এইগুলিও লোকলোচনের বহির্ভূত হইয়াছে। কেবলমাত্র "মণিরত্ন বিজ্ঞান" নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি লীডেন পাঠাগার রক্ষিত আছে।(১)

জ্যোতির্বিজ্ঞানে ইমাম ওমর খৈয়াম কিরূপ চরমোৎকর্ষ লাভ করিয়া অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন, পঞ্জিকা-সংস্কার, জ্যোতিষিক-তালিকা প্রণয়ন এবং তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণীর সফলতা হইতে বুঝিতে পারা যায়; বৈজ্ঞানিক-জগতে তাঁহার স্থান কোথায় এবং বিজ্ঞান সাহিত্য তাঁহার দ্বারা কিরূপ সমৃদ্ধ হইয়াছিল, চরিতাভিধানকারগণের উক্তি হইতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়।

ঐতিহাসিকগণের লিখিত বিবরণ

ঐতিহাসিক ও ভূগোলবিদ্যাবিশারদ হামদুল্লা মুস্তওফি বলিয়াছেন, খোয়াজা ইমাম ওমর খৈয়াম বিজ্ঞানের সকল বিভাগেই বিশেষতঃ জ্যোতির্বিজ্ঞানে তৎকালীন জ্যোতির্বিদগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও বিশেষজ্ঞ ছিলেন।(২) চরিতাভিধানকার জমলউদ্দিন অল-কফ্‌তি লিখিয়াছেন, হকিম (বিদ্বান) ওমর খৈয়াম তৎকালীন যুগে একজন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী, দর্শন ও বিজ্ঞানশাস্ত্রে (বিশেষতঃ জ্যোতির্বিজ্ঞানে) অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন।(৩) চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে লিখিত আর একখানি চরিতাভিধানে ওমরের জ্যোতির্বিজ্ঞান-প্রতিভা ও জ্ঞান সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিবরণ আছে:—ওমর-বিন ইব্রাহিম-অল খৈয়ামী তাঁহার যুগে একজন অসাধারণ জ্ঞানী এবং জ্যোতিষশাস্ত্রের জ্ঞানের জন্য প্রসিদ্ধিলাভ করিয়া-

১। Catalogue of Oriental manuscripts in the Leyden University Library, 1851.

২। তারিখ-ই-গুজিদা।

৩। তারিখ-উল-হকুমা।

ছিলেন।(১) ওমর খৈয়াম জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রত্যেক বিভাগে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন বলিয়াই জনসাধারণে আবু-সিনার সহিত তাঁহার তুলনা করিয়া তাঁহাকে "আবু-সিনার অবতার" আখ্যায় অভিহিত করিয়া সম্মান দেখাইয়াছিল।

ওমর খৈয়ামের বিজ্ঞান-সাধনার ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, তিনি যে কেবল গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের গবেষণা করিয়া, তাঁহার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা নহে। বিজ্ঞান শাস্ত্রের সকল বিভাগেই তাঁহার অসামান্য কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। চিকিৎসা-প্রাকৃত-রসায়ন-বিজ্ঞানেও তিনি অতুলনীয় প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন।

চিকিৎসা-রসায়ন-প্রাকৃত-বিজ্ঞানে ওমরের প্রতিভা

মুসলিম রসায়ন বিজ্ঞানের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, সপ্তম শতাব্দীর শেষভাগ হইতে মুসলিম রসায়ন বিজ্ঞানের উন্নতির আরম্ভ যুগ। প্রাচীন মুসলিম রাসায়নিকগণ রসায়নশাস্ত্রে মধ্যযুগের ইয়োরোপের অজ্ঞানান্ধকার দূরীভূত করিয়া জ্ঞান-গুরুর স্থান অধিকার করিয়াছিলেন।

একাদশ শতাব্দীর রসায়ন-বিজ্ঞান-সাহিত্য ওমর খৈয়াম কর্ত্তৃক সমৃদ্ধ হয়। জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্যান্য বিভাগের মত তিনি রসায়ন-বিজ্ঞান-বিভাগেও কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া, বিশিষ্ট রাসায়নিকরূপে সুবিখ্যাত হন। রসায়ন সূত্র সম্বন্ধে প্রভূত গবেষণা করিয়া একখণ্ড গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থে ধাতব পদার্থসমূহের রাসায়নিক বিশ্লেষণ এবং কি অনুপাতে স্বর্ণ ও রৌপ্য সংমিশ্রণ করিলে মিশ্র পদার্থের উৎপত্তি হইতে পারে,

---

১। ফারদৌস-উৎ-তওয়ারীখ।

তাহারই কথা আলোচিত হইয়াছে। এই মূল্যবান গ্রন্থখানির নাম "মিজান-উল-হিকাম্"। এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি গথা (Gotha) পাঠাগারে রক্ষিত আছে।

প্রাকৃত বিজ্ঞান সম্বন্ধেও ওমর খৈয়াম একখণ্ড গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থখানির নাম "লওয়াজিম-উল-আমকিনা।" এই গ্রন্থে তিনি চারি ঋতু ও বিভিন্ন কোণের বায়ু সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। ইহার পাণ্ডুলিপি বার্লিন পাঠাগারে রক্ষিত হইয়া ওমরের বৈজ্ঞানিক গবেষণার কীর্ত্তি জগতে ঘোষণা করিতেছে।

রসায়ন ও প্রাকৃত বিজ্ঞান ব্যতীত চিকিৎসা-বিজ্ঞানেও ওমরের অসামান্য প্রতিভার পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। চিকিৎসা-বিজ্ঞান-জগতেও তিনি শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকরূপে শ্রদ্ধান্বিত ছিলেন।

মুসলিম চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে ইহা প্রথমে অনুন্নত অবস্থায় ছিল, পরে খৃষ্টান সম্প্রদায়ের সংস্পর্শে আসিয়া উন্নত হয়। এই কারণ মুসলিম চিকিৎসা-বিজ্ঞান একদল নিগৃহীত খৃষ্টান সম্প্রদায়ের নিকট কিয়ৎপরিমাণে ঋণী। নেস্তোরিয়াস কনস্তান্তিনোপলের (Costantinople) ধর্ম্মযাজকের পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া মেরিকে ঈশ্বরের জননী না বলিয়া খৃষ্টমাতা নামে প্রচার করেন। ইহার ফলে তিনি সশিষ্য মরুভূমিতে নির্ব্বাসিত হন। তাঁহার শিষ্য-সম্প্রদায় চিকিৎসা-বিজ্ঞান অনুশীলন আরম্ভ করেন এবং মেসোপটেমিয়ার এদেশা (Edessa) শহরে এক বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত হন। ইহার সহিত তাঁহারা দুইটা হাসপাতাল বা রুগ্নাবাস প্রতিষ্ঠা করিয়া চিকিৎসা-বিজ্ঞান শিক্ষার পথ উন্মুক্ত করেন। ধর্ম্মান্ধ ধর্ম্মযাজক সাইরস এই সম্প্রদায়কে এই স্থান হইতেও বিতাড়িত করেন। তাহারা বিতাড়িত হইয়া পারস্য দেশে

মুসলিম চিকিৎসা-বিজ্ঞানের জন্মকথা

পলায়ন করিয়া পারস্যের গনদেশপুরে (Gondespur) একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। প্রকৃতপক্ষে এই বিদ্যালয় হইতে মুসলিম চিকিৎসা-বিজ্ঞানের পূর্ণ আলোচনার সূত্রপাত হয়।(১)

নিদান-তত্ত্ব সম্বন্ধে ওমর খৈয়াম একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। তৎকালীন চিকিৎসা-বিজ্ঞান-জগতে, তাঁহার অন্যান্য গ্রন্থের ন্যায়, এই গ্রন্থখানিরও যথেষ্ট আদর হইয়াছিল। চিকিৎসা-বিজ্ঞান সম্বন্ধে ওমর খৈয়ামের চরম জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায় সুলতান সঞ্জরের চিকিৎসা-আহ্বানে; ঐতিহাসিক মহম্মদ শর্হ জুরি বলিয়াছেন, সুলতান সঞ্জর বাল্যকালে বসন্তরোগে আক্রান্ত হইলে, শাহজাদার চিকিৎসার জন্য সুলতান অন্তঃপুরে তাঁহার আহ্বান হয়। ওমরের চিকিৎসা-নৈপুণ্যে শাহজাদা সত্বর রোগমুক্ত হয়েন।(২)

১। History of Medicine, Garrison 1923

২। সুরাহৎ-উল-আরওয়া।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

জ্ঞানতপস্বী ওমর খৈয়াম

ভারতবর্ষের মত প্রাচীন মুসলমান সম্প্রদায় জ্ঞান-সাধনাকে উচ্চ শ্রেণীর সাধনা হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহারাও জ্ঞানকে কেন্দ্র করিয়া মুক্তি-সমরে অবতীর্ণ হইয়া জয়যুক্ত হয়েন। ভারতের উপনিষদাদি ঋষিশাস্ত্র যেমন বজ্রনির্ঘোষে বলিয়াছে, জ্ঞানই ব্রহ্ম, যিনি জ্ঞানের সাধনায় জয়যুক্ত হইবেন, তিনিই ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ করিবেন, তেমনই আরবের কোরানও বলিয়াছে, যে জ্ঞানে ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারা যায়, হে আল্লা, আমাকে সেই জ্ঞান দান করুন। ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, মহম্মদের জন্মের পূর্ব্বে আরব জাতি জ্ঞানহীন ছিল, পরে তাঁহার উদ্দীপনাপূর্ণ বাণী মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া সজীব হয়। হজরত মহম্মদও বলিয়াছেন, বিশ্বাসীর (মুসলমানের) জ্ঞানসঞ্চয়ে জন্মগত অধিকার, যেখানে জ্ঞানের সন্ধান পাইবে, সেই স্থান হইতেই সে জ্ঞান-সঞ্চয় করিবে। মুসলমানগণ হজরতের বাণী শিরোধার্য্য করিয়া জ্ঞান-সঞ্চয়ে অগ্রসর হন। তাঁহার বিদ্যা বা জ্ঞান-সাধনাকেই উচ্চাঙ্গের সাধনার মধ্যে গণ্য করেন এবং জগতের বিভিন্ন উন্নতিশীল জাতির জ্ঞান উৎস হইতে জ্ঞানসঞ্চয় করিয়া বিদ্যাজ্ঞানের ভাণ্ডার হইয়া উঠেন।

মুসলিম সম্প্রদায়ের জ্ঞান সাধনা

ইতিবৃত্ত সাক্ষ্য দেয় যে, প্রাচীন মুসলমান সম্প্রদায় বিদ্যা জ্ঞানকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছিলেন, যথা—(১) স্বদেশীয় ও (২) বিদেশীয়

বিবামূস্তা জ্ঞান। যে বিদ্যা বা জ্ঞান কোরানের বিধি ব্যবস্থার সহিত সম্পর্কান্বিত, তাহাই স্বদেশীয় এবং যাহা বিদেশীয়ের নিকট হইতে সংগৃহীত—অর্থাৎ দার্শনিক তত্ত্বমূলক, উহাই বিদেশীয় বিদ্যা আখ্যায় অভিহিত হইত। স্বদেশীয় বিদ্যা মূলতঃ হদিস্ বা ধর্ম্মবিজ্ঞান (অল্-উলম্-অল্-নকলিয়া ওয়াল শরিয়া) ও ভাষাতত্ত্ব (উল্ম-উল্-লিসান-উল-আরবী)। স্বদেশীয় বিদ্যা আবার নয় শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা—

বিদ্যার শ্রেণীবিভাগ স্বদেশীয় ও বিদেশীয়

(১) ইলম-উল-তফসির (কোরানীয় ভাষ্য Koranic Exegises), (২) ইলম্-উল্-কেরাত (কোরান সমালোচনা Koranic Criticism), (৩) ইলম্-উল্-হদীস্ (হদীস্-বিদ্যা Science of Apostolic Tradition), (৪) ফেকা (স্মৃতি বা ব্যবহারশাস্ত্র Jurisprudence, (৫) নহ্য়ো (ব্যাকরণ Grammer), (৬) ইলম্-উল্-কালাম (যুক্তিশাস্ত্র Scholastic Theology), (৭) লোঘাৎ (শব্দকোষ, অভিধান Lexicography), (৮) বয়ান (অলঙ্কার শাস্ত্র Rhetoric), (৯) আদব (সাহিত্য Literature)।

স্বদেশীয় বিদ্যার শ্রেণী বিভাগ

স্বদেশীয় বিদ্যার মত বিদেশীয় বিদ্যা—দর্শনশাস্ত্র আবার পাঁচ ভাগে বিভক্ত। যথা—(১) ন্যায়শাস্ত্র (Logic), (২) মনোবিজ্ঞান (Philosophy of mind), (৩) গণিতশাস্ত্র, (Mathematics), (৪) ভৈষজ্য-তত্ত্ব (Medicine) এবং (৫) পদার্থবিজ্ঞান (Physical Science)।

বিদেশীয় বিদ্যার শ্রেণী বিভাগ

প্রাচীন মুসলমানগণ (১) অল্-আরবিয়া (সাহিত্য), (২) অল্-শরিয়া (ধর্ম্মজ্ঞান বা ধর্ম্মতত্ত্ববিদ্যা), (৩) অল্-হিকমিয়া (দর্শনশাস্ত্র)—এই তিন বিদ্যা বিজ্ঞানের সাধনা করিতেন।

ওমর খৈয়াম একাগ্র সাধনাবলে স্বদেশীয় ও বিদেশীয় উভয় বিদ্যাতেই অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া অলৌকিক জ্ঞানের পরিচয় দ্বারা দেশবাসীকে চমৎকৃত করেন। প্রথমে তাঁহার স্বদেশীয় বিদ্যা-জ্ঞানের আলোচনা করা যাউক।

ওমরের জ্ঞান সাধনা

স্বদেশীয় বিদ্যার মধ্যে (১) ইলম্-উল-কেরাত, (২) ফেকা, (৩) নহয়ো এবং (৪) আদব—এই চারি বিদ্যায় তিনি অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। এই চারি বিদ্যায় পাণ্ডিত্যলাভ করিয়া কিরূপ যশস্বী ও দেশবাসীর শ্রদ্ধালাভ করিয়াছিলেন, তাহার বিবরণ কয়েকখানি ইতিহাস ও চরিতাভিধানে পাওয়া যায়।

ইলম্-উল্-কেরাত—কোরান-সমালোচন-বিদ্যায় ওমরের গভীর জ্ঞান ছিল। তৎকালীন যুগে এই বিদ্যায় যাঁহারা সুপণ্ডিত না হইতেন, জ্ঞানী বা পণ্ডিতসমাজে তাঁহাদের স্থান ছিল না। কোরান-সমালোচক, কোরানের ভাষ্যকার, কোরানের পাঠক জনসাধারণের দৃষ্টিতে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন।

ওমর খৈয়াম কোরানের যেমন শ্রেষ্ঠ সমালোচক ছিলেন, তেমনই 'কারী'ও (কোরান পাঠক) ছিলেন। বেদ যেরূপ সুর করিয়া ভঙ্গীসহকারে পাঠ করিতে হয়, কোরানও ঠিক সেই প্রকার সুরে ও ভঙ্গীতে পাঠ করিবার নিয়ম আছে।

কিরয়ৎ ও কারী

মুসলিম-জগতে কোরান-পাঠ উচ্চশ্রেণীর বিদ্যারূপে সম্মানিত। এই বিদ্যাকে 'কিরয়ৎ, এবং পাঠককে 'কারী' নামে অভিহিত করা হয়। কোরান সাত প্রকার সুরে পাঠ করিতে হয়। ওমর খৈয়াম কোরান সাত প্রকার সুরে পাঠ করিতে জানিতেন এবং এই বিদ্যায় সুপণ্ডিত ও বিশেষজ্ঞ ছিলেন।

ঐতিহাসিক মহম্মদ শহ্‌র্জুরি(১) লিখিয়াছেন, সুলতান সঞ্জয়ের মন্ত্রী আবদুর রজ্জাক রাজকার্য্যের অবসরে কবি, সাহিত্যিক, কারী ও বিদ্বানগণ পরিবেষ্টিত হইয়া নানা জ্ঞানালোচনায় সময় অতিবাহিত করিতেন। এক-দিন উজীর আবদুর রজ্জাক, কারিগণের নেতা আবুল হসন অল-গজ্জালির সহিত 'কিরয়ৎ' সম্বন্ধে তর্কালোচনা করিতেছিলেন। যখন তাঁহাদিগের তর্ক পূর্ণস্রোতে চলিতেছিল, ঠিক সেই সময় জ্ঞান-বিজ্ঞানের আধার ওমর খৈয়াম মন্ত্রিগৃহে প্রবেশ করেন। ওমরকে দেখিয়াই মন্ত্রী আনন্দোচ্ছ্বাসে বলিয়া উঠেন, "আর আমাদের তর্কের প্রয়োজন নাই, এই যে আমাদের সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ আসিয়াছেন। বিশেষজ্ঞের অভিমতের উপর আর তর্ক চলিবে না।" বলিয়া উপস্থিত তর্কসম্বন্ধে ওমরের মনোযোগ আকর্ষণ করেন। ওমরকে তাঁহার অভিমত প্রকাশ করিবার জন্য মন্ত্রিপ্রবর অনুরোধ করেন। ওমর খৈয়াম সাত প্রকার সুরে ও ভঙ্গীতে কোরান পাঠ করেন এবং বিভিন্ন বিশেষজ্ঞের অভিমত উদ্ধার করিয়া প্রত্যেক সুরের ব্যাখ্যা করেন। তিনি প্রচলিত সপ্ত পদ্ধতি বা সুর ব্যতীত আরও যে একটি বিশেষ সুর আছে, তাহার সম্বন্ধেও গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা করেন। ওমরের গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা শ্রবণ করিয়া কারিগণের প্রধান অল-গজ্জালী উচ্ছ্বাসভরে বলিয়া উঠেন, ভগবান করুন, যেন এই প্রকার জ্ঞানী পণ্ডিতের সংখ্যা পৃথিবীতে দিন দিন বৃদ্ধি পায়। সত্যকথা বলিতে কি,

ওমর ও কারিগণের নেতা অল-গজ্জালী

১। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রসিদ্ধ দার্শনিক। ইঁহার সম্পূর্ণ নাম শামস অল-দীন অল-শহ্‌র্জুরি। ইনি দর্শনশাস্ত্র সম্পর্কীয় কয়েক খণ্ড পুস্তক রচনা করেন। দার্শনিক-গণের ইতিহাস লেখক হিসাবে প্রসিদ্ধ। তাঁহার "নুজহৎ-উল-আরওয়া" অতি প্রসিদ্ধ পুস্তক। এই পুস্তক হইতে তৎকালীন মুসলীম সম্প্রদায়ের বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকগণের বিবরণ ও দর্শনশাস্ত্রের ইতিহাস জানিতে পারা যায়।

কোন কারীই ওমর খৈয়ামের মত কিয়ৎ বিদ্যায় বিশেষজ্ঞ ত' নহেনই, উপরন্ত সম্পূর্ণ অজ্ঞ।(১)

মুসলিম ধর্ম্মতত্ত্ব ও ব্যবস্থা-বিজ্ঞানেও ওমর খৈয়াম প্রগাঢ় পণ্ডিত ছিলেন। এ বিষয়ে তিনি দেশবাসীকে তাঁহার সাধনালব্ধ জ্ঞান বিতরণ করিতেন। মোল্লা এবং অন্যান্য জ্ঞানীর মত তিনি মসজিদে গিয়া বক্তৃতা দিতেন না। তিনি তাঁহার গৃহে বসিয়াই উপদেশামৃত বিতরণ করিতেন। তাঁহার ছাত্র-সংখ্যাও যথেষ্ট ছিল। ঐতিহাসিক মহম্মদ শহ্‌র্জুরি এই বিজ্ঞানে তাঁহার পাণ্ডিত্যের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন. ইমাম ওমর খৈয়াম নিশাপুরে জন্মগ্রহণ করেন; দর্শন ও বিজ্ঞানের নানা বিভাগে যেমন প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের—প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন, তেমনই ইতিহাস ও ব্যবস্থা-বিজ্ঞানেও অলৌকিক জ্ঞানের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন।(২)

ধর্ম্মতত্ত্ব ও ব্যবস্থা-বিজ্ঞানে ওমরের পাণ্ডিত্য

কোরান ও ধর্ম্মতত্ত্বে ওমরের কি গভীর জ্ঞান ছিল, কাজী আবদুর রশিদের প্রদত্ত বিবরণ হইতে জানা যায়। কাজী আবদুর রশিদ লিখিয়াছেন, কোরানের কোন সুরার অর্থবোধ করিতে না পারিয়া আমি তাৎপর্য্যের জন্য কোরান-সাহিত্যে সুপণ্ডিত ও বিশেষজ্ঞ ওমর খৈয়ামের শরণাপন্ন হই এবং তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি. এই সুরার মধ্যে কোন কোন শব্দ উপর্য্যুপরি বিশেষ-ভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে কেন, জ্ঞানিগণাগ্রগণ্য ইমাম ওমর খৈয়াম সুদীর্ঘ এবং গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ যে ব্যাখ্যা করেন, তাহা শ্রবণ করিয়া আমার সমস্ত সন্দেহ দূরীভূত হইয়া যায়; জ্ঞানের

ওমর ও কাজী আবদুর রশিদ

১। মুজহৎ-উল আরওয়া।

২। মুজহৎ-উল-আরওয়া

উজ্জ্বল আলোক সন্দর্শনে আমি মুগ্ধ হই। ওমর এই সুরার ব্যাখ্যাকালে এত অধিকসংখ্যক বিশেষজ্ঞের উক্তি যুক্তিসহকারে প্রকাশ করেন যে, তাহার অনুলিপি সংগ্রহ করিয়া রাখিলে, উহা ধর্ম্ম-সাহিত্যের উচ্চাঙ্গের মূল্যবান্ পুস্তক হিসাবে গণ্য হইতে পারিত।(১)

ওমর খৈয়াম তাঁহার স্বাধীন মতবাদের জন্য অনেক সময় লাঞ্ছিত হইতেন। ক্রমে তাঁহার অবস্থা এমন হইয়াছিল যে, সদা সর্ব্বদা তাঁহাকে প্রাণের ভয়ে দিনযাপন করিতে হইত। প্রকৃত সুফীরা তাঁহার উক্তিতে সুফী সম্প্রদায়ের অনেক গুপ্ত রহস্য-কথা নিহিত দেখিয়া কখনও গোপনে কখনও বা প্রকাশ্যে তাঁহার সহিত সুফী রহস্যবাদ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে আসিত। কিন্তু ওমরের এই সকল উদার উক্তি বা মতবাদ ধর্ম্মান্ধ সম্প্রদায় সহ্য করিতে পারিত না। এজন্য তাহারা তাঁহার উপর একেবারেই শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিল না। উপরন্তু তাহারা ওমরকে গোপনে হত্যা করিবার ষড়যন্ত্র পর্য্যন্ত করিয়াছিল। ওমর তাহাদিগের গুপ্ত অভিসন্ধি জানিতে পারিয়া প্রাণভয়ে মক্কায় পলায়ন করেন। এই সময়ে তিনি তাঁহার লেখনী ও রসনা কথঞ্চিৎ সংযত করেন। কিছুদিন পরে মক্কা হইতে বোগদাদে উপস্থিত হয়েন। বোগদাদবাসিগণ অসাধারণ জ্ঞানী ওমরের আগমন সংবাদ পাইয়া তাঁহার নিকট প্রাচীন বিদ্যা-জ্ঞান (২) সম্বন্ধে উপদেশ বক্তৃতা শ্রবণ করিবার জন্য দলে দলে আসিয়া তাঁহার গৃহদ্বারে উপস্থিত হয়। কিন্তু ওমর তাহাদিগকে ঘাতুক সম্প্রদায়ের লোক মনে করিয়া ঘৃণাভরে অবরুদ্ধ দ্বার অর্গলমুক্ত করেন নাই। এইরূপে অসংখ্য জ্ঞানামৃতপানেচ্ছু হতাশ হইয়া ফিরিয়া যায়। মানব-সমাজের

ধর্ম্মান্ধ সম্প্রদায় ও ওমর খৈয়াম

১। মিরাত-ই জহান নামা।

২। গ্রীক দর্শন-বিজ্ঞান।

উপর অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াই এই সময় তিনি তাঁহার জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য গোপন করিয়াই চলিতেন। কাহারও সহিত বাক্যালাপ করিতেন না।

ধর্মান্ধ সম্প্রদায় তাঁহাকে সর্ব্বদাই ধর্মতত্ত্ব বিষয়ে তর্ক-বিচারে আহ্বান করিতেন। তিনি ধর্মান্ধ মুসলমানগণকে অত্যন্ত ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখিতেন, অবজ্ঞাভরে তাহাদিগের আহ্বান উপেক্ষা করিতেন। তিনি ইহাদিগকেই গর্দ্দভ সম্ভাষণ করিয়াছেন।

অনেক সময় ধর্মান্ধ মুসলমানগণ ওমরকে এবরূপ জোর করিয়াই তর্ক করিতে বাধ্য করিত। ওমর স্বভাবতঃ ধীরপ্রকৃতির লোক ছিলেন. শান্তভাবে তার্কিকগণের প্রশ্নের উত্তর দিয়া তাঁহাদিগকে শান্ত করিতেন। তিনি জানিতেন, ইঁহারা উত্তেজিত হইয়াই তর্ক করিতে আসিয়াছেন, সুতরাং তর্ক অপেক্ষা ইঁহাদিগকে শান্ত করাই সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। সকল সময়ই তিনি তর্ক চাহিতেন না। বিনা প্রয়োজনে তর্ক করা তাঁহার স্বভাববিরুদ্ধ ছিল। —অত্যাশ্চর্য্য জ্ঞানের বলেই ওমর অনেক সময় বিপদ হইতে মুক্ত হইতেন।

ওমর স্বদেশীয় ও বিদেশীয় উভয় বিদ্যাতেই এরূপ সুপণ্ডিত ছিলেন যে, তাঁহার তুল্য জ্ঞানী ও বিদ্বান তৎকালীন যুগে আর কেহই ছিলেন না।

পারশ্যের জাগ্রত প্রজ্ঞা

তিনিই সে যুগের মূর্ত্তিমান জাগ্রত প্রজ্ঞা ছিলেন। তিনি তৎকালীন পারশ্যের জাগ্রত প্রজ্ঞা ছিলেন বলিয়াই, হুজ্জৎ-উল-ইসলাম, ব্যবস্থাশাস্ত্রবিদ ইমাম আবু হামিদ অল্-গজ্জালী, যাঁহাকে উদ্দেশ্য করিয়া মিশরীয় জ্ঞানী, ধর্মসাধক জলাল উদ্দীন বলিয়াছিলেন, "মহম্মদের মৃত্যুর পর যদি অপর কোন পয়গম্বর জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন, আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি,— অল্-গজ্জালীই সেই পয়গম্বর"— সেই জইন-উল-দীন (ধর্ম্মের জ্যোতিঃ) অশেষ শাস্ত্র-জ্ঞান-পাণ্ডিত্যের আধার অল-গজ্জালীও জ্ঞানেও মূর্ত্ত-

অবতার ওমর খৈয়ামের নিকট উপদেশ গ্রহণ করিতে আসিতেন। কোন বিষয়ে কোন সমস্যার নিরাকরণ করিতে অপারগ হইলে, সুপণ্ডিত ওমরের শরণাপন্ন হইতেন। বিদ্যা-জ্ঞানের আধার ওমর সানন্দে তত্ত্বকথা বুঝাইয়া তাঁহার সন্দেহ নিরাকরণ করিয়া দিতেন। কিন্তু অল্-গজ্জালী, ওমরের স্বাধীন মতবাদ সহ্য করিতে পারিতেন না। এই স্থানেই ওমরের সহিত গজ্জালীর মতানৈক্য ঘটিত। আমরা অল-গজ্জালীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিলাম।

ইসলাম ধর্ম্ম প্রচারিত হইবার পর, যাঁহারা এই ধর্ম্মের গৌরব-পতাকা বহন করিয়া দিকে দিকে ইহার মহিমা প্রচার করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন,—শাস্ত্রজ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের আধার ইমাম আবু হামিদ মহম্মদ অল্-গজ্জালী তাঁহাদিগের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসন লাভ করিয়া ধর্ম্ম-জগতের ইতিবৃত্তে চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। ইমাম গজ্জালী খোরাসানের অন্তর্গত তুশ নগরের ৪৫০ হিঃ (১০৫৮ খৃষ্টাব্দ) জন্মগ্রহণ করেন। সুকুমার জীবন-প্রভাতে পিতৃ-মাতৃহীন হন। মাতা-পিতার মৃত্যুর পর গজ্জালী তাঁহার পিতৃবন্ধু আহমদ অল-রাধখানির সংসারে প্রতিপালিত হইয়া বিদ্যা শিক্ষা করেন; পরে খোরাসানের উচ্চ বিদ্যালয়ে উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন। নিশাপুরে ও জুর্জন প্রদেশের সুপ্রসিদ্ধ ধর্ম্মতত্ত্ববিদ্ যথাক্রমে, ইমাম উলহার মোনের ও আবু নসর অল-ইসমাইলের নিকট ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। কুড়ি বৎসর বয়সের সময়েই অধ্যাত্মতত্ত্বের গভীর গুহায় আত্মনিমজ্জন করেন। এই বয়স হইতেই তিনি ধর্ম্মবিষয়ক বক্তৃতা প্রদান ও কতকগুলি ধর্ম্ম-পুস্তিকা প্রচার করেন। এই ধর্ম্মপুস্তিকাগুলি বিদ্বান-কুল-গৌরব, শ্রেলজুক-মন্ত্রী নিজাম-উল্-মুল্কের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সুপণ্ডিত মন্ত্রিপ্রবর গজ্জালীর জ্ঞান-পাণ্ডিত্যে

অল গজ্জালী

মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে নব প্রতিষ্ঠিত নিজামিয়া মাদ্রাসার অধ্যাপক পদে নিযুক্ত করেন। অল্-গজ্জালী যে-সমস্ত গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন, সমস্তগুলিই ধর্ম্ম-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠসম্পদরূপে মুসলিম-জগতে সম্মানিত। তাঁহার সমস্ত গ্রন্থই আরবী ভাষায় লিখিত। ইহার মধ্যে অনেকগুলি পুস্তক পারশ্য ভাষায় অনূদিত হয়। গজ্জালীর গ্রন্থাবলী লাতিন, জর্ম্মাণ, ফরাসী, হিব্রু এবং ইংরাজী ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। তিনি ৫০৫ হিজরাব্দে (১১১১ খ্রীঃ) দেহত্যাগ করেন।

ওমর খৈয়াম ও অল্ গজ্জালী

অল্-গজ্জালী, ওমরকে "আকাশের অবস্থা" সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন। তাঁহার প্রশ্ন শুনিয়া ওমর শান্ত এবং গম্ভীর স্বরে গজ্জালীকে বলেন, তিনি তাঁহার "এরাইয়াস্থন নক্সি" নামক পুস্তকে এ বিষয়ে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ঐ গ্রন্থ পাঠ করিলেই সমস্ত বিষয় জানা যাইবে। অল্-গজ্জালী ওমরের মুখে ইহার বিশদ ব্যাখ্যা শ্রবণ করিবার জন্য তাঁহাকে পুনঃপুনঃ অনুরোধ করিয়া জিজ্ঞাসা করেন, "কোন গোলক যে অংশের সাহায্যে অক্ষের উপর ঘুরিতে থাকে, গোলকের সমস্ত অংশ একই প্রকার হওয়া সত্ত্বেও ঐ অংশটি অন্যান্য অংশ হইতে পৃথকরূপে জানা কিরূপ সম্ভব?" ওমর গজ্জালীর অনুরোধে ব্যাখ্যা আরম্ভ করেন, এই ব্যাখ্যা দ্বিপ্রহর হইতে আরম্ভ হইয়া অপরাহ্ণেও শেষ হয় নাই। অপরাহ্ণ-নমাজের সময় উপস্থিত হওয়ায় ওমর গাত্রোত্থান করেন অল-গজ্জালী মুগ্ধ চিত্তে ওমরের গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া গাত্রোত্থান কালে বলেন, "সত্য মূর্ত্তির দর্শনলাভ করিয়া শান্তি ও আনন্দ লাভ করিলাম। মিথ্যা-যবনিকা অপসারিত হইয়াছে।

অর্থাৎ পূর্ব্বে আমার যে ধারণা ছিল, উহাই মিথ্যা, আজ সত্যসাধক ওমরের ব্যাখায় সত্য মূর্তি প্রকাশিত হইয়াছে।”(১)

ওমর সাহিত্য-শাস্ত্রেও সুপণ্ডিত ছিলেন।—ঐতিহাসিক শহ্‌রজুরি লিখিয়াছেন—ওমর-খৈয়াম অল-আরবিয়াতেও (প্রাচীন সাহিত্য-শাস্ত্র Classical Arabic) সুপণ্ডিত ছিলেন।

ওমর-খৈয়াম ও অল্-বৈহাকী

আবতুল হসন অল্-বৈহাকী(২) ওমর খৈয়ামের সাহিত্যশাস্ত্রে গভীর জ্ঞানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, ৫০৫ হিজরাব্দে (১১১১ খৃঃ) আমি ইমাম ওমরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাই। তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইয়া দেখি যে, তাঁহার গৃহ বিদ্বান্মণ্ডলীতে পূর্ণ; সকলেই তাঁহাকে নানাবিধ প্রশ্ন করিতেছে; ওমর একে একে সকল প্রশ্নের উত্তর দিয়া সকলের সন্দেহ নিরাকরণ করিতেছেন, আমি একটি দুরূহ আরবী কবিতার তাৎপর্য্য এবং ইহার টীকা বোধগম্য করিবার জন্য তাঁহার নিকট গিয়াছিলাম। একে একে সকলের ব্যাখ্যা শেষ হইলে, তাঁহাকে হামসা হইতে একটি কবিতা পাঠ করিয়া উহার ব্যাখ্যা করিবার জন্য অনুরোধ করি। সাহিত্য-শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ওমর খৈয়াম ঐ শ্লোকের সরল ব্যাখ্যা করিয়া আমাকে বুঝাইয়া দেন।(৩)

ওমর খৈয়াম জ্ঞানরাজ্যে এতই শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছিলেন যে, তিনি

১। মুজ্রহ্‌রৎ-উল-আরওয়া।

২। খোরাসানের অন্তর্গত বৈহাক প্রদেশের বিদ্বান ও দার্শনিক।—৪৫০ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ ও ৫৩৬ খৃষ্টাব্দে সমাধিস্থ হন। ইনি ওমরের সমসাময়িক ছিলেন; প্রাচীন সাহিত্যের সমালোচক হিসাবে তৎকালে প্রসিদ্ধ ছিলেন।

৩। ফারদৌস-উৎ-তওয়ারীখ।

তাঁহার চরম জ্ঞানের পরিচয় দেন—গ্রীক-বিদ্যা-জ্ঞানানুশীলন দ্বারা। গ্রীক-বিদ্যা-জ্ঞান অনুশীলন তৎকালীন যুগে সাধারণের মধ্যে সুলভ ছিল না।

বিদেশীয় বিদ্যায় ওমরের পাণ্ডিত্য

প্রসিদ্ধ গ্রীক বিদ্বানগণের পুস্তকাবলী আরবী ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। অধিকাংশ লোক অনূদিত পুস্তকের সাহায্যেই গ্রীক-বিদ্যাজ্ঞানের পরিচয় লাভ করিয়া ধন্য হইত। অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন জ্ঞানী দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকগণই কেবলমাত্র মূল গ্রীক গ্রন্থাবলী অধ্যয়ন করিয়া জ্ঞান সঞ্চয় করিতেন। ওমর খৈয়াম, অল্-কিন্দী, (১) অল্-ফ্যারাবী, (২) তাঁহার সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ গুরু অবু-সিনা, ইবনে রোশন প্রমুখ যুগশ্রেষ্ঠ দার্শনিক, চিন্তাবীরগণের মত মূল গ্রীক গ্রন্থাবলী পাঠ করিয়া গ্রীক-জ্ঞান-প্রতীকরূপে দেশবাসীর শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

ওমর খৈয়াম গ্রীক-বিদ্যা আলোচনা করিয়া কিরূপ সুপণ্ডিত হইয়াছিলেন, দার্শনিকগণের বিবরণী লেখক, ঐতিহাসিক জমল উদ্দীন অল-কফতী (৩) প্রদত্ত বিবরণ হইতে জানিতে পারা যায়। অল্-কফতী

১। মোসলেম দর্শনশাস্ত্রের জনক অল্-কিন্দী নবম খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে কুশনগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা এই নগরের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। অল-কিন্দী খলিফা মামুন ও মুতাসিমের দরবারে বিদ্বান পারিষদ ছিলেন। এই সময়ই তিনি গ্রীক-দর্শন গ্রন্থাবলী আরবী ভাষায় অনুবাদ ও সম্পাদন করেন। ইঁহার তুল্য গ্রীক বিদ্যা-বিশারদ তৎকালে কেহই ছিলেন না।

২। তুর্কিস্তানের অন্তর্গত ফ্যারাব প্রদেশবাসী দার্শনিক। ইনি গ্রীক-বিদ্যায় অসাধারণ পাণ্ডিত্য লাভ করিয়া "দ্বিতীয় আরিস্তোতল" নামে সম্মানিত হয়েন। ৩৪৩ হিঃ (৯৫৪ খ্রীঃ) সিরিয়া দেশে ঘাতুক সম্প্রদায় কর্ত্তৃক নিহত হন।

৩। ত্রয়োদশ শতাব্দীর দার্শনিক। শহ্‌র্জুরির মত ইনিও মোসলেম দর্শনশাস্ত্রের ইতিহাস ও দার্শনিকগণের বিস্তৃত বিবরণ লিখিয়াছিলেন। "তারিখ-উল-হুকমা" তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ জীবনী পুস্তক।

লিখিয়াছেন,—যুগশ্রেষ্ঠ বিদ্বান, ইমাম ওমর খৈয়াম গ্রীক-জ্ঞান-বিজ্ঞান-শাস্ত্রের নানা বিভাগেই অসাধারণ জ্ঞানী ছিলেন। তিনি গ্রীক-পদ্ধতি অনুসারে জ্ঞানানুশীলন করিতেন এবং ইহার উপকারিতা সম্বন্ধে দেশবাসীকে উপদেশ দিতেন।(১)

আর একজন চরিতকার ওমরের গ্রীক-বিদ্যা-জ্ঞানানুশীলন সম্বন্ধেও যে বিবরণ প্রদান করিয়াছেন, তাহাও নিম্নে বিবৃত হইল :—

খোরাসানের বিশিষ্ট বিদ্বান ওমর খৈয়াম গ্রী-জ্ঞান-বিজ্ঞানে সুপণ্ডিত ছিলেন। গ্রীকজ্ঞানানুশীলন তাঁহার প্রিয় কার্য্য ছিল। তিনি তাঁহার ছাত্রবর্গকে গ্রীক জ্ঞান-বিজ্ঞান সংন্ধে বক্তৃতা উপদেশ প্রদান করিতেন।(২)

ওমর খৈয়াম ও জন্মান্তরবাদ

ওমর খৈয়াম জন্মান্তরবাদ ও জন্মান্তরীয় কর্ম্মফলজনিত সুখ-দুঃখপ্রাপ্তি বিশ্বাস করিতেন। তিনি বলিতেন. এই তত্ত্ব ভাল করিয়া জানিতে পারিলেই জটিল বিশ্ব-রহস্যের বিষয় অবগত হওয়া যায়। ওমর পুনর্জ্জন্মতত্ত্বেও বিশেষ জ্ঞানলাভ করিয়া বিশেষজ্ঞের সম্মানলাভ করিয়াছিলেন। তিনি যে জন্মান্তর স্বীকার করিতেন, নিম্নলিখিত বিবরণ হইতে আমরা জানিতে পারি।

নিশাপুরের এক কলেজে ওমর ছাত্রগণ সমেত উপস্থিত হয়েন। এই সময় কলেজের জীর্ণ-সংস্কার হইতেছিল এবং কতকগুলি গর্দ্দভ ইষ্টক বহন কার্য্যে নিযুক্ত ছিল; তন্মধ্যে একটি গর্দ্দভ প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিতে পারিতেছিল না। ইহা দেখিয়া ওমর সহাস্যে গর্দ্দভটির নিকট গমন করিয়া একটি কবিতা আবৃত্তি করেন। অতঃপর গর্দ্দভ প্রাঙ্গণে প্রবেশ করে। ইহাতে বিস্মিত ছাত্রের দল ওমরকে ইহার কারণ

১। তারিখ-উল্-হুকমা।
২। আকবর উল উলেমা।

জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিলেন, এই গর্দ্দভটির দেহে আপাততঃ যে, আত্মা বিরাজমান, পূর্ব্বে সে এই বিদ্যালয়ের এক অধ্যাপকের দেহে ছিল, এই জন্য লজ্জায় সে প্রবেশ করিতে পারিতেছিল না। কিন্তু এখন তাহার সহযোগীরা তাহাকে চিনিয়া ফেলিয়াছে বুঝিতে পারিয়া উপায়ন্তরের অভাবে প্রবেশ করিল।(১)

ওমরের স্মৃতিশক্তি

ওমরের স্মরণশক্তি এরূপ অসাধারণ ও তীক্ষ্ণ ছিল যে, উহা পারশ্য দেশে প্রবাদ বাক্যে পরিণত হইয়াছিল। নিম্নলিখিত বিবরন হইতে ইহার পরিচয় পাওয়া যায়। ইস্পাহানে অবস্থানকালে ইমাম ওমর খৈয়াম একখানি দর্শনশাস্ত্র পাঠ করিয়া এতই মুগ্ধ হয়েন যে, ঐ পুস্তকখানি উপর্য্যুপরি সাত বার পাঠ করিয়া কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিলেন। তিনি ইস্পাহান হইতে নিশাপুর প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া কোন শিষ্যকে সমগ্র পুস্তকখানি মুখস্থ বলেন। মূল পুস্তকের সহিত ওমর প্রদত্ত শ্রুতিলিখন মিলান হইলে দেখা যায় যে, অতি অল্পই মূল হইতে তফাৎ হইয়াছে।(২)

যুগমানব ওমর খৈয়াম

নূতন নূতন সাহিত্য ও শিল্প সৃষ্টি, দর্শনের ক্ষেত্রে নব নব চিন্তাধারা প্রবর্ত্তন, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নব নব রহস্যের দ্বার উদ্ঘাটন করা ব্যক্তিবিশেষের অনন্যসাধারণ প্রতিভার উপর নির্ভর করে। যিনি এই অসারাণ কর্ম্ম সম্পাদন করেন, তিনিই অসাধারণ বা যুগ-মানবরূপে সম্মানিত হন। এই সকল মনীষীর সংখ্যা কোন যুগেই অধিক নহে। ইহারাই জ্ঞান-রাজ্যের অভিজাত সম্প্রদায়ের মানুষ।—জ্ঞান-পাণ্ডিত্য-প্রতিভার উজ্জ্বল মূর্ত্তি ওমর খৈয়াম জ্ঞানের উজ্জ্বল বর্ত্তিকা হস্তে দর্শন-

১। তারীখ-ই অল্ফী।

২। নুজহৎ-উল্ আরওয়া

বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁহার অদ্ভুত অধ্যবসায় ও গবেষণা দ্বারা নূতন আলোক-রশ্মিপাত করিয়া জ্ঞান-রাজ্যের অধীশ্বর—যুগ-মানবরূপে সম্মানিত হন। শেলজুক সম্রাট মলিক শাহের রাজত্বকালে যদি কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা—জ্ঞানিগণাগ্রগণ্য ওমর খৈয়ামের নবনবোন্মেষশালিনী বৈজ্ঞানিক-প্রতিভার বিকাশ। দশম শতাব্দীতে যেমন ওমর-গুরু আবু-সিনার প্রতিভাচ্ছটায় সমগ্র পারস্য দেশ আলোকিত হইয়াছিল, পরবর্ত্তী যুগে তেমনই আবু-সিনার উপযুক্ত শিষ্য যুগ-মানব ওমর খৈয়াম অপূর্ব্ব প্রতিভালোকে সমগ্র পারস্য আলোকিত হয়। সুলতান মলিক শাহের রাজত্ব-ইতিহাস জ্ঞান-বিজ্ঞানের সুবর্ণ যুগের ইতিহাস বলিলে অত্যুক্তি করা হয় না।

জ্ঞানতপস্বী ওমর খৈয়ামের অলৌকিক প্রতিভা, জ্ঞানের পরিচয় দিতে গিয়া চরিতাভিধানকার সৈয়দ আলি বিন মহম্মদ অল্-হুসেনী(১) পরম শ্রদ্ধাপূর্ণ যে মনোজ্ঞ বিবরণ প্রদান করিয়াছেন, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল। তিনি লিখিয়াছেন, ওমর খৈয়াম এরূপ অনন্যসাধারণ জ্ঞান-পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন যে, তাঁহাকে অকুতোভয়ে জ্ঞান-আকাশের ধ্রুবনক্ষত্র, জ্ঞান-সমুদ্রের মুক্তারূপে শ্রদ্ধা ও সম্মান দেখাইতে পারা যায়। পারস্যের পণ্ডিত-সমাজ তাঁহার ক্রীতদাস ছিল। অর্থাৎ জ্ঞানিগণাগ্রগণ্য অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন যুগ-মানব ওমর খৈয়ামের জ্ঞান-পাণ্ডিত্যের নিকট তাহাদিগের জ্ঞান-পাণ্ডিত্য অকিঞ্চিৎকর; এই কারণে তাহারা শ্রদ্ধার সহিত একবাক্যে ওমরের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার

জ্ঞান-আকাশের ধ্রুব নক্ষত্র

১। ষোড়শ শতাব্দীর কবি-বিবরণী লেখকরূপে বিখ্যাত ছিলেন। তাঁহার কবি-বিবরণী বা চরিতাভিধানের নাম "বাজমারাই"। এই গ্রন্থ তিনি ১০০০ হিজরাব্দে (১৫৯২ খৃঃ) সমাপ্ত করেন।

করিয়া লইয়াছিল। আরবীয় বিদ্বানগণও ওমর খৈয়ামকে অদ্বিতীয় জ্ঞানিরূপে শ্রদ্ধাঞ্জলী প্রদান করিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছিল। ওমর খৈয়াম এরূপ মনীষাসম্পন্ন ছিলেন যে, তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রীক মনীষী ইউক্লিডকেও জ্ঞানের উৎকর্ষে অতিক্রম করিয়াছিলেন। শুধু ইহাই নহে, তাঁহার জ্ঞান-পাণ্ডিত্যের নিকট গ্রীক বিদ্বান আরিস্তোতলের জ্ঞান-পাণ্ডিত্য-মনীষাও ম্রিয়মাণ।(১)

ওমরের প্রতি সুলতান-গণের শ্রদ্ধা নিবেদন

ওমর খৈয়াম তাঁহার অত্যাশ্চর্য্য ও অনন্যসাধারণ পাণ্ডিত্য ও প্রতিভার দ্বারা যেমন যুগ-প্রসিদ্ধ হইয়া যুগ-মানবরূপে দেশবাসীর শ্রদ্ধালাভ করিয়াছিলেন, তেমনই দেশের সুলতান,—প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাগণেরও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা জ্ঞানতপস্বী ওমরের সহিত শ্রদ্ধেয় বন্ধুর মত ব্যবহার করিতেন। সুলতান মলিক শাহের দরবারে বিদ্বান্-পরিষদ্ ও মুনাজ্জিম-ই-শাহী রূপে অবস্থান করিলেও, সুলতানের মৃত্যুর পূর্ব্ব-মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত ওমর তাঁহার নর্ম্মসখা ছিলেন। সুলতান মলিক শাহের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র সুলতান সঞ্জর সিংহাসনারোহণ করিলে, তিনিও ওমর খৈয়ামের সহিত পরম শ্রদ্ধাপূর্ণ ব্যবহার করেন। শুধু ইহাই নহে, ওমর খৈয়ামের যোগ্য আসন তাঁহার সিংহাসনের দক্ষিণ পার্শ্বে নির্দ্দেশ করিয়া দেন। বোখারার শাসনকর্ত্তা খাকান শাসন-উল-মুল্ক ওমর খৈয়ামকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন। তিনিও সুলতান সঞ্জরের মত রাজসিংহাসনের পার্শ্বে ওমরের উপযুক্ত স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দেন।(২)

১। বাজমারাই।

২। মুজহৎ-উল-আরওয়া

জ্ঞান-যোগী ওমর খৈয়াম জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাধনায় জয়যুক্ত হইলে পারস্যের জ্ঞান-দেবতা অলক্ষ্যে তাঁহার প্রতিভা-উজ্জ্বল ললাটে অমরত্বের জয়টিকা প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা বলাই বাহুল্য। বাস্তবিকই ওমর পারস্যের জাগ্রত প্রজ্ঞা ছিলেন বলিয়াই গ্রীক-মনীষী আরিস্তোতল

অমরত্বের জয়টিকা

(Aristotle)—যিনি মুসলিম দার্শনিকগণের গুরু ছিলেন, যাঁহার দর্শন অবলম্বন করিয়া মুসলিম সম্প্রদায় দর্শন-শাস্ত্র রচনা করিয়াছিলেন,—সেই গ্রীক জ্ঞানবীর আরিস্তোতল এবং গ্রীক বিদ্বান ইউক্লিডের (Euclid) মনীষা ও জ্ঞানের সহিত তাঁহার জ্ঞান-পাণ্ডিত্য-প্রতিভার তুলনা করা হইয়াছিল।

নবম পরিচ্ছেদ

মুসলিম দর্শনে গ্রীক প্রভাব

আব্বাসবংশীয় খলিফাগণের রাজত্বকাল হইতেই প্রাচীন মুসলমান সম্প্রদায় প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানসঞ্চয়ে অগ্রসর হইয়া জগতের বিভিন্ন উন্নতিশীল জাতির জ্ঞান-ভাণ্ডার হইতে জ্ঞান-বিজ্ঞান আহরণ করিয়া বিদ্যা-জ্ঞানের ভাণ্ডার হইয়া উঠে। গণিত-জ্যোতিষ-চিকিৎসা-বিজ্ঞান অনুশীলন করিবার সময় তাঁহারা হিন্দু-গ্রীক-মিশর-পারসিক জাতির জ্ঞান-উৎস হইতে যেমন জ্ঞান সঞ্চয় করিয়াছিলেন, দর্শনশাস্ত্র আলোচনা করিবার সময় কিন্তু গ্রীক ব্যতীত অন্য জাতির জ্ঞান-ভাণ্ডার হইতে ঋণ গ্রহণ করেন নাই। ইসলাম ধর্ম্ম যখন পারস্য সিরিয়া ও মিশর দেশে বিস্তৃতি লাভ করে, সেই সময় হইতে মুসলিম সম্প্রদায় গ্রীক সভ্যতার সংস্পর্শে আইসে।

মুসলিম সম্প্রদায়ের উপর হিন্দু প্রভাবের অবসান

সিন্ধুদেশ বোগদাদ-খলিফার শাসনাধীন হইবার পর হইতে ভারতবর্ষের সহিত বোগদাদের জ্ঞান-বিজ্ঞান আলোচনার সম্পর্কে যে পরিচয়—যোগসূত্র স্থাপিত হইয়াছিল, সিন্ধুদেশ অধীনতা-পাশ হইতে মুক্ত হইবার পর তাহা বন্ধ হয়। ইহার পর আর আরবীয় গ্রন্থে হিন্দুর সভ্যতা, হিন্দুর বিদ্যা-জ্ঞানের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। গ্রীক সভ্যতা, গ্রীক জ্ঞান-বিজ্ঞান পূর্ব্ব হইতে মুসলিম সম্প্রদায়ের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। এই ঘটনার পর হইতে মুসলিম সম্প্রদায় সর্ব্ববিষয়ে গ্রীক প্রভাবান্বিত হইয়া পড়েন। ইহার ফলে, তাঁহারা গ্রীক

জ্ঞান-ভাণ্ডার হইতেই দর্শনশাস্ত্রের জ্ঞান আহরণ করেন। ইহার পূর্ব্বে ইসলাম-জগতে দার্শনিক তত্ত্বমূলক অনুশীলন বা আলোচনা অতি অল্পই ছিল।

কোরান ও লুকম্যান

কোরান মানবের সমস্ত জ্ঞাতব্য তথ্যে পূর্ণ হইলেও, ইহাতে দার্শনিক চিন্তার উপাদান অতি অল্পই পাওয়া যায়; এবং যাহা পাওয়া যায়, তাহাই আবার জ্ঞানী লুকম্যানের বাণীর প্রতিধ্বনি মাত্র।(১) জ্ঞানী লুকম্যানকে মহম্মদ অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন। কোরানের যে অধ্যায়ে তিনি এই জ্ঞানবীরের সম্বন্ধে শ্রদ্ধাপূর্ণ আলোচনা করিয়াছেন, উহা "সুরা-লুকম্যান" নামে পরিচিত। লুকম্যানের বাণী রাজা সলোমানের মত বাণীর মত ঈশ্বর-অনুপ্রেরণায় রচিত। খৃষ্টজন্মের হাজার বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার নীতি-উপদেশ প্রচারিত হয়।(২)

জ্ঞানী লুকম্যান

পয়গম্বর যে দর্শন শাস্ত্রকে ধর্ম্ম হইতে পৃথক করিয়াছিলেন, তাঁহার জামাতা চতুর্থ খলিফা আলি উহাকেই আবার ধর্ম্মের সহিত একত্র করিয়া ধর্ম্ম ও দর্শনের সমন্বয় সাধন করেন; তিনিই ইসলাম-জগতের প্রথম দার্শনিক হিসাবে জনসাধারণের শ্রদ্ধা লাভ করেন। ধর্ম্ম ও দর্শনের সমন্বয় সম্পর্কে তাঁহার বাণী এইরূপ:—

ধর্ম্ম ও দর্শনের সমন্বয় সম্পর্কে চতুর্থ খলিফার বাণী

"বিশ্বাসীরা (মুসলমানেরা) যে দর্শন শাস্ত্রকে এতকাল ধর্ম্ম হইতে

১। কোরান ৩১শ অধ্যায়; Encyclo of Religion and Ethics.

২। হকিম-ই-লুকম্যানের বাণী উপদেশের সংখ্যা দশ হাজার। তিনি ভগবদ-অনুপ্রাণিত ছিলেন কিনা, এ বিষয়ে সমস্ত ব্যাখ্যাকার একমত নহেন। একজন আরব ব্যাখ্যাকার তাঁহার বাণীর সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, সমগ্র পৃথিবী অপেক্ষাও তাঁহার বাণী অধিকতর মূল্যবান। তাঁহার বাণী ও নীতি-উপদেশপূর্ণ গল্পগুলি ঈশফের গল্পের মত; এই কারণ অনেক পণ্ডিত ঈশফের মৌলিকত্ব অস্বীকার করিয়া বলিয়াছেন, জ্ঞানী লুকম্যানই তাহাদের প্রকৃত রচয়িতা।

পৃথক করিয়া রাখিয়াছিল, উহাকে পুনরায় ধর্মের সহিত একত্র করিতে হইবে : আবশ্যক হইলে বিধর্মীর নিকট হইতেও গ্রহণ করিতে হইবে।"(১) ইহাই মুসলিম দর্শনের গোড়ার কথা।

আরিস্তোতলের মতবাদের সহিত মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রথম পরিচয়

প্রাচীন মুসলিম সম্প্রদায় সিরীয় অনুবাদের মধ্যস্থতায় প্লেতো (Plato) ও আরিস্তোতলের (Aristotle) দার্শনিক মতবাদের সহিত প্রথম পরিচয় লাভ করেন।(২) সিরীয় জাতিই সর্ব্বপ্রথম আরিস্তোতলের গ্রন্থাবলীর অনুবাদ টীকা ও ভাষ্য রচনা করেন।(৩)

আরিস্তোতলের প্রভাব

খলিফা অল-মামুনের রাজত্বকাল হইতেই মুসলিম সম্প্রদায় গ্রীক দার্শনিক মতবাদের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভ করেন।(৪) গ্রীক মনীষী আরিস্তোতল (Aristotle) প্রাচীন মুসলমান সম্প্রদায়ের উপর এরূপ প্রভাব বিস্তার করেন যে, তাঁহার বাণীই তাঁহাদিগের বীজমন্ত্রস্বরূপ হইয়াছিল। কোরান এবং আরিস্তোতলের দার্শনিক মতবাদ পাশাপাশি রাখিয়া তাঁহারা পাঠ করিতেন এবং এই মতবাদকেই কোরানের পরিশিষ্টরূপে গ্রহণ

১। Encyclo of Religion of Ethics.

২। A History of Classical Scholarship. Sandys; Encyclo of Islam,

৩। A History of Classical Scholarship. Sandys.

৪। Encyclo of Islam; A History of Classical Scholarship. Sandys; Uebrwg's, History of Philosophy. Translated by Morris.

করিয়াছিলেন।(১) মোটকথা, মুসলিম দর্শন বলিলে, তৎকালে আরিস্তোতলের দার্শনিক মতবাদকেই বুঝাইত।(২)

আরিস্তোতলের দার্শনিক তত্ত্বমূলক বাণী যখন ইসলাম-জগতে প্রথম প্রকাশ পায়, তখন ইহা কোরানের বাণীর মতই প্রতীত হইয়া তাঁহাদিগের মনশ্চক্ষে অমৃতের সোপান প্রদর্শন করিলেও, তখনও তাঁহারা এই মতবাদ বুঝিবার মত জ্ঞানলাভ করেন নাই; সর্ব্বজন-গৃহীত ধর্ম্মতত্ত্ব (orthodox theology) ও আরিস্তোতলের মতবাদের মধ্যে অনৈক্য (discripency) কোথায়, তাহা তাঁহারা তখনও বুঝিতে পারেন নাই। এই কারণেই তাঁহারা কোরান এবং আরিস্তোতলের দর্শন পাশাপাশি রাখিয়া দৃঢ়বিশ্বাসের সহিত উহাকেই কোরানের পরিশিষ্ট রূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন।(৩)

মুসলিম জ্ঞানী সম্প্রদায়ের মানসিক অবস্থা যখন এইরূপ, ঠিক এই সময়েই গ্রীক দর্শন অনুশীলন করিবার জন্য একটি দল বা সম্প্রদায় গঠিত হয়, ইঁহারা ইতিহাসে "অল-ফলসফা" বা দার্শনিক নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ইসলাম-সভ্যতার ইতিহাসে এই সম্প্রদায় বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিল। ইঁহারাই দার্শনিক আরিস্তোতলের মতবাদের প্রচারক ছিলেন। গ্রীক গ্রন্থ পাঠ করিয়া গ্রীক দর্শনের অনুবাদ প্রচার এবং অনুশীলন করাই এই সম্প্রদায়ের ব্রত ছিল। যাঁহারা এই কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিতেন, তাঁহাদিগকে

অল-ফলসফা

১। Arabic thought and its place in history. De Lacy O'Lary.

২। History of Eastern Philosophers. Macdonald.

৩। Arabic thought and its place in history, De Lacy O'Lary.

গ্রীক পুঁথি এবং গ্রীক বিদ্বানগণের টীকা গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া সবিশেষ জ্ঞান সঞ্চয়পূর্ব্বক অনুবাদকের দায়িত্বপূর্ণ কর্ম্ম করিতে হইত। ইহারাই "ফলসফা" বা দার্শনিক নামে সম্মানিত হইতেন। ইহাদিগের পর যাঁহারা গ্রীক দর্শন অনুশীলন বা আলোচনা করেন, তাঁহারা "হকিম" বা জ্ঞানী নামে অভিহিত হইতেন। ফলসফা সম্প্রদায় তৃতীয় হিজরাব্দ হইতে অনুবাদ কার্য্য আরম্ভ এবং সপ্তম হিজরাব্দে উহা সুসম্পন্ন করেন।

ফলসফা ও হকিম

ঐতিহাসিক আবুল ফতেহ মুহম্মদ অল-শহরস্তানী এই সম্প্রদায়ের বিস্তৃত ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তিনি তাঁহার ইতিহাসে বিংশতি জন ফলসফার নাম উল্লেখ করিয়াছেন, যাঁহারা মূল গ্রীক গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া আরিস্তোতল ও প্লেতোর গ্রন্থাবলীর অনুবাদ ও ভাষ্য রচনা দ্বারা "ফলসফা" নামের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছিলেন। প্লতিনাস (Plotinus) ২০৩-২৬২ খ্রীঃ) যিনি মুসলিম-জগতে আফ্লাতুন-ই-মিশরী (মিশরীয় প্লেতো) এবং অল-শেখ-অল-য়ুনানী (গ্রীক প্লেতো) নামে পরিচিত ছিলেন, তাঁহার মতবাদের মধ্য দিয়াই মুসলিম-সম্প্রদায় নব-প্লেতো-পন্থার (Neoplatonism) মতবাদের সহিত পরিচিত হয়।(১) ইহা হইল খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীর কথা। ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, ইহার তিন শত বৎসর পূর্ব্বে পারস্যের ন্যায়বান নরপতি নওশেরওয়াঁর রাজত্বকালে পারস্যদেশে গ্রীকদর্শনের অনুশীলন ছিল।(২) প্লতিনাস আফ্লাতুনরূপে পারস্য দেশে অসীম প্রভাব বিস্তার করেন।(৩)

প্লতিনাস

১। Introduction. Rubaiyyat by Edward Heron Allen.

২।. Fall and Decline of Roman Empire. Gibbon.

৩। Encyclo of Religion and Ethics.

আরও জানা যায় যে সাতজন গ্রীক দার্শনিক পারস্য নরপতির সাদর আহ্বানে পারস্য দেশে আহূত হন, তাঁহারা প্রত্যেকেই নব-প্লেতো পন্থী (Neoplatonist) ছিলেন(১)

প্লেতো, আরিস্তোতল অপেক্ষা মুসলিম-সমাজে স্বল্পখ্যাত হইলেও, মুসলিম সম্প্রদায় নব-প্লেতো-পন্থী সম্প্রদায়ের মতবাদের মধ্য দিয়াই প্লেতোর মতবাদের সহিত পরিচিত হন। ফলসফা-সম্প্রদায় যখন গ্রীক দর্শন অনুশীলন আরম্ভ করেন, তাঁহারা নব-প্লেতো-পন্থারই অনুশীলন করিতেন। এইজন্য বলিতে পারা যায় যে, ফলসফা সম্প্রদায় প্রকৃতপক্ষে নব-প্লেতো-পন্থারই বিকাশ মাত্র (development of Neoplatonism)।(২)

প্লেতো ও আরিস্তোতলের মতবাদ প্রচলিত গ্রীক-চিন্তাধারা হইতে বিচলিত হইয়া বিভিন্ন পথগামী হয়। প্লেতো সম্প্রদায়ের গুরুভক্তি একনিষ্ঠ হইলেও, গুরুর সহিত প্লেতো-শিষ্যগণের মতবিরোধ হয়। কিছুকাল ধরিয়া গ্রীসে সর্ব্বদর্শনসারসংগ্রহবাদ (Eclecticism) প্রচলিত হওয়ায় গ্রীক-চিন্তা কোনো প্রকার ফলপ্রসূ হয় নাই।

নব-প্লেতো-পন্থার (Neoplationism) জন্ম গ্রীস দেশে নহে, পরন্তু মিশরের আলেকজেন্দ্রিয়ায় (Alexendria)। যে সময় মিশরের জ্ঞানী সম্প্রদায় জ্ঞান-জগতে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেন, যে সময় গ্রীসের শিক্ষা-পরিষদ (Official Academy) এবং উহার অধ্যাপকগণ পঞ্চম খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভকাল পর্য্যন্ত গুরুত্বহীনতা (Insignificance) দোষে দুষ্ট হয়, ঠিক সেই সময়

নব-প্লেতো-পন্থার জন্ম

১। Fall and Decline of Roman Empire. Gibbon.

২। Encycle of Religion and Ethics.

এই বিদ্যালয় প্লতিনাস-সম্প্রদায় অথবা ইএমব্লিকাশ (Iamblicus) সম্প্রদায়ের অধিকারে আইসে এবং ৫২৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত নব-প্লতো-পন্থী হয়। নব-প্লেতো-পন্থী সম্প্রদায় সুদীর্ঘ আটশত বৎসর ধরিয়া গ্রাস-দেশে এই দর্শনের অধ্যাপনা ও প্রচার করেন। এই সময় হইতে প্লতিনাস ও তাঁহার শিষ্য পরফিরি (Porphyry) এবং ইএমব্লিকাশ (Iamblicus) "প্লেতো-পরিষদের সভ্য" (Academician) নামের পরিবর্ত্তে নব-প্লেতো-পন্থী (Neoplatonist) নামে পরিচিত হন।

এই সময় পূর্ব্ব এবং পশ্চিমের জ্ঞান-চিন্তা ও ভাবধারার সম্মেলনে আলেকজেন্দ্রিয়ার (Alexendria) বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য ফুটিয়া উঠিয়াছিল; এসিয়ার জ্ঞান-বিজ্ঞান-চিন্তা-ধারা এই সময় জ্ঞান-রাজ্যের শীর্ষদেশে অধিরোহণ করিয়াছিল। ভারতীয়গণ যে জ্ঞান-রাজ্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, ফিলসট্রেতস (Philastratus), পরম শ্রদ্ধাভরে উহার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। সুপ্রসিদ্ধ য়্যাপলোনিয়স (Apalloneus) ভারতীয় জ্ঞান-চিন্তা-ধারার সহিত পরিচিত হইবার জন্যই ভারতবর্ষে আগমন করেন। প্লতিনাস (Plotinus) জ্ঞানার্জ্জনের জন্যই রোমান সৈন্যসহকারে পারস্য দেশে উপস্থিত হয়েন; যখন তাঁহার সৈন্যগণ ধনরত্ন লুণ্ঠনে ব্যস্ত, সে সময় তিনি জ্ঞান-রত্ন আহরণে ব্যস্ত। কাজেই বলিতে পারা যায় যে, নব-প্লেতো-পন্থার মধ্যে প্রাচ্য প্রভাব যথেষ্ট ছিল। এই মতবাদ যে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দর্শনের সমন্বয় ফল, তাহা অকুতোভয়ে বলা যায়।

শহরস্তানী লিখিত বিংশতি ফলসফার মধ্যে নিম্নলিখিত চারিজনের নাম ইতিহাসে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। যথাক্রমে, ইহাদিগের নাম:—

(১) অল-কিন্দি, (২) অল-ফ্যারাবী (৩) আবুসিনা ও (৪) ইবনে রোশদ। অল-কিন্দী গণিতবিদ ও জ্যোতির্বিদ হিসাবেই সুবিখ্যাত ছিলেন। তাঁহার সময়ে গ্রীক দর্শনের পুঁথি যেমন দুস্প্রাপ্য ছিল, সংগ্রহ করাও তেমনি কঠিন ছিল। তিনি অনুসন্ধিৎসু ছাত্রের মত যতগুলি পুঁথিসংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন, তাহারই অনুবাদ করেন। ইসলাম-জগতে গ্রীক-জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রচারের জন্য তিনি জীবন উৎসর্গ করেন। অপেক্ষাকৃত পরবর্ত্তী গ্রীক দর্শনের পরিভাষায় 'সংগ্রাহক'-মাত্র হইলেও, অল-কিন্দী পিথাগোরিয় গণিত-বিজ্ঞানকে সকল বিজ্ঞানের ভিত্তি-স্বরূপ মনে করিতেন এবং তিনি নব-প্লেতো-পন্থিগণের ধরণে প্লেতো ও আরিস্তোতলের মতবাদ সম্মিলিত করিবার চেষ্টা করেন। কেবলমাত্র জড় বিজ্ঞানেই যে তিনি গণিত প্রয়োগের পক্ষপাতী ছিলেন তাহা নহে, পরন্তু ভৈষজ্য-বিজ্ঞানেও—অর্থাৎ ভেষজ-সমূহের মিশ্রণ-তত্ত্বেও—উহার প্রয়োগ-সাফল্য স্বীকার করিতেন। উষ্ণতা, শৈত্য, শুষ্কতা ও আর্দ্রতা ভেদে দৈহিক গুণগুলির জ্যামিতির অনুপাতে সংমিশ্রণ, ভেষজ-সমূহে কি ভাবে ফলের তারতম্য ঘটায়, তাহার তিনি বিশদ ব্যাখ্যা করেন; এইজন্য প্রতীচ্য দার্শনিক কারডান, তাঁহার চিহ্নিত বারোজন কুশাগ্র-বুদ্ধি ব্যক্তির মধ্যে অল-কিন্দীকেও অন্যতম বলিয়া ধরিয়াছিলেন।

অল-কিন্দী

প্রধানতঃ জড়বিজ্ঞানবিৎ হইলেও ইনি আত্মা ও মেধার ধর্ম্মও আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মতে এই দৃশ্যমান বিশ্ব-জগৎ কোনো এক বাহ্যতঃ ক্রিয়াশীল কারণের কার্য্য; এই কারণ—শ্রেণী মেধা—ঊর্দ্ধ হইতে বিচিত্রভাবে জগতে সঞ্চারিত হইতেছে। ঈশ্বর ও জড়-জগতের মাঝখানে আত্মার জগৎ বিদ্যমান, আর ঐ আত্মার জগৎই

জ্যোতিষ্কমণ্ডলের স্রষ্টা। মানবাত্মা বিশ্বাত্মা হইতেই উদ্ভূত, এবং যে পরিমাণে ইহা দেহের সহিত সংশ্লিষ্ট সে পরিমাণে ঐ জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর প্রভাবের অধীন। কিন্তু আত্মিক উৎস ও সত্তার দিকে সে স্বাধীন; কারণ একমাত্র জ্ঞানের জগতেই স্বাধীনতা ও অমরতা বিরাজমান।

সে যাহা হউক, মোটের উপর বলিতে পারা যায় যে, অল-কিন্দীই প্রকৃতপক্ষে আরব-দার্শনিক মতবাদের (Arab Scholasticism) প্রকৃত জনক।(১)

অল-ফ্যারাবী দার্শনিক আবু-সিনার আবির্ভাবের পূর্ব্বের দার্শনিক। অল-ফ্যারাবীই প্লেতো ও আরিস্তোতলের দর্শনের সর্ব্বপ্রধান টীকাকার ছিলেন। তিনি টীকা রচনায় এরূপ গভীর পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছিলেন যে, তৎকালে অল্-মওয়ালীন অল্-সানী" (দ্বিতীয় আচার্য্য) অর্থাৎ প্রথম আচার্য্য আরিস্তোতলের উত্তরাধিকারী নামে শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। ন্যায়শাস্ত্রে তিনি আরিস্তোতলের মত অনুসরণ করেন। প্লেতো যেরূপ পরিবর্ত্তনশীল এবং নিত্যবস্তুর পার্থক্য বিচার করেন, অল্-ফ্যারাবীও তদ্রূপ যাহা সম্ভব হইতে পারে এবং যাহার সত্তা আছে, এতদুভয়ের পার্থক্য বিচার করেন। তিনি যে কেবল গ্রীক দর্শনের ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন, তাহা নহে. তাঁহার প্রতিভা মৌলিক গবেষণাতেও নিযুক্ত হইয়াছিল। তিনি মনোবিজ্ঞান ও অধ্যাত্মবিজ্ঞান সম্বন্ধেও কতকগুলি গ্রন্থ রচনা করেন।

অল-ফ্যারাবী

অল-ফ্যারাবী এই মত পোষণ করিতেন যে প্রাচীন দর্শন-রাজির মধ্যে একটি মতৈক্য থাকা আবশ্যক—অন্ততঃ উহার বিশিষ্ট

১। A History of Classical Scholarship. Sandys.

প্রতিভূ-যুগল প্লেতো ও আরিস্তোতলের মধ্যে, পরস্পর বিরোধ অবাঞ্ছনীয়। তাঁহাদের চিন্তাধারা একই সত্যে উপনীত হইবার দুইটি বিভিন্ন প্রকাশভঙ্গী ব্যতীত অন্য কোনোরূপ হওয়া উচিত নহে। এরূপ মত বর্ত্তমানে বিস্ময়কর, এমন কি উদ্ভট মনে হইলেও, প্রাচ্য-দার্শনিকগণের সর্ব্ব-সমন্বয়-প্রবণতাকেই (Syncretism) ইহার কারণ বলা যাইতে পারে। এই মত মূলতঃ প্রাচীনকালের তাবৎ জ্ঞানী-মণ্ডলীকে যেন ত্রিকালজ্ঞ মহাপুরুষরূপেই গণ্য করিতেছে, এবং বলিতে চাহিতেছে যে তাঁহারা সকলেই ধর্ম্মাচার্য্যের মত 'ইমাম' আখ্যায় অভিহিত হইবার যোগ্য ও তাঁহাদের প্রচার্য্য ঈশ্বরেরই আদেশ বাণী, যাহাতে ভ্রম প্রমাদ ও মতদ্বৈতের স্থান নাই।(১)

আবু-সিনা আরিস্তোতলের মতবাদের প্রকৃত প্রচারক ছিলেন। অধ্যাত্মশাস্ত্রের (metaphysics) জন্য তিনি অল-ফ্যারাবীর নিকট ঋণী ছিলেন। দার্শনিক অল-কিন্দী ও অল-ফ্যারাবী আরিস্তোতলের দার্শনিক মতবাদের যে ব্যাখ্যা ও টীকা প্রচার করেন, উহা অস্পষ্ট ও অসুব্যক্ত হওয়ায় সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য হয় নাই। আবু-সিনা উহাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়া উহার অনবদ্য রূপ দান করেন। আবু-সিনার মূল্যবান ব্যাখ্যা অনুসন্ধিৎসু ও জ্ঞান-পিপাসুর জ্ঞানলাভের পথ উন্মুক্ত করিয়া দেয়।

আবু-সিনা

আবু-সিনা ন্যায়শাস্ত্রকে সকল বিজ্ঞানের মধ্যে উচ্চ শ্রেণীর বিজ্ঞান বলিয়া উচ্চাসন দিয়া গিয়াছেন। ন্যায়শাস্ত্রকে তিনি নয় ভাগে বিভক্ত করেন। আরিস্তোতলের আটখানি পুস্তকের সহিত আবু-

১। Encyclo of Islam.

সিনার ন্যায়শাস্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন অংশের সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। আবু-সিনা রহস্যবাদী (mystic) ছিলেন কি না, বলা বড় কঠিন। কেন না তিনি নব-প্লেতো-পন্থিগণের মত রহস্যবাদকে (mysticism) দর্শনশাস্ত্রের অংশ বলিয়া স্বীকার করিতেন। ইবন তুফায়েল বলেন, আবু-সিনার প্রকৃত মূর্ত্তি, তাঁহার "হিকমত-অল-ইসরাক" দর্শন গ্রন্থের মধ্যে পাওয়া যায়। সুরওহ্বার্দ্দি অল-মক্তুল বলেন, এই মতবাদই আবু-সিনার নিজস্ব এবং উহাই নব-প্লেতো-পন্থার নামান্তর।

আবু-সিনার পর ইবনে রোশদ "ফলসফ"-রূপে প্রসিদ্ধিলাভ করেন। ইনিও পূর্ব্ববর্ত্তী দার্শনিকগণের মত মূল গ্রীক অধ্যয়ন করিয়া আরিস্তো-তলের গ্রন্থাবলীর টীকা ভাষ্য ও অনুবাদ প্রচার করেন। এই কার্য্যে ইবনে রোশদের এরূপ কৃতিত্ব পাণ্ডিত্য ও প্রতিভা প্রকাশিত হয় যে, তিনিও অল-ফ্যারাবীর মত তৎকালে কর্ডোভা শহরে "দ্বিতীয় আরিস্তোতল"-রূপে শ্রদ্ধালাভ করেন। উপরোক্ত চারিজন ফলসফার মধ্যে আবু-সিনা ও ইবনে রোশদ মৌলিক চিন্তাশীল (free thinker) ছিলেন। ইসলাম-জগতে দর্শনশাস্ত্র বড় আদৃত ছিল না। দর্শনের ঈশ্বরবাদ কোরানের মতের বিরুদ্ধ, সেই কারণ তৎকালীন ফকিহ (ধর্ম্মতত্ত্ববিদ)-গণের সহিত ইঁহাদিগের দার্শনিক ও মৌলিক চিন্তাবাদের সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল। ইহার ফলে ফকিহ অল-গজ্জালী ইঁহাদিগের মতবাদের বিরুদ্ধে এক গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থ আজিও ইসলাম-জগতে সম্মানিত।

ইবনে রোশদ

আবু-সিনা যেরূপ উচ্চ শ্রেণীর দার্শনিক ছিলেন, তাহাতে তাঁহার সমকক্ষ তৎকালে কেহই ছিল না। চিকিৎসা-বিজ্ঞান-ক্ষেত্রে যেরূপ অপ্রতিদ্বন্দ্বী, দর্শনের ক্ষেত্রেও তদ্রূপ তুলনা-রহিত হইয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠ

দার্শনিক (Prince of philosophers) আখ্যায় অভিহিত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার দল বা সম্প্রদায়ের মধ্যে তাঁহার সমতুল্য দার্শনিকের আবির্ভাব না হইলেও এক্ষেত্রে তাঁহার উপযুক্ত শিষ্য ওমর খৈয়ামের নামোল্লেখ করিতে পারা যায়। খৈয়ামই প্রকৃতপক্ষে মুসলিম সম্প্রদায়ের জ্ঞান-বিজ্ঞান-সাধনার অমৃতময় ফল। ওমর যে যুগে জন্মগ্রহণ করেন, উহা জ্ঞান-বিজ্ঞানের যুগ ছিল। তিনি এই যুগ-সন্ধি-ক্ষেত্রে আবির্ভূত হইয়া তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী মনীষীত্রয়ের এবং প্রাচীন ভারত ও গ্রীক জ্ঞান-বিজ্ঞান-চিন্তাধারার উৎস হইতে প্রেরণা লাভ করিয়া জয়যুক্ত হয়েন। কাজেই বলিতে হয়, ওমর খৈয়াম মুসলিম জ্ঞান-বিজ্ঞান-সাধনার অমৃতময় ফল। ওমর ফলসফা সম্প্রদায়ের পরের যুগের দার্শনিক হইলেও, তিনিই তৎকালে পূর্ব্ববর্ত্তী দার্শনিকগণের মত মূল গ্রীক দর্শন গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া গ্রীক-জ্ঞান-প্রতীক হয়েন। তাঁহার চতুষ্পদীতে গ্রীক মনীষিগণের বাণীর প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়।

দৃষ্টান্তস্বরূপ নিম্নোদ্ধৃত রুবাই-যুগল-উদ্ধৃত হইল—

"যৌবনে মোর আমিও দার্শনিকের যুক্তিটিরে
সমুৎসাহেই বরণ করি' পুযেছিলাম হৃদয়-নীড়ে ;
তর্ক কতই শুনেছিলাম ইহকাল ও পরকালের
হায় রে, সে যে থাকতো পড়েই যে-তিমিরে সেই-তিমিরে।

*

আমার জ্ঞানের বীজগুলিও উপ্ত তাদের যুক্তি নিয়ে,—
অঙ্কুরে তার গজিয়ে তোলা আপন হাতে সলিল দিয়ে,
সারাজীবন পরিশ্রমে ফসল যা' মোর—এই তা' শুধু
স্রোতের মতন এইছি,—যাবো—ঝড়ের মতন সন্‌সনিয়ে।"

'Republic' গ্রন্থের চতুর্থ খণ্ডে, বিশেষভাবে "Phaedo"-তে প্লেটোর সক্রেতিস যেরূপ প্রণালী অনুসরণ করিয়াছেন, এখানেও যেন তাহাই অবিকল অনুসৃত হইয়াছে। "Phaedo"-র একস্থানে সক্রেতিস বলিতেছেন—

"In my youth I had a wonderful desire for the wisdom which people call natural science. It seemed to me a proud thing to know the causes of every matter; how it comes to be; ceases to be; why it is. I lost my sight in this inquiry to the degree of unlearning what I had hitherto seemed to myself and others to know clearly enough."

লোকে যাকে "প্রকৃতি-বিজ্ঞান" (natural science) বলে, তদ্বিষক জ্ঞানলাভের ক্ষুধা যৌবনে আমার খুবই প্রবল ছিল; পদার্থ-সমূহের কারণ-মূল জানিতে পারা আমার বিশেষ গর্ব্বের জিনিষ মনে হইত; কেন ইহারা জন্মে, কেন মরে—কেন এরূপ হয়। কিন্তু এই সকল তথ্যানুসন্ধানের ফলে এমন হইল যে যাহা বেশ জানা আছে বলিয়াই ধারণা ছিল, তাহাও ভুলিয়া বসিলাম।

সক্রেতিস এই সময় এনাক্সাগোরাসের (Anaxagoras) শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন। সুফী দার্শনিকগণের দরবারে ওমরের যে অবস্থা ঘটিয়াছিল বলিয়া রুবাই-যুগলে প্রকাশ, দেখা যাইতেছে যে সক্রেতিসের পক্ষেও অবিকল তাহাই ঘটে। বস্তুতঃ, সিদ্ধান্তের একান্ত অভাবই অধিকাংশ প্লেটো-মতবাদ-মূলক প্রশ্নোত্তরের প্রধান বিশেষত্ব—অপরপক্ষে, সুফীমতবাদেরও এই বিশেষ ধর্ম্মই, ওমরকে উহা আক্রমণ করার বিবিধ সুযোগ প্রদান করিয়াছে। "স্রোতের মত এইছি—যাবো, ঝড়ের মত সন্‌সনিয়ে"—বুঝিবা Heraclitus-এর "Perpetual Flux"-এরই

মর্ম্মানুসারী। "কিছুই চিরস্থায়ী নয়, সমস্তই চির-গতিশীল"—এই স্বীকৃত বিষয়টি বিশেষভাবে Heraclitus-এরই। প্লেটো স্বয়ং তাঁহার 'Divine Dialogues'-এর মূলে এই সুর ধ্বনিত রাখার জন্য Heraclitus-এর নিকট ঋণ স্বীকার করিয়াছেন এবং ওমরের রুবাইগুলিতেও যে এই সুরের প্রভাব বারংবার দেখা দিয়াছে, তাহা সূক্ষ্মদর্শী পাঠকমাত্রেই লক্ষ্য করিবেন।(১)

অন্যত্র ওমর যেখানে বলিতেছেন—

"আছে-কি-নেই বিচার করা দার্শনিকের জ্ঞান-নিকষে,
সারাজীবন ভাসিয়ে চলা বীজগণিতের সূত্র-বশে
ঢের হয়েছে এই জীবনে; সত্য তবু এই কথাটি
মন মজেনি কোথাও তেমন, যেমন রে এই দ্রাক্ষা-রসে।"

সেখানেও তাঁহার কবি-আত্মা আপন বহুমুখী মনীষা-জনিত যশঃপ্রভা ও জ্যোতির্বিদ-খ্যাতিকেই তুচ্ছ করিয়া প্লেটো-মতবাদেরই সুরে সুর মিলাইয়াছে। প্লেটো অন্যত্র বলিয়াছেন—"He indeed is the wisest of all men who, like Socrates, is aware that he is really worth little or nothing in the way of knowledge—তিনিই যথার্থ জ্ঞানিগণাগ্রগণ্য, যিনি সক্রেতিসেরই মতো জানেন যে, জ্ঞান-রাজ্যে তাঁহার অধিকার নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর।"

কেহ কেহ এই রুবাইটিকে এই অর্থে ঈশ্বর-প্রেমিকদিগের প্রতি বিদ্রূপাত্মক বলিয়া বুঝিয়াছেন যে, ওমরের মতে, তাঁহাদিগের তন্ময় অবস্থাটি সুরা-বিভোর অবস্থা অপেক্ষা উন্নততর নহে (২);

১। Introduction. Rubai'yyat of Umar Khayyam by Edward Heron-Allen. London 1908.

২। Mrs. Batson's commentary.

প্রকৃতপক্ষে, তাহা ভ্রান্ত ধারণা। মূল রুবাইটির সরল গদ্যানুবাদ এইরূপ—'অস্তি' ও 'নাস্তি'র ধর্ম্ম আমি জানি, 'উচ্চ' ও 'নীচ'-এর মর্ম্মও আমার অজ্ঞাত নয়, তবু আপন জ্ঞান সম্বন্ধে সবিনয়ে এইটুকু বলিতে চাই যে, ও-সকল-জ্ঞানের মূল্য পানমত্ততা অপেক্ষা বেশী নয়।"

পূর্ব্বপ্রচলিত যাবতীয় মতবাদকে গল্পকথা বলিয়া উড়াইয়া দিবার জন্য, 'স্বাধীন-চিন্তা'র পক্ষ-সমর্থক ওমর বলিয়াছেন—

ভক্তজনের কথামৃত, ঋষি-গণের আপ্ত-বাণী,
অকাট্য সব সত্য বলে আমরা যা আজ নিচ্ছি মানি—
গল্প সবই ; ঘুমের ফাঁকে সঙ্গীজনে বানিয়ে বলে
ঘুমের কোলে পড়তে চলে, গেছেন চলে যতেক জ্ঞানী।"

প্লেতোর সক্রেতিসের উক্তি—"Just now, as in a dream, these opinions have been stirred up within him.—এই সকল মতামত, যেন ঘুমের মাঝখানে স্বপ্নের মতন, তাঁহার মধ্যে জাগিয়া উঠিল"—এই রুবাইটির প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য। প্লেতো তাঁহার "Republic" গ্রন্থে "অলীক-দার্শনিকগণের" (Pseudo-Philosophers) অবিশ্বাস-যোগ্য উক্তি ও কলুষপ্রবণতাকে কশাঘাত করিয়া অন্যত্র বলিয়াছেন—"We find that though they may dream about real existence, they cannot behold it in a waking state, so long as they use hypotheses which they leave unexamined, and of which they can give no account—যদিও বা "সত্য-অবস্থা" সম্বন্ধে স্বপ্ন দেখা ইঁহাদের স্বভাব, তথাপি সজ্ঞানে ঐ অবস্থা দেখিতে পাওয়া তাঁহাদের পক্ষে অসম্ভব ; কারণ তাঁহাদের তর্কপ্রণালীতে যে সমস্ত অনুমিতি ব্যবহৃত, তাহা একদিকে যেমন অপরীক্ষিত এবং অপর দিকে তেমনি অযৌক্তিক।"

দশম পরিচ্ছেদ

দার্শনিক ওমর খৈয়াম

বিষয়-নিচয়ের প্রণালীবদ্ধ ও যুক্তি-শাসিত জ্ঞানই দর্শনশাস্ত্রের উপাদান। যখন আমরা এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের তাবৎ বস্তু নিরীক্ষণ করি, তখন স্বভাবতঃই মনে প্রশ্ন জাগে—ইহারা কি, কেমন করিয়া আসিয়াছে, কোন্ প্রণালী অনুসারে ইহাদিগের ভিন্ন ভিন্ন আকার সম্ভব হইয়াছে? ইহাদিগের স্রষ্টা কে? কোন্ উপাদানে ইহারা গঠিত? ইহাদের প্রকৃতি কিরূপ? ইহারা বিচ্ছিন্ন না পরস্পর সম্বদ্ধ? ইহাদের বিশেষ বিশেষ রূপে বিকাশ আকস্মিক—না তন্মধ্যে কোনো শৃঙ্খলা বিরাজমান? যদি শৃঙ্খলা থাকে তবে উহার হেতু কি, প্রকারই বা কিরূপ? এই সকল প্রশ্নের উত্তরের জন্যই দর্শনশাস্ত্র দায়ী।

অজ্ঞতার দার্শনিক তত্ত্ব

এখন কথা এই যে, বিষয়-নিচয়ের স্বরূপ ও যথার্থ প্রকৃতি সম্বন্ধে নিশ্চিত জ্ঞান সম্ভব কি না? সাধারণতঃ দার্শনিকেরা বলেন যে, উহা সম্ভব। কিন্তু এমন খ্যাতনামা দার্শনিকও আছেন, যাঁহাদের মতে বস্তু-মাত্রেরই স্বরূপ জ্ঞাত হওয়া অসম্ভব। হার্ব্বার্ট স্পেনসার (Herbert Spencer) বলেন—"আমাদের চেতনাশক্তির যেমন একটি নির্দ্দিষ্ট দিক্ আছে, তেমনি একটি অনির্দ্দিষ্ট দিকও আছে; আর ঐ অনির্দ্দিষ্ট দিকের কোনো সংজ্ঞা নির্দ্ধারণ চলে না।"(১) ইহা হইতে আমরা বুঝি যে, এমন বস্তু আছে যাহার প্রকৃতি মানব-জ্ঞানের অধিগম্য; আবার এমনও বস্তুও আছে যাহার স্বরূপ জ্ঞানাতীত—অর্থাৎ এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যে শক্তির অভিব্যক্তি

১। Intuitions of the Mind.

তাহা সম্পূর্ণরূপেই অবিশ্লেষ্য। প্রসিদ্ধ জার্ম্মাণ-দার্শনিক শোপেনহায়ারের (Schopenhauer) মতে বিষয়-নিচয়ের স্বরূপজ্ঞান একপ্রকার অসম্ভব বললেই হয়—আর ওমর খৈয়ামেরও দার্শনিক মতামত এই শ্রেণীর।

বস্তুতঃ, আমাদের জানা জিনিসও বুঝিবা আমরা ঠিক জানি না। দৃষ্টান্তস্বরূপ, একটি 'আতা'কে পরীক্ষা করা যাক :—

আমাদের বিশ্বাস, জিনিসটি আমাদের সুপরিচিত; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহার কতটুকুই বা আমরা জানি? শুধু এইটুকু আমাদের জানা আছে যে, আতার একটি নির্দিষ্ট আকার, গন্ধ, বর্ণ ও স্বাদ বিদ্যমান। এগুলি অবশ্য গুণাবলী মাত্র, এবং দর্শনশাস্ত্রোক্ত জ্ঞানের 'ব্যাপ্তি'-পর্য্যায়ভুক্ত; ইহাদের কোনটিই আতার শরীর হইতে পৃথকভাবে দণ্ডায়মান বিশেষ বস্তু নহে। আতা বলিতে আমরা যাহা বুঝি, তাহা এইসকল গুণাবলীর একত্র সমাবেশ মাত্র। অপরপক্ষে, আতার স্বরূপ-নির্দ্ধারণে আমরা অসমর্থ।

যখন আমরা বস্তু-বিচারে প্রবৃত্ত হই, তখন কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধীয় তথ্যের প্রয়োগ করি—কিন্তু বিচার যতই অগ্রসর হইতে থাকে, ততই উহার উপর আস্থা কমিতে থাকে, এবং অবশেষে দেখি যে কারণ-সম্বন্ধে কিছুই জানিতে পারা যায় নাই। উপর হইতে সকল বস্তুই মাটিতে পড়ে; গ্রীক দার্শনিকগণ মনে করিতেন যে, এই ঘটনা কেন্দ্রানুগ শক্তিরই ফল, এবং মাটিই ঐ সকল বস্তুর কেন্দ্র। নিউটন আবিষ্কার করেন যে উক্ত ধারণা ভুল, এবং দেখান যে প্রত্যেক জড়দেহেরই আকর্ষণ শক্তি আছে এবং পৃথিবী বিরাট কলেবর হওয়াতেই ক্ষুদ্রতর বস্তুসমূহকে আকৃষ্ট করে। কিন্তু এই মাধ্যাকর্ষণের অস্তিত্ব ছাড়া অপর কিছুই আমরা জানি না। বস্তুমাত্রেই কেন এই আকর্ষণ-শক্তি বিদ্যমান? এ প্রশ্ন আজও অমীমাংসিতই থাকিয়া গিয়াছে; একটি রহস্য উদ্ঘাটন করিবামাত্র

আমরা অপর একটি রহস্যের সম্মুখীন হই—একটি গ্রন্থি খুলিতেই দেখি অপর একটি গ্রন্থি আমাদের অপেক্ষায় রহিয়াছে। সত্যের রহস্য-উদ্ঘাটন দার্শনিকের অসাধ্য, কেননা যে রহস্যের মীমাংসায় সে প্রবৃত্ত হয়, সেইটিই শেষে অন্য এক রহস্য হইয়া দাঁড়ায়।

বহু দূরদর্শী দার্শনিকগণ অবশেষে স্বীকার করিয়াছেন যে তাঁহাদের যৎসামান্য জ্ঞানই—যাহাকে অজ্ঞতারই নামান্তর বলা চলে—যাবতীয় প্রকৃত দার্শনিকতার মূলসূত্র। সক্রেতিস তাঁহার জীবনব্যাপী অভিজ্ঞতার পর স্বীকার করিতে বাধ্য হন যে, 'এইটুকু মাত্রই তিনি জানিয়াছেন যে কিছুই তিনি জানিতে পারেন নাই।' অপর কথায়, আংশিক জ্ঞান ও সামগ্রিক অজ্ঞতাই এই স্বীকারোক্তির তাৎপর্য্য। ওমর খৈয়ামও ঐ 'চরম অজ্ঞতা স্বীকার করিয়াছেন এবং আপন প্রচার্য্যরূপে গ্রহণ করিয়াছেন :—

"দেখনু সে এক রুদ্ধ দুয়ার, গেল না তা'র চাবিই পাওয়া ;
দুলছে কি এক কুহেলী-জাল ভিতরে যা'র যায় না চাওয়া ;
মুহূর্ত্তকাল তোমায় আমায় একটি দু'টি ক্ষণিক কথা—
তাহার পরে—'তুমি'—'আমি' নিরুদ্দেশেই তলিয়া যাওয়া।"

চাবি পাওয়ার অর্থ, অবশ্যই অজ্ঞাত রহস্যের আবরণ মোচন। এই আবরণ মুক্ত হইলে মানুষের পক্ষে সেই গুহাতীত সত্যের জ্ঞানলাভ সম্ভবপর—যাহা অনাদি অনন্ত। ইহার ফল এই হইবে যে জ্ঞানী বিস্ময়-বিমূঢ়, বাহ্যজ্ঞানশূন্য, বিবেক বুদ্ধিহারা ও মৌন হইয়া মানবত্ব হইতে সম্পূর্ণ অন্যরূপ না হইয়া পারিবে না। এইজন্যই—"ভগবান মুসাকে বলিলেন, যাও, মানুষকে সাবধান কর, অন্যথা তাহারা আবরণের ভিতর দিয়া ভগবানের পানে চাহিবে, ফলে অনেকেই ধ্বংস হইবে।"(১)

১। Exodus xix. 21

"উভয় দলেই,—চরম জ্ঞানে যাহারা এই বর্ত্তমানে
কিম্বা যারা তাকিয়ে আছে ভবিষ্যতের মুখের পানে—
অন্ধকারের অসীম হ'তে কণ্ঠ সে এক বলছে ডাকি,
'মূর্খ'! তোমাদের পারিতোষিক নেই ও দু'য়ের কোনোখানে।"

এখানে ওমরের দার্শনিক-আত্মা বলিতে চাহিয়াছে যে, মৃত্যুর পরপারে কোন্ ভাগ্য আমাদের প্রতীক্ষায় আছে তাহা কেহই নিশ্চয় করিয়া জানিতে পারে নাই। যে কেহ ইহজগৎ ছাড়িয়া অন্যতর লোকে যায়, সে আর লোকান্তরের সংবাদ লইয়া ফেরে না। অপর কথায়, লোকান্তর সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানের অসম্ভাব্যতাই এখানে ওমরের প্রচার্য্য। মৃত্যুর পরপারের জীবন বা গরিমাময় অবস্থার উল্লেখ করিয়া যাঁহারা নিশ্চয়াত্মিক বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, ওমরের উক্তিকে তাঁহাদের প্রচার্যের বিরুদ্ধবাদ হিসাবে গ্রহণ করা চলিতে পারে।

বর্ণ আমার, গন্ধ আমার, মন-ভোলানো,—নিলাম মানি',
লতার মতন তনুর গঠন, ফুলের মতন আননখানি;
শিল্পী তবু কিসের লাগি' এই ভুবনের প্রমোদ-বনে
সৃজন মোরে করেছিলেন—এই কথাটি নাহি জানি।"

দেখা যাইতেছে, ওমরের দার্শনিক-দৃষ্টি কারণ-নির্ণয়ে অসমর্থ হইয়াছে। আমাদের চারিদিকে অসামান্য রূপরাশি, অনবদ্য গঠন-সৌকুমার্য্য,—কিন্তু তাহা চিরস্থায়ী নয়, বিবর্ণ ও মরণগ্রস্ত হইবার জন্য। এ হেন পরিণাম লাভার্থ এত সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করায় স্রষ্টার কোন্ অভিপ্রায় সাধিত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে বহু চিন্তার ফলে ওমর এইমাত্র সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, একমাত্র স্রষ্টা ব্যতীত অপর কেহ সৃষ্টির তাৎপর্য্য নির্দ্ধারণে অক্ষম।

মানুষ ভাবে যে, জীবনের রহস্য সম্বন্ধে তাহার অভিজ্ঞতা খুবই বিশদ,

অথবা মৃত্যু সম্বন্ধে তাহার জ্ঞান ও সৃষ্টির মধ্যে উহার স্থান প্রদানে ভগবানের উদ্দেশ্য খুবই স্পষ্ট। খৈয়াম আমাদের সাবধান করিয়া দিয়া বলিতে চান যে, আমরা যাহাকে জীবনের অভিজ্ঞতা মনে করি, তাহা প্রকৃতপক্ষে কুবিচার-দুষ্ট গণনা ও স্বকপোল-কল্পিত সিদ্ধান্তের ফলে উৎপন্ন কতকগুলি ভ্রান্তির সমষ্টিমাত্র। আপনাদিগকে চিন্তাশক্তি ও বিচারশক্তির অধিকারী এবং স্বাধীনেচ্ছাশক্তিসম্পন্ন মনে করা সত্ত্বেও, এই জীবনের যথার্থ প্রকৃতি সম্বন্ধে একদিকে যেমন আমরা অজ্ঞ, অপরদিকে সেইরূপ পারলৌকিক জীবন সম্বন্ধেও জ্ঞানহীন। এ সকল বিষয়ে জোর করিয়া কিছু বলা আত্মপ্রতারণারই নামান্তর; কারণ, জীবন যে কি, তাহা জগৎ সৃষ্ট হওয়া অবধি আজ পর্যান্ত কেহই নির্ণয় করিতে পারে নাই। ঘটনা যখন এই, তখন মৃত্যু-রহস্য-সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ যে আরও শোচনীয়, তাহা বলাই বাহুল্য। এইজন্যই বুঝিবা পরমজ্ঞানী সক্রেতিস মৃত্যু-মুহূর্ত্তে বলিয়াছিলেন—'বিদায় নেবার দিন ঘনিয়ে এসেছে; আমি চলেছি মরণের পথে আর তুমি জীবনের; কিন্তু এতদুভয়ের কে যে উন্নততর অবস্থার দিকে যাচ্ছে তা' এক ভগবান ছাড়া অন্য কেহই বলতে পারে না।'(১)

তবে কি সক্রেতিসের মতে 'অজ্ঞতা'-রত্নই সকল অন্বেষণের চরম পুরস্কার ও পরম জ্ঞান? অপরপক্ষে, ওমর-দর্শনের প্রতিপাদ্যও কি তবে ঐ অজ্ঞতা-পরিণামাত্মক? এ সিদ্ধান্তের অর্থ কি তবে এই যে, নির্ব্বোধ ও অজ্ঞ লোকেরাই যথার্থ দার্শনিক পদবাচ্য?

অবশ্যই নয়। সক্রেতিসকে যখন লোকে বলিল যে তিনিও যেমন কিছুই জানেন না তাহারাও তেমনি কিছুই জানে না; অতএব তাঁহার

১। Moral Philosophy. Calderwood.

ও ঐ সকল লোকের মধ্যে কোনো সুস্পষ্ট ও সুবোধ্য প্রভেদ নাই। "এইটুকু মাত্র প্রভেদ"—উত্তরে তিনি বলিলেন—"যে 'কিছুই জানি না' ইহা আমার জ্ঞাত, কিন্তু 'কিছুই যে জান না' এ সত্যও তোমারা অবগত নও।"

জ্ঞান দ্বিবিধ—অন্ধ ও যুক্তি-প্রতিষ্ঠা। একজন অজ্ঞ ব্যক্তি, ঠিক দার্শনিকেরই অনুরূপ, সূর্য্য চন্দ্র ও জাগতিক অন্যান্য পদার্থের পার্থক্য বুঝিতে পারে—কিন্তু সে বিষয়সমূহকে জানে অন্ধভাবে, অপরপক্ষে দার্শনিক জানেন যুক্তির আলোকে ও ধারাবাহিকভাবে। একজন কৃষক ভূমিজাত শস্য-ফসলাদিকে চেনে, এবং একজন কৃষি-বিজ্ঞানবিদও তাহা চেনেন; কিন্তু এই উভয়ের জানার মধ্যে ব্যবধান স্পষ্ট ও প্রচুর। 'অজ্ঞতা'র জ্ঞান সম্বন্ধেও ঠিক এইরূপ। দার্শনিকের চিত্তমুকুরে ঐশীরহস্য যেমন স্পষ্টতঃ অনধিগম্য, অজ্ঞ ব্যক্তির নিকটেও সেইরূপ; কিন্তু এতদুভয়ের মধ্যে বুদ্ধি-বিশ্লেষ্য প্রভেদ প্রচুর।

খৈয়াম তাঁহার অজ্ঞতাকে গর্ব্বেরই বিষয় মনে করেন, অথচ উচ্চ-কণ্ঠে জানান যে, অজ্ঞতার এই পরম-অভিপ্রেত-স্তর সকলের পক্ষে সুলভ নহে।

"সংজ্ঞাহীন তুমি সত্য—নহে তবু হেন সংজ্ঞা হায়।
যাহারাই সংজ্ঞাহীন এ অবস্থা নাহি পায় তারা।"

কিন্তু দার্শনিক-নির্দ্দিষ্ট এই 'অজ্ঞতার, সত্য-মিথ্যা যাচাই করা আমাদের অভিপ্রেত নয়; তথাপি উহার ফলাফল লক্ষ্য করার লাভ আছে। এই অজ্ঞতা-গর্ভ দার্শনিকতাই যাবতীয় গবেষণা, অন্বেষণ অনুসন্ধিৎসা ও আবিষ্কারের উৎস ও শক্তি-কেন্দ্র। যদি আমাদের পদার্থ-বিদ্যাকে চরম বলিয়া ধরিয়া লই, অথবা যদি মনে করি যে আমরা যাহা জানিয়াছি তাহাই সম্পূর্ণ ও সংশয়লেশহীন, তাহা হইলে ভবিষ্যতের

জন্য অনুসন্ধান বা গবেষণার প্রয়োজন একেবারেই থামিয়া যায়। কার্য্যতঃ, অজ্ঞতার দর্শনই আমাদের ধ্রুবতারা এবং এই অজ্ঞতা সম্বন্ধীয় চৈতন্য আমাদিগকে বিবর্ত্তনের পথে অগ্রসর হইতে উৎসাহিত করে। খৈয়াম একদিকে আমাদিগকে যেমন এই 'অজ্ঞতার' দর্শনে দীক্ষিত করেন, অপর দিকে তেমনি নূতন আলোক ও নূতন চিন্তার রাজ্য আবিষ্কারেও পরিচালিত করিতে চান। তাঁহার কথা :—

"মত্ত হলে নারীর তৃষ্ণায় কিম্বা বিলাস অন্বেষণে,
ফিরতে হবে ভরা ডুবি,—এই কথাটি রেখো মনে ;
'কে তুমি' ? তা' বুঝিতে শেখো ; এলে হেথায় কোত্থেকে সে
'কর্‌ছো বা কি ?' 'যাবে কোথায় ?' ভেবো বসে ক্ষণে ক্ষণে।"

সূতিকাগার হইতে সমাধি-মন্দির পর্য্যন্ত প্রসারিত মানব-জীবনের অপরিহার্য্য অংশটুকু যে কয়টি মহা সমস্যার সহিত বিশেষভাবে জড়িত, সেইগুলি তিনি সর্ব্বাগ্রেই সর্ব্বসমক্ষে তুলিয়া ধরিয়াছেন—কেন না ইহারই মীমাংসার চেষ্টায় বিচিত্র পথের সৃষ্টি সম্ভবপর।

অদৃষ্ট ও পুরুষকার

অদৃষ্টবাদ উদ্‌যোগী পুরুষসিংহেরা গ্রাহ্য করিতে পারেন না। তাঁহাদের মত উহা কুসংস্কার, এমন কি পরিত্যাজ্য—কারণ, স্পষ্টতঃ চেষ্টা করিয়া তাঁহারা যে কাজ করিয়াছেন তাহা যথার্থই স্বাধীন চেষ্টার ফল নয়, পরন্তু যে সকল অদৃশ্য কারণের উপর তাঁহাদিগের কোনো হাত নাই তাহাদেরই যোগাযোগে নিষ্পন্ন হওয়া সম্ভব হইয়াছে, এরূপ মনে করায় যেন আপনাকেই ফাঁকি দেওয়া হয়। "চেষ্টা থাকিলেই উপায় হবে" "ন হি সুপ্তস্য সিংহস্য প্রবিশন্তি মুখে মৃগাঃ" প্রভৃতি বাণীই এই পুরুষকার-বাদীর যুদ্ধাস্ত্র। অপর পক্ষ বলেন—কোনো একটি ঘটনা যখন ঘটে, তখন বিশ্ব-বিধানে এমন সমস্ত অবস্থার স্বতঃই সৃষ্টি হয়, যাহাতে ঐ

ঘটনাটি ঘটাইবার উপযোগী কারণসমূহ দেখা দেয়। বস্তুতঃ মানুষ অসহায় এবং কোনো কাজ করার পক্ষে তাহার ইচ্ছাশক্তির মূল্য এই সকল কারণের সম্পর্কে নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। ইহাদের মতে, 'ইচ্ছামৃত্যু' ব্যক্তির মৃত্যু-ইচ্ছার উদ্রেকটুকু পর্য্যন্ত তথাকথিত কারণ ও অবস্থার অধীন।

এই অদৃষ্টবাদীদিগের একটি বিশিষ্টতা লক্ষ্যস্থানীয়। অন্যায় কার্য্য করিলে শাস্তি পাইবার সম্ভবনা বিষয়ে তাহারা সচেতন, সুতরাং সন্ত্রস্ত। এই শাস্তির ভয় অল্পাধিক পরিমাণে উভয়পক্ষেই থাকিতে পারে—তবে প্রভেদ এই যে, পুরুষকারবাদীরা তাহাদের কৃত অন্যায় সজ্ঞানে মানিয়া লইয়া যথাবিহিত শাস্তি গ্রহণ করিতেই প্রস্তুত হয়; অপরপক্ষে, অদৃষ্টবাদীরা এই বিশ্বাসকে আশ্রয় করিয়া সান্ত্বনা লাভ করে যে, যাহা ঘটা অবশ্যম্ভাবী তাহাই ঘটিতেছে বা ঘটে। পুরুষকার-পন্থীরা যেন বা গ্যেটরই (Goethe) ভাবোদ্দীপনী মন্ত্রস্পৃষ্ট; আর অদৃষ্টবাদীরা দিমোক্রাইতাস (Democritus), এপিকিউরাস; (Epicurus) ওমর খৈয়াম ও অস্কার ওয়াইল্ডেরই (Oscar Wilde) স্বগোত্রীয় লুক্রেসিয়াসের (Lucretius) প্রকৃতিবাদপন্থী।

মানুষ যখন প্রাকৃতিক শক্তিসমূহ ও জাগতিক ঘটনা-পরম্পরায় বিষয় গভীরভাবে চিন্তা করিতে বসে এবং মনন-শক্তির সাহায্যে বস্তুর যথার্থ প্রকৃতিটি খুঁজিতে চেষ্টা করে,—তখন স্বভাবতঃই সে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, এই বিরাট বিশ্বশক্তির, অপরকথায় ভগবৎ-বিধানের, সান্নিধ্যে সে একান্তই অসহায়। এই শক্তিসমূহের ক্রিয়ার বিরুদ্ধাচরণ যেমন তাহার সাধ্যাতীত, সেইরূপ আপন জীবনধারণের জন্য সাধারণতঃ যাহা আবশ্যক তাহাও পরিবর্জ্জনে সে অসমর্থ। একজন নিয়ামক যে আছেন তৎসম্বন্ধে এই দৃশ্যমান বিশ্বই তাহার নিকট এক জীবন্ত দৃষ্টান্ত।

এই ধারণা ও আনুষঙ্গিক অন্যান্য চিন্তা, সুস্পষ্ট সত্যের আভাস-প্রদানে, যখন তাহার আত্মশক্তিবোধকে অবসন্ন করিয়া ফেলে, তখন সে বিশ্বাস করিতে বাধ্য হয় যে, মানুষের প্রচেষ্টা, মানুষের শক্তি ও প্রাপ্তির সীমা আছে,—পরন্তু বিশ্বজগতের যাহা-কিছু, সমস্তই এক "সকল ঈশ্বরের পরম ঈশ্বর" কর্তৃক শাসিত। ওমর খৈয়ামের পক্ষেও এই অবস্থাই ঘটিয়াছিল, এবং সমস্তকেই ঐ অনাদি-অনন্ত-পরমাশ্চর্য্য-ঐশীশক্তিতে আরোপ করিয়া তিনি মানুষকে তাঁহারই সৃষ্টির মধ্যে এক শাসন বিনম্র অসহায় প্রাণিরূপে দেখিয়াছিলেন।

পুরুষকার-পন্থীরা বলিবেন যে ভগবান তাঁহাদিগকে কোনো কার্য্য করা না-করা সম্বন্ধে প্রভূত শক্তির অধিকারী করিয়াছেন, অতএব সে আপন ইচ্ছানুযায়ী অনুষ্ঠান করিবার বিষয়ে সর্ব্বতোভাবে স্বাধীন। কিন্তু এখানে প্রায়ই একটি মারাত্মক ভুল ঘটে। মানুষ যে কাজ করিতেছে বা করিতে পারে বলিয়া মনে হয়, তাহার উপর প্রকৃতপক্ষে মানুষের কোনো হাত নাই। এমন অবস্থার সৃষ্টি হইতে পারে, যাহাতে ইচ্ছা বা শক্তিসত্ত্বেও সে অভীপ্সিত কর্ম্ম করিতে পারে না,—সুতরাং পরিণামে সম্পূর্ণভাবই অদৃষ্টনির্ভরশীল হইয়া পড়ে। এখানে অবশ্য স্মরণ রাখা দরকার যে, ঐরূপ সংঘটন মানুষকে তাহার করণীয় বা দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি দেয় না। এ সমস্যার সরল নিরাকরণ এই—"কর্ত্তব্য করিয়া যাও—ফলাফল ঈশ্বরেই অর্পিত থাক।"

ওমর খৈয়াম অদৃষ্টবাদী হইলেও, ইচ্ছাশক্তির অনুশীলন-সম্বন্ধে বারবার আমাদিগকে সতর্ক করিয়াছেন, দুঃখের জগতে যতদূর সম্ভব সুখের সৃজন করিবার জন্য উৎসাহিত করিয়াছেন, এবং যথাশক্তি পানাহার-প্রফুল্ল থাকিবার জন্য অনুরোধও জানাইয়াছেন। কিন্তু এই বিশ্বব্যাপারের অপেক্ষাকৃত প্রশস্ততর অর্থ ও অধিকতর ব্যাপক

দৃশ্যপটের সম্মুখীন হইবামাত্র তিনি "শোচনীয় বিষয় পরিকল্পনা" ও "মজাদার ছায়াবাজী"র মধ্যেই ফিরিয়া দাঁড়াইয়াছেন। এই ছায়াবাজী চলিয়াছে—"তপন শিখার কেন্দ্রে ধরি" এবং "আমরা তারি রঙীন ছবি, আসা-যাওয়ায় ঘুরছি সদাই।"

নৈসর্গিক শক্তিরাজির লীলানৃত্যের সম্মুখে মানুষের অসহায় অবস্থার প্রত্যক্ষ সত্যটি যখন আমরা ধীরভাবে গ্রহণ করি, তখন ওমর খৈয়ামের পরমার্থিক দুঃখবাদ আমাদের অন্তরে সুগভীর রেখাপাত করে, এবং প্রাণের তার সমস্বরে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠে। এই নিষ্ঠুর সত্যের প্রবল প্রচারে, বা সবল পরিচয়-গ্রহণে, ওমর খৈয়ামই অবশ্য প্রথম বা শেষ প্রচারক নহেন। জ্ঞানী সলোমনও একদিন নিষ্পেষিত বিশ্বমানবের ক্রন্দন ধ্বনিত করিতে গিয়া বলিয়াছিলেন— "সৌরজগতে যে-সকল কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয় তাহার সবই দেখিলাম; জানিও এ সমস্তই অনর্থক আত্মম্ভরিতা ও যন্ত্রণাময়।" প্লেটো বড় দুঃখেই বলেন 'মৃত্যু যদি স্বপ্নহীন নিদ্রা হয়, তবে তাহাকে এক পরমাশ্চর্য্য মহালাভই বলিতে হইবে। 'জব'ও ওমরেরই মত মনে করিতেন যে পৃথিবীতে আমাদের গোণা দিনগুলি ছায়াবৎ।

সেক্সপিয়রও গাহিয়াছেন—

'জীবন তো কলচ্ছায়া শুধু—দীন অভিনেতা,
লম্ফঝম্ফ, গলাবাজি ক্ষণমাত্র রঙ্গমঞ্চ'পরে,
তারপর, নাহি সাড়া আর। এ এক কাহিনী,
মূর্খ যার রচয়িতা; আছে শব্দ, আস্ফালন
শূন্যগর্ভ অর্থ কিছু নাই'—(১)

এমন কি, দার্শনিক কান্টের নিকটও 'জীবন' ছিল—'কষ্টের বিরুদ্ধে

১। ম্যাকবেথ।

অবিশ্রাম লড়াই—একটা অশুভক্ষণ যাহার কাছে অধিকাংশ জীবই হার মানে এবং শ্রেষ্ঠতমেরা সুখী হয় না'; শোপেনহায়ার দৈনন্দিন জীবনের বিরুদ্ধে এতই খড়্গহস্ত হইয়াছিলেন যে, দীর্ঘনিশ্বাসের সহিত সেই লক্ষ্যগুণে-শ্রেয় দিনটির প্রতীক্ষা করিতেন,—যেদিন এই নিরর্থক, একঘেয়ে আনন্দ-বেদনার হাত এড়াইয়া, চিরশান্তিময়, নির্ব্বাণের কোলে আশ্রয় লাভ করিবেন।

খৈয়াম যখন সুপণ্ডিত মুসলমান, তখন অদৃষ্ট ও পুরুষকার-ঘটিত জটিল তথ্যের ব্যাপারে তাঁহাকে কোরান প্রচারিত ধর্ম্মের দিক হইতেই বিচার করা দরকার। মুসমানদিগের ধর্ম্মবিশ্বাস এই যে, জগতে যাহা কিছু ঘটিয়াছে, ঘটে বা ঘটিবে, সে সমস্তই ঈশ্বরের আজ্ঞায়। জীবনে মানুষ যে অবস্থা লাভ করে, তাহা জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্ব হইতেই ভগবান কর্ত্তৃক বিহিত। তাহাদিগের আরও বিশ্বাস, ঐ ভগবৎ-বিধির বিধান-অনুসারে কোনো নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তি নরকে ও কোন নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তি স্বর্গে গমন করিবে। এই বিশ্বাসবশেই ওমর লিখিয়াছেন :—

"হে ভগবান, তুমি আমাকে কর্দ্দম হইতে গড়িয়া তুলিয়াছ; তোমার করুণা ও প্রেমে অভিষিক্ত করিয়া আমাকে পরম সম্মানিত করিয়াছ; ইহার পর, আমার অপরাধগুলিকে আর বড় করিয়া দেখিয়া শাস্তিবিধান করিও না; আমাতে যেরূপ বীজ তুমি রোপন করিয়াছিলে, আমি অবিকল তাহারই ফল।"

এইরূপ বিশ্বাস-হেতুই জাগতিক ব্যাপারে মুসলমানেরা পিছাইয়া পড়িয়াছে, এবং তাহাদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র-পরিকীর্ত্তিত কর্ত্তব্যকার্য্যও অবহেলা করিতে শিক্ষা করিয়াছে। অদৃষ্ট ও ইচ্ছাশক্তিকে দুটি পরস্পর-বিরুদ্ধ পথ হিসাবেই তাহারা গণ্য করিয়াছিল। মানি, অতি তুচ্ছ ঘটনাটির সংঘটনও যে বিধাতার বিধিসাপেক্ষ, এরূপ মনে করা মুসলমানের পক্ষে

অপরিহার্য্য। এ সত্যও সমান স্বীকার্য্য যে ভগবৎ-প্রজ্ঞার আলোকে অনাদি ভবিষ্যতের ঘটনা-বীজটুকু পর্য্যন্ত সমান আলোকিত—তথাপি ইহা হইতে এমন মনে করা চলে না যে, আমাদের কৃতকর্ম্মের শাস্তি বা পুরস্কার সম্বন্ধে অগত্যা আমরা সম্পূর্ণ দায়শূন্য। অদৃষ্টবাদকে এই জাতীয় অর্থে গ্রহণ করার অপেক্ষা অধিকতর ভ্রান্তি আর নাই। প্রকৃতপক্ষে, মানুষ যাহা খুশী তাহাই করিতে যেমন অধিকারী নয়—সেইরূপ আবার এতখানি নিষেধ-নিরুদ্ধ গতিও নয়—যাহাতে সে আপনাপন কর্ত্তব্য-সম্পাদনে বা কার্য্যের অনুরূপ ফললাভে অক্ষম। "সমস্তই ভগবৎ বিহিত"—এ উক্তির তাৎপর্য্য এই যে সমস্তই নৈসর্গিক নিয়মের অধীন, আর ভগবানই ঐ নিয়মাবলীর নিয়ন্তা। ইস্‌লামীয় শিক্ষার সংক্ষিপ্তসার এই—"তুমি কোথাও ঐশী নিয়মের ব্যতিক্রম দেখিতে পাইবে না। আধুনিক বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়াও এই উক্তির সত্যতা প্রতিপন্ন করিতেছে। 'সমস্তই বিধাতৃ নিয়ন্ত্রিত'—এ কথায় অবশ্যই এমন বুঝায় না যে, তিনি ইচ্ছাপূর্ব্বক আমাদের স্কন্ধে এমন বোঝা চাপাইয়াছেন যাহা বহনে আমরা অক্ষম। আমাদিগকে কি করিতে হইবে তাহা অবশ্যই তিনি জানেন—কিন্তু তাই বলিয়া, এমন বিধান তিনি করেন নাই যে আমাদিগকে উহা করিতেই হইবে। তাঁহার কথা—"বিশ্বাসী ও অকৃতজ্ঞ হইবার স্বাধীনতা সকলেই সমান"—। বিশেষতঃ, সদসদকর্ম্ম ব্যাখ্যায় কোরান স্পষ্টতঃই বলিয়াছে—"তোমার পক্ষে যাহা কিছু ভাল, তাহা ভগবান হইতেই আসে; যাহা কিছু মন্দ তোমাকে পীড়িত করে তাহা তোমার কলুষিত বাসনারই ফল।" ফলকথা, কোন্ পথে চলা উচিত তাহা জানিলেও, ভগবান আমদিগকে কোনো বিশেষ পথে চলিতে বাধ্য করেন না; বিবেক ও সৎ-অসৎ-বিচারশক্তির অধিকারী করিয়া তিনি আমাদিগকে কর্ম্ম-সম্বন্ধে সম্পূর্ণ স্বাধীনতাই দিয়াছেন।

এক্ষণে, ধর্ম্ম ও অদৃষ্টবাদ সম্বন্ধে এমন কথা উঠিতে পারে, যে অদৃষ্টবাদ'কে ধর্ম্মের অঙ্গীভূত করা নিতান্তই অসঙ্গত হইয়াছে; যেহেতু উহা অত্যন্ত জটিল এবং নানারূপ ভ্রমপ্রমাদের উৎস। এ কথার উত্তর এই যে মানুষ অদৃষ্টে বিশ্বাস পরিহার করিতে পারে না। উহা পরিহার করার প্রধান ও প্রবল বাধা এই যে, সেক্ষেত্রে মানুষ নিজেকেই চরম কর্ম্মী বলিয়া ধরিয়া লইতে শিখিবে এবং ভগবানের অস্তিত্বকে নিতান্তই একটা কল্পনার সৃষ্টি মনে করিবে। তাহা ছাড়া, একমাত্র অদৃষ্টবাদই আমাদের জীবনে শক্তির ও সান্ত্বনার যোগান দিয়া থাকে এবং জীবনের প্রতি পদক্ষেপেই স্মরণ করায় যে সমস্ত ব্যাপারেরই একজন চরম নিয়ন্তা বিদ্যমান- যাঁহাকে দেশভেদে ও কালভেদে লোকে নানা নামে অভিহিত করিয়াছে। আমরা অনুভব করি যে আমাদের কলুষিত চিন্তার দ্বারে তাঁহার দৃষ্টি জাগিয়া আছে এবং তাঁহার এই সর্ব্বব্যাপকতা বিষয়ক চৈতন্যই আমাদিগকে পাপানুষ্ঠান হইতে সুদূরে রক্ষা করে। দর্শনও নয়, বিজ্ঞানও নয়—কিন্তু এই ঈশ্বরে বিশ্বাসই আমাদের চরম সান্ত্বনা ও পরম আশ্রয়স্থল। সারা জীবন জ্ঞানের অনুশীলনে জীবন নিয়মিত করিয়া আসিলেও দুঃখ-দুর্দ্দশা ও প্রয়োজনের মুহূর্ত্তে জ্ঞান আমাদের কাজে আসে না। একমাত্র ধর্ম্মই এই সঙ্কটকালে আমাদের সহায়—আর ঐ সহায়তার উৎস ভগবৎ-বিশ্বাসের উপরই সম্পূর্ণ নির্ভরতা। যাবতীয় ঘটনার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিচারক আমাদের চির-হিতৈষী, কোনো এক মহাশক্তিমানই যে আমাদের দুঃখ-দুর্দ্দশার নিয়ামক, এইটুকুই আমাদের সবচেয়ে বড় সান্ত্বনা; এবং বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডার যখন আমাদের কোনো কাজেই লাগে না, তখনও এই বিশ্বাস—একমাত্র এই বিশ্বাসই আমাদের ত্রাণকর্ত্তারূপে দেখা দেয়।

ধর্ম্ম ও অদৃষ্টবাদ

অতঃপর ওমর খৈয়ামের কথা। এ অভিমত খুবই সত্য যে, ভগবৎ

কার্য্যের ত্রুটী-বিচার বা খুঁত ধরিবার চেষ্টা প্রকাশ করার কোনো অধিকারই তাঁহার ছিল না ; কিন্তু এরূপ করার মূলে তাঁহার অভিপ্রায়টি কি ছিল তাহা সযত্নে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন—কারণ কোনোখানেই তাঁহার শ্রদ্ধার অভাব ঘটে নাই, এবং মানব-প্রকৃতির দৌর্ব্বল্য যে কত অধিক, কেবলমাত্র তাহাই তিনি দেখাইতে চাহিয়াছেন। ওমরের মতামত যেন প্রাণাধিক প্রিয়তমের বিরুদ্ধেই অভিযোগ—আর সত্যানুসন্ধিৎসা-প্রসূত বলিয়াই বুঝিবা সুসঙ্গত। মৃত্যুকালে ভগবৎ-অন্বেষণ-সম্পর্কে ওমর যে শেষ কথা কয়টি উচ্চারণ করেন তাহাকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, স্বাধীন ইচ্ছা অনুশীলনের আবশ্যকতা তিনি কতক পরিমাণে স্বীকার করিয়া ব্যবহার লাগাইয়াছিলেন—তথাপি প্রাক্তনের তুলনায় ইহাকে তিনি বড়-বেশী মূল্যবান মনে করেন নাই। মৃত্যুকালীন উক্তির মধ্যেই মানুষের সমগ্র জীবন সাকার হইয়া উঠে, সুতরাং ওমরকে যাঁহারা চিনিতে চান, তাঁহারা এইটিকে যেন বিশেষভাবে লক্ষ্য করেন।

ভগবানের বিরুদ্ধে ওমরের যে অভিযোগটিকে সাধারণতঃ ভ্রান্ত অর্থে গ্রহণ করা হয় তাহা এই :—

"ওগো দয়াল! ফাঁদ পাতি ও কণ্টকিত গুহায় ভরি'
রেখেছো যে পথখানি এই, পথিকজনের সামনে ধরি'—
সত্য কহ,—পারতে না কি অন্যতর বিধান-বলে
রাখতে সবায় বিমুক্ত পাশ কলুষ হ'তে তফাৎ করি'।"

ইহা হইতে এমন মনে করা অসঙ্গত যে, ভগবানের স্কন্ধে যত দোষ চাপাইয়া দিয়া যাহা খুশী করিবার অধিকার মানুষের আছে। বিবেক-বিরুদ্ধ কর্ম্মই 'কণ্টকিত গুহা'। ইহাতে পড়া না পড়া অবশ্য মানুষের নিজের উপরই নির্ভর করে। এই সঙ্কটে মানুষ যে পথ বাছিয়া লয়, তাহা হয় তাহাকে সিদ্ধির রাজপথে চালিত করে, অথবা পাপের অন্ধকার

গলিপথে লইয়া যায়। এক্ষেত্রেও ভগবৎ-বিধি সম্যক বলবৎ সত্য; কিন্তু আপন ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের ইচ্ছা সম্বন্ধে মানুষ স্বাধীন, এবং সৎ ও অসৎ উভয় কর্ম্মই 'তাহার বিধিদত্ত শক্তির অধীন। Samuel Smith-এর ভাষায় "Heaven helps those that help themselves'—কিন্তু একথা মানুষ যেন মনেও না আনে যে, সে ভগবৎ-নিরপেক্ষভাব কোন সৎকার্য্য করিতে সক্ষম। এরূপ অভিমান মনে জাগিলে 'ত্রিশঙ্কু'র দৃষ্টান্ত স্মরণ করা মন্দ হইবে না। ওমরের এ উক্তি অবশ্যই অকাট্য যে—

"প্রারম্ভেই সমাপ্ত ভাই শেষের মানুষটিকেও গড়া,
শেষ দিবসের ফসলগুলি, ঐ দিবসেই রোপণ করা;
সৃজনকালের প্রথম উষাই লিখেছে সেই হরফগুলি
প্রলয়কালের শেষ উষাটির চক্ষে যাহা পড়বে ধরা।"

এই উক্তির সহিত সম্পূর্ণ একমত হইয়াই বুঝিবা Fate and Free will গ্রন্থের লেখক লিখিয়াছেন—

"By fate, I understand a belief that the order of things is unalterably fixed and established from the begining of Creation once and for ever. and that no power we know of, human or divine, can hasten, stay or retard even by a second this per-determined succession of events, or deviate by a hair's breadth its fixed line of direction."

ওমরের ভগবৎ-দ্রোহিতা সম্বন্ধে উপরি-উক্ত পুস্তিকায় যাহা বলা হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য্য এই—"মানবজাতির নিঃসহায় অবস্থার নির্ম্মমতা-বিদ্ধ হইয়াই ওমর খৈয়াম আপন কার্য্যের দায়িত্বটুকু পর্য্যন্ত অস্বীকার করিয়াছিলেন। তাঁহার চক্ষে মানবজাতির তথাকথিত

পাপরাশি শাস্তির যোগ্য অপরাধরূপে প্রতিভাত না হইয়া, তাহাদিগের প্রকৃতির মূলীভূত দৌর্ব্বল্যরূপেই দেখা দিয়াছিল। এমন দৌর্ব্বল্য, যাহাকে অতিক্রম বা নিবারণ করাও বুঝিবা তাহাদের সাধ্যাতীত। স্বজাতীয় জীবের জন্য তিনি যেমন করিয়া অনুভব করিয়াছেন, এমন যন্ত্রণাময় অনুভূতি বুঝিবা আর কেহ প্রত্যক্ষ করে নাই। মানুষকে তিনি যেমন জানিয়াছেন, এমন অল্প লোকই জানিয়াছে। তিনি জানিয়া গিয়াছেন যে, মানুষ অন্যান্য প্রাকৃতিক পরিবেষ্টনী হইতে আপনাকে পৃথক করিয়া লইতে অশক্ত এবং তাহার সত্তাঘটিত নিয়ম ও সর্ত্তসমূহও, ঋতুচক্র ও গ্রহ-নক্ষত্রাদির গতিবিধিরই মত, অলঙ্ঘ্যরূপে সুনির্দ্দিষ্ট। আমরাও যদি, তাঁহার ভগবৎ-বিদ্রোহে সহসা বিচলিত বা বিমুখ না হইয়া, সহিষ্ণুতার সহিত পাপ ও অপরাধের গোপন উৎসগুলির বিষয় চিন্তা করি, তাহা হইলে বুঝিব, যে কি তীক্ষ্ণভাবে ওমরের দিব্যদৃষ্টি সৃষ্টির মর্ম্মে মর্ম্মে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে।”

পূর্ব্বে বলা গিয়াছে যে ওমরের যথার্থ উদ্দেশ্য ছিল—ঈশ্বরের সম্মুখে নতজানু হইয়া, তাঁহাকে সৃষ্ট মানব-হৃদয়ের দৌর্ব্বল্য বুঝিবা বুক চিরিয়াই দেখানো। এই কার্য্য করিতে গিয়া যদি তিনি ভব্যতার সীমা লঙ্ঘন করিয়াও থাকেন—আমাদের বিশ্বাস করেন নাই—তাহা হইলেও ভগবৎ-সকাশে করুণা ও মার্জ্জনার দাবী-কল্পে, সকরুণ অনুযোগের আকারে, তিনি অন্ততঃ হৃদয়গ্রাহী সাহিত্যও সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন।

জীবন তত্ত্ব ও ওমর খৈয়াম

খৈয়ামের জীবন-বিষয়ক দার্শনিকতা প্রভূত পরিমাণে ‘এপিকিউরাসের’ই প্রতিধ্বনি। অতীত বা ভবিষ্যতের কোনো তোয়াক্কা না রাখাই ইহার বিশেষত্ব। বর্ত্তমান সম্বন্ধে সর্ব্বদা সজাগ থাকিতেই ইহা শিক্ষা দেয়। জীবনকে উপভোগ কর—পানাহারে প্রফুল্ল থাক—কারণ এই পৃথিবী ক্ষণিকের

এবং জীবনে এমন কিছুই নাই যাহাকে স্থায়ী বলিতে পারা যায়। নিত্য-পরিবর্ত্তনশীলতাই যখন জগৎ ও জীবনের প্রকৃতি, তখন যতদিন বাঁচিয়া থাকা যায়, মনের সুখে বাঁচাই বাঞ্ছনীয়। জীবনের দুঃখকে সুখে রূপান্তরিত করিতে থাক এবং জীবন যেমনই হোক, তাহাকে প্রফুল্লচিত্তে ও সন্তোষের সহিত গ্রহণ কর। কাল হয়তো তোমাকে মৃত্যুমুহূর্ত্তের সম্মুখীন হইতে হইবে এবং উহার কবল হইতে ফিরিয়া এই জগতের আনন্দরাজি আর উপভোগ করিতে পাইবে না; অতএব যে-দিনগুলি তোমার আয়ত্তে আছে, তাহাদিগকে সানন্দে বরণ কর—কারণ তাহা অমূল্য।

"মাত্রা যদি অধিকই হয়, তবু খৈয়াম, সুখীই থেকো;
পদ্মমুখীর সঙ্গী যদি, তবু খৈয়াম, সুখীই থেকো;
শেষটা যখন দিন ফুরাবে, অচল হবে ঘড়ির কাঁটা,
জেনো তুমি নেইকো বেঁচে; যাবৎ জীবন সুখেই থেকো।"

মৃত্যুর ন্যায় সুনিশ্চিত আর কিছুই নাই। এ সম্বন্ধে বিভিন্ন সম্প্রদায় বিভিন্ন মত পোষণ করে—এবং মৃত্যু-পরবর্ত্তী অবস্থা—সম্বন্ধে অত্যুজ্জ্বল আশার কথাও শুনাইতে চায়। খৈয়ামের নিকট সে সমস্তই "দূর-দামামার বিজয়-নাদ"। 'মৃত্যুর অপরিহার্য্যতা অস্বীকার্য্য' এই সত্যটুকু মাত্র মানিয়া লইয়া তিনি আমাদিগকে বলেন যে সময়ের অপব্যবহার অকর্ত্তব্য, এবং জীবনকে উপভোগ-সামগ্রী করিয়া লওয়া দরকার। যাহাদের অবস্থা সুখ-সম্ভোগের অনুকূল তাহাদিগকে ওমর অভিনন্দিত করেন এবং বলেন যে, তৃপ্তিপ্রদ মুহূর্তগুলির মূল্য বুঝিয়া লইতে হইবে। জীবন তাঁহার চক্ষে আনন্দ ও উপভোগের উৎস। জীবন যে কণ্টক-শয্যা এই ধারণা সবলে পরিহার করিয়া তিনি উহাকে কুসুম শয্যায় পরিণত করিবার পক্ষপাতী; তাঁহার মতে এই জগতের যাহা-

কিছু, সে সমস্তই আমাদের কর্মোচিত ও ন্যায়সঙ্গত উপভোগের জন্য সৃষ্ট।

কিন্তু খৈয়াম বর্ত্তমানের উপরই এতটা জোর দিয়াছেন কেন? কারণ, তাঁহার চক্ষে অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ পরস্পর-অবিচ্ছিন্ন এবং একই বুনানের ভিন্ন ভিন্ন অংশমাত্র। আজ যাহা বর্ত্তমান তাহা অতীতেরই পরিণতি; আর এই বর্ত্তমানই যখন অতীত হইয়া দাঁড়াইবে, তখন উহা ভাবী বর্ত্তমানের গঠন-মূলে ভিত্তিরই কাজ করিবে। এই বুনানের উপাদান দুঃখ, যন্ত্রণা, সৎ ও অসৎ। তাহারা জগতের বিবর্ত্তমান প্রকৃতি ও মানুষের মানস-দেহের স্বভাবকে রূপ দেয় এবং পরিণামে মানব জাতির সুখ ও শান্তির আকারে বিকশিত হইবার দিকে অগ্রসর হয়। অতীতের অভিজ্ঞতার উপর আমরা বর্তমান জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করি এবং ভাবীকালের সুবিধার জন্য উচ্চতর নৈতিকতার অট্টালিকা গাঁথিয়া রাখিতে চাই। তাই বর্ত্তমানের উপর জোর দিয়া, দার্শনিক কবির একদিকে অতীতের স্মৃতির বেদনা ও অন্যদিকে ভাবীকালের সম্ভাব্য বিপ্লব-বিক্ষোভাদির দুর্ভাবনা নিরোধ করিতে চান। তিনি আমাদিগকে বর্ত্তমানের সদ্ব্যবহার ও জীবনে পরিমিত মাত্রায় বোঝাপড়ার কাজেই প্রোৎসাহিত করেন —কারণ এ বিষয়ে তিনি নিঃসংশয় যে, সততার সহিত যে পরিশ্রম করা যায়, তাহার ফল শুভ ও পরিণাম সুখময়ই হইয়া থাকে! আর যদি অকৃতকার্য্যতাই অদৃষ্টের আকারে দেখা দেয়, তাহা হইলেও এই সান্ত্বনা আমাদের হতাশা হইতে রক্ষা করে যে আমাদের সাধ্যমত কর্ত্তব্যের ত্রুটী ঘটিতে দেই নাই।

একাদশ পরিচ্ছেদ

কবি ওমর খৈয়াম

ওমর খৈয়ামের জীবন-অধ্যায় আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, আপন জীবদ্দশায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক হিসাবে স্বদেশবাসীর শ্রদ্ধাঞ্জলি লাভ করিলেও কবিরূপে সম্মানিত ছিলেন না। পারস্যের প্রসিদ্ধ কবি-বিবরণী-লেখক মহম্মদ আওফি (১০১৫-১৬ খ্রীঃ) তাঁহার "লুবাব-উল-আলবাব" গ্রন্থে ওমরের নামোল্লেখ করেন নাই। মহম্মদ হামদুল্লা মুস্তওফি (১৩৪৯ খ্রীঃ) তাঁহার "তারিখ-ই গুজিদা"তে ওমরের কবি-প্রতিভা সম্বন্ধে কোন উল্লেখ না করিয়া কেবলমাত্র তাঁহার কতকগুলি আরবী ও ফার্সী রুবাই উদ্ধৃত করিয়াছেন। দৌলতশাহ (১৫৩৮ খ্রীঃ) তাঁহার "তজ কিরাতুশোয়ারা" গ্রন্থে অপর কবির তুলনা প্রসঙ্গে ওমরের কবিতা উদ্ধৃত করিয়াছেন। ওমরের কবি-প্রতিভা সম্বন্ধে কোন বিবরণ এই গ্রন্থ মধ্যে স্থান পায় নাই। ওমরের প্রিয় শিষ্য নিজামী অরুসী সমরকন্দী (১০৬০-৬১ খ্রীঃ) তাঁহার "চহার মকালা" গ্রন্থের প্রথম 'মকালা'য় (কবি-প্রসঙ্গে) ওমরের নাম উল্লেখ করেন নাই। লুতফ আলি বেগ (১৭২১-২২ খ্রীঃ) তাঁহার "আতশকদা" গ্রন্থে কতকগুলি চতুষ্পদী উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছেন, ওমর সুবিখ্যাত হকিম (দার্শনিক) হইলেও কতকগুলি সুন্দর আরবী ও ফার্সী রুবাই রচনা করিয়া গিয়াছেন। ইমাম উদ্দিন খাতিব (১৩৪৩-৪৪ খ্রীঃ) তাঁহার "হবিবাত-উস-আসর" গ্রন্থে ওমরের যে সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রদান

ওমরের কবি যশ

করিয়াছেন, তাহাতে ওমর খৈয়ামকে খোরাসানের কবি-তালিকাভুক্ত করিয়াছেন।(১) তকি কাশী (১৫৩৯ খ্রীঃ) তাঁহার সুবিখ্যাত "খুলাসৎ-উল-আসর" নামক পারস্ত কবিগণের জীবনী পুস্তকে ওমরকে কবি-রূপেই উল্লেখ করিয়া তাঁহার ষোলটি রুবাই উদ্ধৃত করিয়াছেন।(২) তকি কাঁশী তৎকালীন নিভুল জীবনীকার ও সমালোচকরূপে প্রসিদ্ধ ছিলেন।(৩) সৈয়দ আলী বিন মহম্মদ অল-হুসেনী (১৫৭২-৭৩ খ্রী) তাঁহার "বাজমারাই" নামক কবি-বিবরণীতে লিখিয়াছেন, ওমর খৈয়াম কতকগুলি অতি সুন্দর চতুষ্পদী রচনা করিয়া গিয়াছেন। তিনি চিন্তাশীল ও জ্ঞানী ছিলেন। তিনি নিজ শক্তি পরীক্ষা ও জ্ঞানবৃদ্ধি করিবার জন্য কাব্য অনুশীলন করিতেন।

আমাদের মনে হয়, জ্ঞানচর্চ্চার অবসরে রচিত ওমরের স্বল্পসংখ্যক চতুষ্পদী ও শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক-প্রতিভা স্বদেশে কবি-যশ লাভ করিবার পক্ষে প্রতিবন্ধক হইয়াছিল। ইরাণে স্বল্পসংখ্যক কবিতা-রচয়িতারা কবি-তালিকাভুক্ত হইতেন না। ইরাণের অধিকাংশ কবিই এত অধিকসংখ্যক কবিতা রচনা করিয়া গিয়াছেন যে, তাহার তালিকা প্রস্তুত করা কঠিন ব্যাপার। তৎকালে অধিকসংখ্যক শ্লোক-রচয়িতাই কবির সম্মান লাভ করিতেন। পঞ্চাশ হাজারের অধিকসংখ্যক শ্লোক-রচয়িতা ফারদৌসী মহাকবিরূপে সম্মানিত। ইহা ব্যতীত আরও দেখিতে পাওয়া যায়

কবি-যশের প্রতিবন্ধক

১। Catalogue of Oriental Manuscripts in the Leydon University Library Dozy.

২। Catalogue of Arabic and Persian Manuscripts in the Oriental Public Library. Patna vol viii.

৩। Catalogue of Oudh Mss. Dr Sprenger 1854.

যে, রাজ-অনুগ্রহে প্রতিপালিত রাজ-স্তুতিকারক কবিগণ জনসাধারণের চিত্তজয় করিতে সমর্থ হইতেন; তাঁহাদিগের কবিত্ব কিম্বা রাজসম্মান জনসাধারণের উপর প্রভাব বিস্তার করিত, তাহা বলা কঠিন হইলেও আমরা উদাহরণস্বরূপ পারস্যের দ্বিতীয় কবি-পয়গম্বর আন্‌ওরির—যিনি প্রথম জীবনে বৈজ্ঞানিক ছিলেন,—কবিরূপে অবতীর্ণ হইবার কথা উল্লেখ করিতে পারি।

ইরাণে কাহারা কবি যশ লাভ করিতেন

ইরাণে রাজকবি—সুলতানের স্তুতিকারক—অধিকতর সম্মানিত হইতেন। ওমর খৈয়াম রাজকবি ছিলেন না। তিনি রাজ-জ্যোতিষী (মুনাজ্জিম-ই-শাহী) ছিলেন; সুতরাং কবি-রূপে সম্মান লাভ করিবার কোন উপায় ছিল না। তাহার পর দেখা যায় যে, ইরাণের বিদ্বান্‌গণেরই কবিতা রচনার প্রয়াস পাইতেন—কবি-প্রতিভা থাকুক আর নাই থাকুক। উদাহরণস্বরূপ ওমর-গুরু আবু-সিনার নাম উল্লেখ করিতে পারা যায়। ওমরের মত আবু-সিনার কবি-প্রতিভাও পারস্যের জনসাধারণের চিত্তজয় করিতে পারে নাই—তাঁহার স্বল্প রচনাই ইহার জন্য একমাত্র দায়ী। বেকনের কবিতা সম্বন্ধে প্যালগ্রেভ বলিয়াছিলেন,—

"A fine example of a peculiar class of poetry that is written by thoughtful men who practice this art but little."

আমাদের মনে হয়, ওমরের স্বদেশবাসিগণ ওমরের কবি-প্রতিভা তাঁহাদিগের চিত্তজয় করিতে সমর্থ হয় নাই।

সে যাহা হউক, স্বদেশে আপন জীবদ্দশায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী জ্যোতির্বিদ ও দার্শনিক হিসাবে বিখ্যাত হইলেও দেশ-দেশান্তরের জন-সমাজে প্রায় হাজার বৎসরের কালতরঙ্গ ভেদ করিয়াও ওমর খৈয়াম আজ যে

জন্য পরিচিত, তাহা তাঁহার কবিত্ব শক্তি মাত্র। স্তূপীকৃত জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের ভার আজ কালসাগরের অতলস্পর্শে নিমজ্জিত; কিন্তু জ্ঞান-চর্চ্চার ফাঁকে ফাঁকে বিরচিত কতকগুলি চতুষ্পদীর সমষ্টি একখানি মানব-হৃদয়ের আশা-ভালবাসা সংশয়-বিশ্বাস ও আনন্দ বেদনার কাহিনী বহিয়া আজ পর্য্যন্ত ভাষা হইতে ভাষান্তরে তাহার জয়যাত্রা অব্যাহত রাখিয়াছে।

জগৎসভায় ওমরের পরিচয় কারণ

পারস্যের কাব্য-সাহিত্য নানা ছন্দ-ঐশ্বর্য্যে সমুজ্জ্বল। যে ছন্দে কবি ওমর তাঁহার উক্তি ও যুক্তিগুলিকে মূর্ত্ত করিয়া গিয়াছেন, তাহার নাম "রুবাই"। পারস্যের সাহিত্য-শিল্পিগণ যত প্রকার ছন্দে কাব্য রচনা করিয়া কাব্য-সাহিত্যকে শ্রীমণ্ডিত করিয়াছেন, তন্মধ্যে রুবাই ছন্দের নাম সসম্মানে উল্লেখযোগ্য; ওমর খৈয়ামের রুবাই বিশ্বের যাবতীয় ভাষায় অনুবাদ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে "রুবাই" শব্দটি বাংলার সাহিত্য-রসিকগণের নিকটও সুপরিচিত হইয়াছে।

ছন্দ-কথা

রুবাই ছন্দের প্রাচীন নাম 'দু'বইতি'।—প্রাচীন যুগে এই ছন্দ দুইটি বয়েৎ বা চরণে সীমাবদ্ধ হওয়ায় উহা 'দু'বইতি' নামে পরিচিত হয়। (১) পারস্যের প্রাচীন কবি মূইজ্জি (২) 'দু'বইতি' ছন্দে কাব্য রচনা করিয়া খ্যাতিলাভ

পরিচয়

১। A Literary History of Persia vol I.

২। সমরকন্দের প্রসিদ্ধ কবি। ইহার প্রকৃত নাম আমীর আলী। সুলতান মলিক শাহ ও সুলতান সঞ্জরের আশ্রিত-কবি ছিলেন। পরে সুলতান সঞ্জরের সুনজরে পতিত হইয়া 'মলিক-উশ-শোয়ারা' (রাজ-কবি) উপাধিতে সম্মানিত হন। ইঁহার দীওয়ান ১৫০০০ শ্লোকে পূর্ণ। ৫৪২ হিঃ (১১৪৭ খৃঃ) মৃত্যুমুখে পতিত হন।

করেন; (১) কালক্রমে এই ছন্দ চারি বংে বা চরণে সীমাবদ্ধ হইয়া 'চহার বইতি' নাম ধারণ করে। 'রুবাই' চহার বইতির সংস্কৃত প্রকরণ। ইহার বহুবচনাস্ত রূপের নাম—রোবাইয়াৎ।

চহার বইতি পারস্যের নিজস্ব সম্পদ। সুস্পষ্ট, সুতীক্ষ্ণ অথচ সংক্ষিপ্ত গঠনের এই ছন্দ পারসিক ধাতের সহিত বেশ খাপ খাইয়াছে বলিয়া মনে হয়। কেন না আজ পর্য্যন্ত জনসাধারণ্যে ইহার আদর অক্ষুণ্ণই রহিয়া গিয়াছে। এই চতুষ্পদীর চারিটি চরণের প্রথম, দ্বিতীয় ও চতুর্থ চরণ পরস্পরের সহিত মিল রাখিয়া চলে। তৃতীয় চরণ স্বাধীন, তবে কখনও কখনও স্বেচ্ছায় মিলের অধীন হয়। সমগ্র রুবাইয়ের ভাবটুকুকে ঘনীভূত করা এবং উহার গতিটিকে নির্দ্দেশ করাই চতুর্থ চরণের কার্য্য। পারসিকদিগের উদ্ভাবনা হইলেও এই ছন্দের মাত্রা আরবীয় আদর্শ অনুসারেই নির্দ্ধারিত হইয়াছে।(২) কেননা আরব জাতি কর্ত্তৃক বিজিত হওয়ার পর পরসিকেরা যখন নিজেদের পহ্লবী ভাষাকে উহার চরম পরিণতির ছাঁচে ঢালিয়া লইতেছিল, এই ছন্দ সেই সময়েরই সৃষ্টি এবং এই সময় হইতেই ইহা 'রুবাই' নামে পরিচিত হয়। (৩) পাণ্ডিত্য-প্রদর্শক বৈয়াকরণিকের দল ঐ চারিটি মাত্র চরণ-সীমার মধ্যে চব্বিশ প্রকারের মাত্রা-প্রয়োগরীতি বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন বটে, কিন্তু আসলে দুইটি মাত্রই বর্ত্তমান—যেহেতু বাকীগুলি শব্দ-সংখ্যার সঙ্কোচন বা প্রসারণের ফলে, ঐ দু'টিরই প্রকরণভেদ মাত্র।

১। A Literary History of Persia vol II.

২। Persian Prosody. Prof. K. D. J. Irani; A Literary History of Persia vol II.

৩। Persian Prosody. Prof. K. D. J. Irani.

কবি-বিবরণীর লেখক দৌলত শাহ(১) বলেন, আমীর ইয়াকুবের পুত্র আনন্দোচ্ছ্বাসের সহিত সুর করিয়া হঠাৎ পদ্যে কথা কন, উহাই তৎকালে 'রুবাই' নামে পরিচিত হয়।(২) শামস-ই-কাইস(৩) বলেন, প্রাচীন অন্ধ কবি রূদকী(৪) এই ছন্দের জন্মদাতা।(৫)

জন্ম-কথা

পারস্য দেশের প্রাচীন কবিগণের মধ্যে যাঁহারা এই ছন্দে কাব্য রচনা করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন এবং যাঁহাদিগের কবিতা কালের কষ্টি-পাথরে পরীক্ষিত হইয়া আজ পর্য্যন্ত বাঁচিয়া আছে, তাঁহাদিগের মধ্যে পারস্যের প্রসিদ্ধ দার্শনিক ও কবি আবু শকুরের(৬) নাম সর্ব্বাগ্রে ও

১। ষোড়শ শতাব্দীর লেখক ও খোরাসানের অধিবাসী। আমীর আলা উদ্দৌলা ইসফারাইনের পুত্র। দৌলত শাহ কবি-বিবরণী লিখিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তাঁহার তজ্‌কিরাতু শোয়ারা প্রসিদ্ধ ও প্রামাণ্য পুস্তক।

২। তজ্‌কিরাতুশ্‌ শোয়ারা।

৩। খোরাসানের অধিবাসী ত্রয়োদশ শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত বৈয়াকরণিক ও কবি-বিবরণী লেখক। সিরাজের বাদশাহ আতাবক আবু বকরের অনুরোধে শামস-ই-কাইস সিরাজে আগমন করেন এবং তাঁহারই আদেশে কবি-বিবরণী পুস্তক রচনা করেন। এই গ্রন্থের নাম অল-"মুরাজ্জাম।"

৪। পারস্যের সমানিবংশীয় আমীর নসরের রাজত্বকালীন প্রাদুর্ভূত প্রাচীন কবি ও গায়ক। ইনি জন্মান্ধ ছিলেন। নিজ প্রতিভাবলে রাজদরবারে উচ্চাসন লাভ করিয়াছিলেন। পারস্য কবিগণের মধ্যে তিনিই প্রথম দীওয়ান রচনা করেন। ইঁহার রচনাবলীর মধ্যে নারী ও সুরা স্তুতি দেখিতে পাওয়া যায়। ইঁহার প্রকৃত নাম ফরিদ-উদ্-দিন্ আবুদুল্লা আবু। ৩৩৩ হিঃ (৯৫৮ খ্রীঃ) মৃত্যুমুখে পতিত হন।

৫। অল্-মুরাজ্জাম।

৬। বলখ্‌ নগরের অধিবাসী ৯৫০ খৃষ্টাব্দে প্রাদুর্ভূত কবি। ইনি দার্শনিক ও কবি উভয় রূপেই প্রসিদ্ধ ছিলেন। ইঁহার অনেক রুবাই পারস্যের সুপ্রসিদ্ধ নীতি-সংগ্রহ পুস্তক "কুবাস-নামা"র উদ্ধৃত হইয়াছে।

সসম্মানে উল্লেখযোগ্য। কবি শকুর অনেকগুলি সুন্দর রুবাই রচনা করেন।(১) আবু শকুরের সমসাময়িক ও পরবর্ত্তী কবিগণ মসনবী ও গজল রচনা দ্বারা নিজ নিজ শক্তির পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা কেহই রুবাই রচনার দিকে আদৌ মনোযোগ প্রদান করেন নাই।

একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে অনেকগুলি রুবাই রচনাকারীর—আবির্ভাব হয়। ইহারাই এই ছন্দটিকে কাব্য রচনার সম্পূর্ণ অনুকূল করিয়া তোলেন। এই দলের কবিদিগের মধ্যে আবু সৈয়দ(২), বাবা তাহির(৩), আনসারী(৪) ও ওমর খৈয়ামের নাম সর্ব্বাগ্রে ও সসম্মানে উল্লেখযোগ্য। ওমর খৈয়াম ব্যতীত এই তিনজন কবি সুফীমরমীবাদকে সংক্ষিপ্ত আকারে রুবাই ছন্দে প্রকাশ করেন। ইহাদিগের প্রত্যেকের রচনায় বিশেষত্বের ছাপ বিদ্যমান। কবি আবু সৈয়দ

রুবাঈ ছন্দ রাজ্যের সম্রাট

১। Persian Literature. Levy.

২। কবি আবু সৈয়দ ৯৬৮ খৃষ্টাব্দে খোরাসানের অন্তর্গত মাহানা প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি উচ্চ শ্রেণীর সুফী ও দার্শনিক ছিলেন। প্রসিদ্ধ দার্শনিক আবু-সিনার সঙ্গ লাভ করিয়াছিলেন।

৩। একাদশ শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত প্রসিদ্ধ-সুফী কবি। চতুষ্পদী রচনাকারী হিসাবে প্রসিদ্ধ ছিলেন। কাব্যে উরিয়েন (উলঙ্গ) তখলুস (ভণিতা) ব্যবহার করিতেন। ইনিও কবি আবু সৈয়দের মত দার্শনিক আবু সিনার সঙ্গ লাভ করিয়া ধন্য হয়েন।

৪। কবি আনসারী রুবাই রচনার জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ইঁহার সম্পূর্ণ নাম শেখ আবু ইসমাইল আবুদুল্লা আনসারী। কবি আনসারীর পূর্ব্বপুরুষ আরবের অধিবাসী ছিলেন। কবি আনসারী মহম্মদের সহচর আবু আয়াসের বংশধর ছিলেন। হিরাতে ১০০৬ খৃঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি কবি আসজাদী ও কবি ফরিকির সাহিত্য-গুরু ছিলেন। কবি আনসারীর দীওয়ান ৩০,০০০ শ্লোক পূর্ণ।

সর্ব্বপ্রথম এই ছন্দকে সর্ব্বজনগ্রাহ্য ও কাব্য-প্রকাশের অনুকূল করিয়া ধর্ম্মসম্পর্কীয় কবিতা রচনার পথ উন্মুক্ত করেন; কবি বাবা তাহির রুবাই ছন্দে তাত্ত্বিকবিরোধ এবং তৎসমন্বয়সংক্রান্ত সমালোচনাত্মক কবিতা (Dialectic poetry) রচনার পথ-প্রদর্শক; কবি আন্‌সারী রুবাই ছন্দের শক্তিশালী লেখক এবং ওমর খৈয়ামকে রুবাই-রাজ্যের সম্রাট আখ্যা দিতে পারা যায়।

ওমরের রচনারীতি

বৈয়াকরণিক-নির্দ্দিষ্ট সমস্ত ছন্দই কবি ওমর খৈয়াম কাজে লাগাইয়াছেন এবং পারসিক চতুষ্পদী ছন্দের আকারের যত কিছু বৈচিত্র্য সম্ভবপর, ওমরের রোবাইয়াতে তাহার সবগুলিই বিদ্যমান আছে। পারিভাষিক শিল্পের দিক হইতে এবং উক্ত ছন্দের পক্ষে, ওমরের রচনা-রীতি একদিকে যেমন কমনীয় ও নমনীয়, অপরপক্ষে আবার তেমনি লঘুভার ও সঙ্গীতময়। তাঁহার ছন্দের প্রয়োগ প্রায়শঃই মনোরম। তৃতীয় পংক্তিটি কখনও কখনও অপর চরণত্রয় হইতে সম্পূর্ণ পৃথক ছন্দে রচিত হওয়ায় অত্যন্তই চমকপ্রদ হইয়া উঠিয়াছে। কাব্যের জন্য ওমর যে ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা শিক্ষানিপুণ সারল্যে পরিপূর্ণ। প্রকৃতপক্ষে ভাষার এই সরলতাই তাঁহার চতুষ্পদীগুলিকে সুশাণিত ও শক্তিসম্পন্ন করিয়া তাহাদিগকে বিস্ময়কর ও আকর্ষণের বস্তু করিয়া তুলিয়াছে। ওমরের কবিতার প্রত্যেক পংক্তিটি অনুভূতির সত্যতা ও চিন্তার গভীরতায় এতই সজীব যে, পারস্য ভাষা ও সাহিত্যের যে-সকল সমালোচক তাঁহাকে নিতান্তই সাধারণ শ্রেণীর কবি ভাবিয়া লঘুভাবে দেখিয়াছিলেন, তাঁহার কবির সর্ব্বপ্রধান গুণগুলিকে লক্ষ্য না করিয়া তৎপ্রতি অবিচার করিয়াছিলেন বলিতে পারা যায়। অভিপ্রায়ের সারল্য ও উক্তির বেগবত্তাই সমস্ত মহৎ ও সংগ্রন্থের অন্তর্নিহিত প্রাথমিক কার্য্যকরী শক্তি; এবং ওমর

খৈয়ামে এই শক্তি সুপ্রচুর। ওমরের সরল গতিবেগ, নির্ভীক ও ঋজুতাকে একেবারেই সার কথাটির দিকে যাওয়া, সমস্ত ছাড়িয়া একান্ত মনে লক্ষ্যবেধ—এই বিশেষ ভঙ্গীটি কাব্য-চতুষ্পাঠীর কোন্ পদ্ধতিপ্রিয় লেখক দিতে পারিয়াছেন? পারশ্য কাব্যের সমগ্র ইতিহাসে ওমরের মত উলঙ্গচিত্তে কে কবে লিখিয়াছে—

"বিস্ময়ে মোরে ভরিয়া দিল সে প্রথমতঃ হেথা আনি,
কুড়ায় কেবল ক্ষীণ অনুমান টুঁড়িয়া জীবনখানি;
চলি পুনরায় ঘুরণ হাওয়ায়; কেন আসা? বাঁচা? মরা?
প্রশ্নই মনে জাগে ও মিলায়, উত্তর নাহি জানি।"

ওমরের চতুষ্পদীগুলিকে বিষয়ের দিক হইতে মোটামুটি ছয় ভাগে ভাগ করা চলে; যথা:—

১। অদৃষ্টচক্রের নির্মমতা, জগতের অবিচার, মানুষের সীমাবদ্ধ ক্ষমতা ও ভাগ্যসম্বন্ধীয় অভিযোগ।

২। ধর্মগুরুগণের বুজরুকী, সাধুজনের পাষণ্ডতা, পণ্ডিতগণের অজ্ঞতা এবং তাঁহার সমসাময়িক জনসাধারণের অশিক্ষিতার প্রতি বিদ্রূপ।

ওমরের রুবাইয়ের বিষয়গত শ্রেণী বিভাগ

৩। পার্থিব বা অপার্থিব প্রিয়তমের সহিত মিলনের আনন্দ ও বিচ্ছেদের বেদনা বিষয়ক প্রেম-কবিতা।

৪। বসন্ত কাল, উদ্যান ও পুষ্প প্রভৃতির প্রশংসামূলক কবিতা।

৫। সৃষ্টির ভিতরকার পাপাদির জন্য সৃষ্টিকর্তাকে দায়ী করিয়া ধর্মবিরোধী ও তত্ত্ববিরোধী উক্তি, কোরানে বর্ণিত স্বর্গ ও নরকের প্রতি বিদ্রূপ; সুরা ও সম্ভোগের জয়গান এবং ঘুরিয়া-ফিরিয়া "পানাহারের" এই বলিয়া আবশ্যকতা প্রচার যে, মৃত্যু কেশে ধরিয়া টানিতেছে।

৬। পাপের জন্য অনুতাপ ও ক্ষমার জন্য অনুনয় করিয়া, কখনও বা সাধারণ অনুরাগের ভাষায় ভগবৎ-সম্ভাষণ; আবার কখনও বা সুফী মরমীদিগের অনুরূপ রূপকের ভাষায়, অহমিকা হইতে মুক্তির ও পরমাত্মার সহিত মিলনের জন্য আকুলতা প্রকাশ।

শ্রেণীগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয়

প্রথম শ্রেণীর চতুষ্পদীগুলিকে কবির জীবনের পরিচিত ঘটনাগুলির সহিত জড়িত করা যাইতে পারে। স্বাধীন মতামতের জন্য তাঁহাকে সাধারণ্যে যে নির্য্যাতন সহ্য করিতে হইয়াছিল, এই সকল অভিযোগ সম্ভবতঃ তাহারই ফল। কোরানের উদ্দিষ্ট হুরী ও অপরাপর পবিত্র বিষয়াদির প্রতি তাঁহার ব্যঙ্গোক্তি জনসাধারণকে কবির বিরুদ্ধে এরূপ উত্তেজিত করিয়াছিল যে, নিশাপুর হইতে তিনি যে প্রাণ বাঁচাইয়া পলাইতে পারিয়াছিলেন, ইহাই বিস্ময়কর। দ্বিতীয় শ্রেণীর বিদ্রূপ কবিতাও ঐ একই কারণপ্রসূত। তৃতীয় শ্রেণীর রুবাইগুলি এমন এক জাতীয় রচনার নমুনা, যাহা ওমরের পরবর্ত্তী কবিগণের মধ্যেই অধিকতর সাধারণ। তাহাদের অধিকাংশেরই অন্তরে কোন গূঢ় অর্থ নিহিত থাকাই সম্ভব। কারণ, ওমরের ধাত যে প্রেম প্রভৃতি কোমলা-বৃত্তি-চর্চ্চার বড় বেশী অনুকূল ছিল, এমন মনে হয় না। "গোলাপী গণ্ড' বা "ললিত-তনু ভঙ্গী''র তিনি তারিফ করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার সুন্দরী বান্ধবীগণের প্রতি কোনো গভীরতর আকর্ষণ অনুভব করিয়াছেন, এমন কোনো নিদর্শন তাঁহার কাব্যে দেখা যায় নাই।

চতুর্থ শ্রেণীর প্রাকৃতিক-দৃশ্যাবলী-উপভোগমূলক কবিতাতেও ওমরের বিশেষত্ব বড় বেশী লক্ষিত হয় না। ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিকর প্রাকৃতিক বিষয়-গুলিই শুধু ওমরের চোখে পড়িয়াছে। ফুলের হাসি, পাপিয়ার গান, স্রোতস্বতীর তৃণাস্তীর্ণ তট, ছায়াময় উদ্যান প্রভৃতিই বন্ধুসভার আনুষঙ্গিক

উপকরণ হিসাবে ওমরের মনে ছায়াপাত করিয়াছে। তবে কতকগুলি মৌলিক উপমা ও জীবন্ত অনুভূতি তাঁহার এই শ্রেণীর কয়েকটি চতুষ্পদীর ভিতর উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

ওমরের কবিতার অদ্বিতীয় বিশেষত্ব ও উল্লেখযোগ্য শ্রীসম্পদ ফুটিয়া উঠিয়াছে তাঁহার পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণীর রুবাইগুলিতে। একদিকে তত্ত্ব-বিদ্রোহী ও ধর্ম্মবিদ্রোহী উক্তির তীব্রতা, আবার অন্যদিকে সাধুজনোচিত ইচ্ছাশা ও অনুশোচনা প্রভৃতির করুণ কমনীয়তা—পাশাপাশি এই পরস্পর-বিরোধী চিত্ত-বৃত্তির জলন্ত বিকাশ কবির পাঠকবর্গকে তাঁহার সম্বন্ধে নিতান্তই বিপরীত ভাবের ধারণায় অনুপ্রাণিত করিয়াছে। ওমরের সমসাময়িক এবং ইয়োরোপীয় বহু সমালোচক তাঁহাকে ধর্ম্মদ্বেষী, মদ্যপ ও অসচ্চরিত্র আখ্যায় অভিহিত করিয়াছেন, অপরপক্ষে সুফী সম্প্রদায়ভুক্ত পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁহার সুস্পষ্ট 'চার্ব্বাক'-পন্থী চতুষ্পদাগুলিরও আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা আবিষ্কার করিয়াছেন। পারস্য ও ভারতবর্ষে এই শেষোক্ত প্রণালী অধিকতর সমাদৃত হইলেও কোনো চিন্তাশীল ব্যক্তিই চক্ষু বুজিয়া ঐ দ্বিবিধ পন্থার কোনোটিকেই সমগ্রভাবে গ্রহণ করিতে পারেন না। তর্কের খাতিরে যদিও ধরিয়া লওয়া যায় যে, সে সময়েও সুফী সাধন-পদ্ধতির সঙ্কেতগুলি পরিচ্ছন্ন আকার লাভ করিয়াছিল, তথাপি সহজ-বুদ্ধির খাতিরেও আমরা এ কথা স্বীকার করিতে পারি না যে, ওমরের সুরা ও সম্ভোগ-বিষয়ক রুবাইগুলি—যাহার সহিত লোক-নিন্দা ও অনুশোচনা জড়িত রহিয়াছে, যাহা পরিহার করিবার চেষ্টা ও পক্ষসমর্থনের বিবিধ যুক্তির ভিতর দিয়া বারংবার দেখা গিয়াছে—কোনো ভক্তি গভীর অর্থের দ্যোতক।

এ কথা খুবই স্পষ্ট যে, ওমরের রুবাইগুলি তাঁহার জীবনের কোনো বিশেষ বয়সে, কোনো সুনির্দ্দিষ্ট ভাবধারার বশে বিরচিত হয় নাই।

জ্ঞানচর্চ্চার অবসরে বিত্ত-বিক্ষেপের জন্য বা বন্ধুদের উপভোগের জন্য, বিশেষ বিশেষ মানসিক অবস্থায় এবং বিশেষ বিশেষ মুহূর্ত্তের চিন্তা, মতিগতি বাসনাদির প্রভাবে উহারা আকারবদ্ধ হইয়াছিল। ওমরের সমসাময়িক শহরস্তানীর বিবরণে যদি তাঁহারা উক্তরূপ মত-পরিবর্ত্তনের বা ভাব-বিরোধের কোনো উল্লেখ থাকিত, তাহা হইলে আমরা ধরিয়া লইতে পারিতাম যে, তাঁহার ধর্ম্মদ্রোহী ও সম্ভোগবিষয়ক কবিতাগুলি যৌবনকালের এবং ভগবৎ-বিশ্বাসমূলক কবিতাগুলি পরিণত-বয়সের রচনা। কিন্তু শহরস্তানীর বিবরণ দৃষ্টে এরূপ অনুমান যেমন অসঙ্গত, ওমর খৈয়ামের কাব্য-পরিচয় হইতেও এরূপ ধরিয়া লওয়া তেমনিই কঠিন। তিনি আগাগোড়া নিজের এই পরিচয় দিয়াছেন যে, দুটি বিরোধী মতের মাঝখানেই তিনি দোদুল্যমান। উদাহরণস্বরূপ নিম্নলিখিত রুবাইটি উদ্ধৃত করা যাইতে পারে—

ওমরের রুবাই কোন সময় রচিত

এক হাতেতে কোরান কেতাব; অন্য হাতে মদ্য নিয়ে,
মন্দ-ভালর মধ্যপথে দাঁড়িয়ে গেছি থম্ থমিয়ে।
সুনীল আকাশ দেখছে মোরে কলঙ্কী এক মুসলমান
দাঁড়াইনিকো যদিও ঠিক অধার্ম্মিকের পথে গিয়ে।"

বিচ্ছিন্নভাবে না দেখিয়া ওমরের এই পরস্পর-বিরুদ্ধ রচনাগুলিকে যদি ইতিহাসের আলোকে দেখা যায় এবং সেই সঙ্গে তাঁহার মনের আভিজাত্য ও আবেষ্টনের বিদ্বজ্জন মণ্ডলীর কথা স্মরণ করা হয়, তাহা হইলে ঐ বিরোধের অপেক্ষাকৃত সন্তোষজনক কারন হয়তো ধরা পড়ে। যৌবনে ওমর সুফী-ভাগবত ইমাম মওয়াফিক উদ্দিনের চরণতলে বসিয়া জ্ঞানচর্চ্চা করিয়াছিলেন। ইনি যে সম্পূর্ণরূপে "একমেবাদ্বিতীয়ের" অথবা মহম্মদীয় ভাগবদ্বিজ্ঞানের ভাষায় "একমাত্র যথার্থ নিয়ামকের"

ধারণায় অনুপ্রাণিত ছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সর্ব্বত্র ও সকল কার্য্যে এক অদ্বৈত সর্ব্বশক্তিমানেরই ক্রিয়ার বিকাশ উপলব্ধি করিতে যে-সকল চিত্ত অভ্যস্ত, তাহাদের মধ্যে যে প্রকৃতি ইচ্ছাশক্তি বা জগতের পাপ তাপের জন্য দায়ী অপর কোনো দ্বিতীয় কর্ত্তার স্থান থাকিবে না ইহাই স্বাভাবিক; যেহেতু ঐ "একমাত্র যথার্থ নিয়ামকই" তাহাদিগের মতে সকল ব্যাপারের দায়িত্ব স্বীকারে বাধ্য। ইহুদী রাজা সলোমনও বলিয়াছিলেন যে, অন্যায় ও অবিচারই জগতে চিরজয়ী হইয়া চলিতেছে। কারণ, ভগবান (জিহোভা) সমস্ত ব্যাপারকেই বাঁকা করিয়া দিয়াছেন এবং তাহাদিগকে সোজা করিবার সাধ্য কাহারও নাই।

ইসলাম-ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই এবং অদ্বিতীয় সর্ব্বনিয়ন্তার কার্য্যে পাপের অস্তিত্ব সমস্যা মোসলেম ভাগবতগণকে পীড়িত করিতে আরম্ভ করে। তদুপরি পূর্ব্ব-বিধান (Predestination) তথ্যের প্রয়োগে ঐ সমস্যা তাঁহারা আরও বেশী ঘোরালো করিয়া তুলেন। তাঁহাদিগের তর্ক-বিতর্কের একটি মূল বিষয় এই দাঁড়াইয়াছিল যে - ঈশ্বরের সুবিচার ও করুণার সহিত তাঁহার ঐ পূর্ব্ব-জ্ঞান বা প্রাক্‌বিধানের সমন্বয় কেমন করিয়া ঘটানো যায়। কি হিসাবে তিনি যন্ত্রবৎ প্রয়োজনীয়তার খাতিরে একজনকে উচ্চ, অপরকে হীন করার প্রাক-বিধি প্রয়োগ করিতে, অথবা যাহা সত্যই ঘটে তাহা ছাড়া অপর কোনো ঘটনার ভাবী সম্ভাবনা নিরোধ করিতে পারেন। ওমর খৈয়ামের অদ্বৈত-বুদ্ধিও তাঁহাকে এই সমস্যায় ফেলিয়াছিল বলিয়াই বারংবার তিনি এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছেন। তবে ইহুদী রাজার মত গম্ভীর মন্তব্য প্রকাশ না করিয়া, তিনি নিতান্তই লঘুভাবে এটিকে তাঁহার রঙ্গ-কৌতুকের বিষয় করিয়া তুলিয়াছেন।

অপরপক্ষে, সুফী প্রভাবও যে তাহাকে স্পর্শ করিয়াছিল তদ্বিষয়ে

সন্দেহ নাই। পারস্য-প্রতিভার কেন্দ্রভূমি খোরাসানে জন্মগ্রহণ করিয়া তিনি যে মোসলেম দার্শনিক অল্-কিন্দী, অল-ফ্যারাবী, আবুসিনা ও ইবনে রোশদ্ প্রমুখ সুবিখ্যাত দার্শনিকগণের মতবাদের সহিত সুপরিচিত ছিলেন, তাহা বলাই বাহুল্য। দর্শনচর্চ্চার ফলে সংশয়বাদী হওয়া এবং সুফীভাবাভিষিক্তহও য়ার ফলে, ভগবদ্-নির্ভর মনোভাবের অধিকারী হওয়া তাঁহার পক্ষে যেমন সম্ভব, তেমনি স্বাভাবিক।

রসিকতা ও রঙ্গ-কৌতুক

ওমরের কবি-প্রতিভার একটি বিশেষ স্ফূর্ত্তির দিক তাঁহার রঙ্গ-কৌতুক ও রসিকতায়।—জাতি হিসাবে পারসিকেরা প্রায়ই মজলিসী ও রসালাপ-নিপুণ এবং তাহাদিগের মধ্যে প্রচলিত গল্প-নাটকাদির ভিতর দিয়া বেশ একটি হাসির স্রোত প্রবাহিত দেখা যায়। কিন্তু এই জাতির কাব্য-কণিকায় হাসির সুর বিরল হওয়া সত্ত্বেও ওমরের চতুষ্পদীর এইটিই যেন "জান্"। অনেক স্থলে মনে হয়, যেন জোর করিয়াই কবি আপন স্বভাবকে নিঙড়াইয়া নিঙ্ড়াইয়া একটা অদ্ভুত রকমের কিছুতে দাঁড় করাইতে চাহিয়াছেন—যেন বা নিজের একটা কৃত্রিম চরিত্রই লোকচক্ষে ধরিয়া দেওয়া খুব মজার জিনিষ মনে করিয়াছেন। উদাহরণস্বরূপ দু'-একটি কবিতা উদ্ধৃত করা গেল :—

"স্বর্গপুরীর হর্ম্ম্যে না কি দেদার হুরি বসত করে
সেথায় না কি অঢেল সুরার উর্ম্মিমুখর ঝর্ণা ঝরে ;
পুণ্যবানের কাম্য ভূমির মর্ম্ম যদি এমনতর—
দোষ কি তবে বরণ করার আগেই এদের মর্ত্ত্য "পরে ?"

অন্যত্র—

"অন্য বুদ্ধিমানের মতই, সত্য বটে মত্তটা খাই,
কারণ, আমি ভালই জানি, খোদার তাহে আপত্তি নাই ;

কালের যখন হয়নি জনম, তখনও তাঁর ছিল জানা
করবে ওমর মদ্য সেবন; আমি কে—সেই প্রজ্ঞা-এড়াই।"

* * *

"মদ্যপেরে দোষ দিও না সয় না যাদের মদ্য খেলে,
আমিও হতুম্ পান-বিরোধী জগন্নাথের আশীষ পেলে,
নিজের মাঝে তলাও যদি, দেখবে তবে ধর্ম্মাবতার
তোমার গোপন পাপের পাশে মাতালরা সব দুধের ছেলে।"

কবির রঙ্গ-রসিকতা শুধু যে তাঁহার কোরানের প্রতি কটাক্ষ বা ভণ্ডামী বা বুজরুকীর প্রতি ব্যঙ্গোক্তিতেই প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা নহে। ইহা ততোধিক— ইহা যেন জীবন-মৃত্যু সম্বন্ধেও তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গী নিম্নোদ্ধৃত কবিতাটির লক্ষ্যস্থানীয়—

"ধৌত করো মদ্য ধরায় যখন আমার মরণ হবে
নিখুঁত করো ঔর্দ্ধদেহিক সুরেশ্বরীর একটি স্তবে,—
নেহাৎ যদি খোঁজ পড়ে মার শেষ বিচারের সাজার লাগি"
পানশালার এই ভিতের নীচে কবরটা তো বেঁচেই রবে।"

অন্যত্র এই একই রঙ্গের রংমশাল অন্যভাবে জ্বলিয়াছে—

"বাড়িয়ে দিয়ে নিজের গলা আমার সুরার বাঁধন পরি,
উজল তাহার হাসির লোভে জীবনটাকেও তুচ্ছ করি;
ইতরজনে শোষণ করে সুরা দেবীর জীবন-শোণিত
লোলুপ করে বোতলখানার মরাল গ্রীবা মট্‌কে ধরি।"

নেশাখোর মাতালশ্রেণীর সহিত ওমরের সুরা-বিলাসের পার্থক্য খুঁজিতে চাহিলে উদ্ধৃত চতুষ্পদীটি পাঠকের কাজে লাগিতে পারে। কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-বিচারপরায়ণ তার্কিকদের বিদ্রূপ করিয়া ওমর এ সম্বন্ধে অন্যত্র বলিয়াছেন—

"মদিরা পান দোষের, তবে সাবধানেতে সঙ্গী বাছো
চিন্তা ক'রো তুমিই বা কে, ওই বা কে যার প্রসাদ যাচো,
পানটি ক'রো স্বেচ্ছাসুখে ; এ তিন দফায় বিধান মেনে
বিষম রকম বিজ্ঞ ছাড়া মদিরা কা'র রুচবে আঁচো ?"

এ বিষয়ে আর উদাহরণ বাড়ানো অনাবশ্যক। রুবাইয়ের পর রুবাই এইরূপ চাপা হাসির দীপ্তিতে উজ্জ্বল। প্রকৃতপক্ষে, এই রঙ্গ-প্রিয়তাই কবি ওমর খৈয়ামের রচনাবলীর প্রাণস্বরূপ।

আসল কথা, চন্দ্রে কলঙ্কের মতন একাদশ শতাব্দীর পারসিক প্রজ্ঞার জীবন্ত বিগ্রহ ওমর খৈয়ামের চরিত্রে এ সকল ত্রুটী আমরা উপেক্ষার চক্ষেই দেখি—কিন্তু উহার অস্তিত্ব অস্বীকার করি না। কবি স্বয়ংও এ বিষয়ে কোন প্রকার ভাণ করেন নাই।

সুরা ও সাকী-প্রীতিই অবশ্য ওমরের কবি-প্রতিভার সর্ব্বস্ব নহে। তাঁহার জগৎ-জোড়া কবি-যশের কারণ অন্যত্র খুঁজিতে হইবে। চির-রহস্যময় জীবন-মরণের সমস্যা, ভগবান ও অমরতা, ইহজগৎ ও পরলোক প্রভৃতি গুরুতর বিষয়সমূহও তাঁহার কাব্যের উপাদানরূপে গৃহীত হইয়াছে—কিন্তু স্বভাবতঃ একটি স্বাধীন ও লৌকিক-প্রথা-নিরপেক্ষ চিত্তের অধিকারী হওয়ায়, ঐ সকল সমস্যার যেরূপ সিদ্ধান্তে তিনি উপনীত হইয়াছেন, তাহা, তৎকালীন প্রতিষ্ঠিত মতামত ও সাধারণ ধর্ম্মবিশ্বাসের বিরুদ্ধে স্পষ্টই যেন সংগ্রাম ঘোষণা করিয়াছিল। তাঁহার দার্শনিক মতিগতি দুঃখবাদ-প্রবণ হওয়ায়, প্রথমতঃ উহা সংশয়ে দুলিতে থাকে এবং ক্রমে ভগবৎ-বিধিকে যেন অস্বীকার করিতেই উদ্যত হয়। মানুষের জীবন-পরিচালনায় কোনো করুণাময় ভগবানের কল্যাণ-হস্ত অপেক্ষা কঠোর ভাগ্য ও অন্ধ অদৃষ্টই তাঁহার চক্ষে অধিক করিয়া পড়ে। সেই জন্যই স্বভাবতঃ পরলোক

ওমরের চিন্তা-ধারা ও স্বাধীন মতবাদ

অপেক্ষা ইহলোক এবং ভবিষ্যৎ অপেক্ষা বর্ত্তমানই তাঁহার অধিকতর আলোচ্য হইয়া উঠে। এককথায়, তাঁহার চিন্তার গতি সাধারণ গ্রাহ্য মোসলেম ধর্ম্ম-বিশ্বাসের সম্পূর্ণ পরিপন্থী হইয়া পড়ে। একমাত্র এই কারণেই, পারস্য সাহিত্যে হাফিজ ও ফির্দৌসীর নাম বারংবার সসম্মানে উল্লিখিত হইলেও, ওমরকে বহুকাল অবজ্ঞাতই থাকিতে হয়। ওমরের মৃত্যুর এক শত বৎসর পরে লিখিত নজমউদ্দিন রাজীর 'মিরসাদ উল-এবাদ" নামক সুফী ধর্ম্মব্যাখ্যানমূলক পুস্তিকায় ওমরের বিরুদ্ধে যে মন্তব্য আছে, তাহা হইতে বুঝা যায়, কোরানের আলোকে যাঁহারা জগৎ-সংসার দেখিতেন, ওমরের বিরুদ্ধে তাঁহারা কিরূপ খড়্গহস্ত হইয়াছিলেন। সে মন্তব্যটি এখানে উদ্ধৃত হইল—

"নির্ম্মল, সমুন্নত ও অপার্থিব আত্মাকে সঙ্কীর্ণ পার্থিব আধারে আবদ্ধ করিয়া পুনরায় ঐ ছাঁচ হইতে বিচ্ছিন্ন করার মূলে যে কি গভীর জ্ঞান বিদ্যমান, তাহা সুপরিজ্ঞাত। দেহকে ধ্বংস করিয়া শেষ বিচারের দিন উহার উপাদানগুলিকে বিক্ষিপ্ত ও আত্মাকে প্রাণবন্ত করিয়া তোলার উদ্দেশ্য যে মানুষকে "কোরান-নির্দিষ্ট ভ্রান্তি"(১) এড়াইতে সাহায্য করা এবং যাহাতে "অজ্ঞানের যবনিকা"(২) পার হইয়া তাহারা আপন আপন রুচি ও অনুরাগকে সত্যপথে চালিত করিতে পারে, তজ্জন্য তাহাদিগকে মনুষ্যত্বের উচ্চতর সোপানে উন্নীত করা, ইহাও সকলের জানা আছে। কিন্তু, যে সমস্ত হতভাগ্য দার্শনিক ও জড়বাদী এই করুণাযুগল হইতে বঞ্চিত এবং মতিভ্রষ্ট, তাহারা এমন এক মহামনীষীর সহিত নিরুদ্দেশ

১। "তাহারা জানোয়ারের দল—না—বুঝিবা তাহা অপেক্ষাও ভ্রান্ত'—সুরা ৭।৭।১৭৮।

২। তাহারা বর্ত্তমানের বাহ্য দিকই দেখে, কিন্তু ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিতান্ত অন্ধ। সুরা ৩০।৫।৬।

হইয়া গিয়াছে, যে আপন প্রতিভা, বিদ্যাবত্তা, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও বিজ্ঞতায় তাহাদের মধ্যে সুবিখ্যাত ছিল। সেই মনীষীর নাম ওমর খৈয়াম। সে যে কত বড় নির্লজ্জ ও নষ্টমতি, তাহার পরিচয় পাইতে হইলে তাহার রচিত বক্ষ্যমান শ্লোক দু'টিই পর্য্যাপ্ত হইবে—

"দেখছো যে এই গোলকখানা, মোদের আগম-নিগম গড়া
কোথায় এটার আরম্ভ আর কোথায় বা শেষ যায় না ধরা,
কেউ পারে না এই জগতে,— বাৎলে দিতে সহজ কথায়
কোত্থেকে হয় হেথায় প্রবেশ, কোথায় বা যায় বেরিয়ে পড়া।"

* * * *

"স্রষ্টা যখন দিয়েছিলেন স্বভাবগতি নির্দ্ধারিয়া
হ্রাসের এবং নাশের অধীন করাটা তার কেমন ক্রিয়া?
কুরূপ যদি ইহার গঠন,—দায়ী কে সে খুঁতের লাগি?
নিখুঁত যদি—ধ্বংস করা কেনই বা ফের বও তো মিঞা?"

কিন্তু নজমউদ্দিন রাজীর নিকট কোরানের গভীর জ্ঞান যতই

কোরানের অসঙ্গতি

সুপরিজ্ঞাত হউক না কেন, ওমর খৈয়াম অবশ্য উহার গোড়ার কথাই মানিয়া লইতে পারেন নাই। মানুষের সকল কর্ম্মের প্রাক্-বিধান যে গ্রন্থ প্রচার করিতেছে, সে আবার মানব-স্বভাবের "ভ্রান্তি" "অজ্ঞান" প্রভৃতির কথা তোলে কেন? সে গ্রন্থের প্রতিপাদ্য ভগবানের "করুণা" হইতে কোনো কোনো "হতভাগ্য" বঞ্চিতই বা হয় কেন? নিজেদের দোষে? একই বিশ্বাসে "প্রাক-বিধান" ও 'মানুষের দায়িত্ব" স্বীকার করায় মুসলমান ধর্ম্মশাস্ত্রে যে যুক্তি-বিরোধ প্রকাশ পাইয়াছে, ওমরের দার্শনিক চিত্ত তাহা লক্ষ্য না করিয়া থাকিতেই পারে নাই; সুতরাং এ হেন শাস্ত্রের অন্ধ দাসত্বে তিনি কোনো সান্ত্বনাও পান নাই। ইহা খুবই সম্ভব যে

তৎকালীন মোল্লা সম্প্রদায়ের বুজরুকি ও লোক-দেখানো ধার্ম্মিকতার ক্রিয়া-পদ্ধতি তাঁহার মনকে নিতান্তই তিক্ত করিয়া তুলিয়াছিল—অন্ততঃ তাঁহার জিজ্ঞাসু চিত্তকে ধর্ম্মান্ধ ইমামদিগের বাহ্য ধর্ম্মাচরণের বা সুফীদিগের রহস্য-গূঢ় সঙ্কেতের ভেল্কির সাহায্যে অভিভূত করা নিশ্চয়ই সম্ভব ছিল না। প্রচলিত সুফী দর্শনের মধ্যে তৃপ্তি পাইতে অথবা কোরানের অপৌরুষেয়ত্বের বিষয়ে নিঃসংশয় হইতে না পারিয়া এবং এতদুভয়ের ভিতর জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কোন গ্রহণযোগ্য অর্থারোপের চেষ্টাই না দেখিয়া তিনি তৎকালীন ধর্ম্মবিশ্বাস হইতে স্খলিত হইয়া পড়েন। কিছুই তাঁহাকে জীবমৃত্যুর বিপুল রহস্যভেদে সাহায্য করিতে না পারায় তিনি বিশ্বাসের আলোকিত দিকে আসিতে অক্ষম হন এবং বারংবার তিক্ত অনুশোচনায় এই বলিয়াই আর্ত্তনাদ করেন যে, জ্ঞানার্জ্জনের জন্য সমস্ত হৃদয় পাতিয়া দিয়াও এইটুকুমাত্র তিনি দেখিতেছেন যে, জগতে তাঁহার আগমনও যেমন উদ্দেশ্যহীন হইয়াছে, এখান হইতে নিষ্ক্রমণও সেইরূপই হইবে—

"বিশ্বভুবনখানির কোলে কোত্থেকে বা কোন্ কারণে
কিছুই নাহি বুঝতে পারি আসছি ভেসে স্রোতের টানে;
শূন্য করি এ কোল আবার দমকা-হাওয়ার ঘূর্ণি বেগে—
বেরিয়ে যাবো কোথায়, কেন—পাইনে রে তার কোনই মানে।"

পানোৎসব বা জীবনের আমোদ-প্রমোদে তাঁহার অন্তরের বেদনাময় শূন্যস্থান পূর্ণ হইবার নহে; ফলে প্রাণের ঔৎসুক্য পরিতৃপ্ত করিবার উপায়াভাবে তিনি নিতান্তই অসুখী ও অশান্ত। হৃদয় বিশ্বাসপূর্ণ অথচ ঐশী নিয়মকে ধরা-ছোঁয়া চলিতেছে না—এই ঘটনাই তাঁহাকে উত্তেজিত ও ক্লিষ্ট করিয়া তুলিয়াছে, তাঁহার অবীত জগৎসমূহের মধ্যে মানুষের চিন্তা, অনুরাগ ও উদ্দেশ্যমূলক জগৎটি মাত্রই তাঁহার নিকট সর্ব্বাপেক্ষা সত্য—অথচ 'কোথা হইতে" "কি জন্য" বা "কোন্খানের" সমস্যা-সমাধানে

মানব চিত্ত যে শক্তিহীন, ইহা তাঁহার অসহ্য। জীবনের প্রতি বিস্ময়-দৃষ্টিপাত ছাড়া ইহা হইতে তাঁহার অন্য কোন লাভেরই আশা নাই। তাঁহার আসায়, বাঁচিয়া থাকায়. বা যাওয়ায়, কোন সম্ভাব্য উদ্দেশ্যের ভরসা কোনো দিকেই দেখা যাইতেছে না। এরূপ অবস্থায় তাঁহার সমসাময়িক অনেকেই হয়তো রহস্যবাদকেই চরম আশ্রয়-ভূমি করিয়া লইতে পারিত, অথবা তাহাই লইয়াছিল।—আবার কেহ বা হয়তো ভগবৎ-নির্দ্ধারিত নিখিল চরাচরের নিত্যকালীন সম্বন্ধের উপর ইসলামধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা ঘটে নাই জানিয়াও একটা লৌকিক ধর্ম্ম-ভাণকেই আশ্রয় করিয়া খুসী থাকিতে পারিত; কিন্তু ওমরের স্বচ্ছ বিবেক-বুদ্ধি, এবং নিজের নিকট খাঁটি হৃদয় উক্ত পন্থা-যুগলের কোনটিকেই অনুমোদন করে নাই।

আলোকের জন্য ওমরের গভীর অনুসন্ধিৎসার মূলে এই ধারণাই দৃঢ় ছিল যে, মানব মনীষার এমন কোন শক্তি থাকিতে পারে না, যাহা ভগবানের দেওয়া নহে, অথবা এমন কোন স্বাস্থ্যকর প্রবণতাও থাকিতে পারে না যাহা স্রষ্টার দান নহে। সুতরাং তাঁহার চিত্তের যে অনুসন্ধিৎসা, একমাত্র ভগবানই তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে তৃপ্ত করিতে পারেন। যদি ভগবানের দেওয়া এই মানব বুদ্ধি ভগবানের উদ্দেশ্য বুঝিবার পক্ষে তাহার একটুও সহায় না হয়—অথচ এই উদ্দেশ্যটি বুঝিবার জন্যই ওমর খৈয়াম সর্ব্বান্তঃকরণে ব্যগ্র—তবে মানুষকে উহার অধিকারী করা কেন?

বিশ্বগ্রন্থ ও ওমর খৈয়াম

জগৎসংসার একটি সুনিয়মিত উদ্দেশ্যজাল বিস্তার করিয়া চলিয়াছে এবং এই কার্য্য সাধন করিতে করিতে, যাহারা শুনিতে জানে, তাহাদিগকে যেন বলিয়াও চলিয়াছে যে, এ সমস্তের ভিতর এমন একটি আত্মা বিরাজমান—যাহা সমস্তই জানিতেছে, সমস্তই বিবৃত রাখিয়াছে। যাহারা দেখিতে জানে, তাহারা বিশ্ব-প্রকৃতির অন্তরে যেন একটি

ব্যক্তিত্বেরই সন্ধান পায়, জগতের সুশাসিত ও ধারাবাহিক অবস্থাটি তাহাদিগকে যেন ইহার কোনো স্রষ্টা বা চালকের অস্তিত্ব স্বীকারেও অনুপ্রাণিত করে। মানবাত্মা স্বতঃই একটি উচ্চতর আত্মার সঙ্গ খুঁজিয়া বেড়ায় এবং প্রকৃতিকেই প্রকৃতির অন্তর্নিহিত ভগবান অন্বেষণের একটি উপায় হিসাবে গ্রহণ করিতে চায়।

ওমর খৈয়াম নিজেকে বিশ্ব-প্রকৃতির বিবিধ প্রয়োজনীয় ও নয়নাভিরাম রূপরাজির মধ্যে অধিষ্ঠিত দেখিতেছেন—এত সুন্দর ও প্রয়োজনীয় যে তাহার মধ্যে অপর উদ্দেশ্যও নিহিত না থাকিয়া পারে না; অথচ তাহারা এতই বিচিত্র যে মানব-চিত্তের ধারণা-শক্তি উহাদিগকে আয়ত্ত করিতেও অক্ষম। বিকশিত গোলাপগুচ্ছ, বীণাকণ্ঠ বুলবুল, নদী-তটস্থিত উদ্যান, বহু সন্তানের গরীয়সী জননী ধরিত্রী, গর্জনালোড়িত সাগর, সীমাহারা নীলাকাশ, অসংখ্য উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক এবং সর্ব্বশেষ মানব স্বয়ং, এই সমস্তই এমনি একটি নিগূঢ় অস্তিত্বের আভাস প্রদান করিতেছে, যাহা সমস্তকেই ভরিয়া রাখিয়াছে, সমস্তকেই এক সম্বন্ধ সূত্রে বাঁধিয়াছে। কি উদ্দেশ্যে এই বিশাল বহির্জগৎ উন্মুক্ত গ্রন্থখানির মত পাঠক আকর্ষণ করিতেছে? উদ্দেশ্য আরোপে অনভ্যস্ত সুফী-পদ্ধতির প্রতিকূলে ওমর এ সমস্তের অন্তর্নিহিত কারণ আবিষ্কার করিতে চাহিয়াছেন, একটি উদ্দেশ্যময় পরিকল্পনাকে হিসাবের ভিতর ধরিয়া পাইবার আশা রাখিয়াছেন এবং সেই গূঢ় অভিসন্ধিটি ব্যক্ত করিবার জন্য বারংবার ভগবানের উদ্দেশ্যে দরবারও করিয়াছেন। মানুষের অসম্পূর্ণ শক্তি যে পরিণতিসম্ভাবনাহীন বীজের অনুরূপ হইতে পারে, এরূপ ধারণা তিনি করিতেই পারিতেন না। মানুষের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য যদি উচ্চ ও পবিত্র হয়, তবে চিরন্তন ঐশী নিয়ম কেন না তৎসমূহের উপযোগী করিয়া সংঘটিত হইবে। কিন্তু জীবনে তিনি কি দেখিতে পাইতেছেন? জগতে

কে যেন তাঁহাকে ছুট করাইয়া আনিল, আবার তেমনি ছুট করাইয়াই জগতের বাহির করিয়া দিল—তাঁহাকে পছন্দ-অপছন্দের কোনো অবকাশই দিল না; তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনখানির অভিপ্রায় স্পষ্ট হইতে না-হইতেই জগৎ-জীবন হইতে তাঁহাকে ছিঁড়িয়া ফেলা হইল। কখনও আপনার দৌর্ব্বল্যের, কখনও বা শক্তির অনুভূতি ঘটিতেছে, অথচ এই পরস্পরবিরুদ্ধ ভাবের অধিকার থাকার সহিত ভগবৎ-মর্য্যাদার যোগা-যোগটি বুঝিয়া পাওয়া যাইতেছে না বলিয়াই তাঁহার সমস্ত অন্তরাত্মা কাতর। ফলে, ব্রহ্মাণ্ডের নিয়মের ভিতর মারাত্মক অপূর্ণতাই তিনি দেখিতেছেন—তবু এইটুকুই বুঝিতেছেন না যে নিজে সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বদর্শী না হইলে এরূপ অসম্পূর্ণতার অভিযোগ অসঙ্গত; যেহেতু সীমাবদ্ধ মানব কেমন করিয়া সীমাতীতের ধারণা আশা করিতে পারে? তবে, ঐশী নিয়মের কল্পিত ত্রুটির বিরুদ্ধে তাঁহার আপত্তি প্রকাশের ভিতর কোনরূপ অশ্রদ্ধা বা রূক্ষ নাস্তিকতার যে আভাসমাত্রও দেখা দেয় নাই, এইটুকুই ওমর খৈয়ামের বৈশিষ্ট্য।

"কারে শুধাই— এই দেশেতে এলাম ছুটে কোত্থেকে সে?
কারে শুধাই— এ দেশ থেকে যাবেই বা কোন নিরুদ্দেশে?
পাত্র ভরি' পুনঃপুনঃ নিষিদ্ধ ঐ সুরার ধারায়
ডুবাও স্মৃতির বেয়াদবি—ভাবনা-ভীতি যাক্ রে ভেসে।"

ভগবানের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ

পৃথিবীতে আসা-যাওয়ার উপর যখন নিজের কোনই হাত নাই এবং গোলকধাঁধাগুলির সমস্যা-সমাধানেরও কোনো সম্ভাবনা নাই, তখন সাকীর নিকট পিয়ালার দাবী করাই মন্দের ভাল। মনুষ্যদের নিকট আত্ম-প্রকাশের ভিতর দিয়া আল্লা যখন সুরার বিরুদ্ধে নিষেধ-বিধিই প্রচার করিয়াছেন, অপরপক্ষে, মানুষের আত্মতৃপ্তিরও সুব্যবস্থা করিবার জন্য

বিশেষ উদ্‌গ্রীব নহেন—তখনি ভগবানের চক্ষে যাহা মন্দ ও নিষিদ্ধ, তাহাই সর্ব্বাগ্রে গ্রাহ্য করিয়া প্রতিশোধ লওয়া ছাড়া আর কর্ত্তব্য কি? ক্ষণিক-উল্লাসের ভিতর দুশ্চিন্তাগুলি যত ডুবাইয়া রাখা যায়, ততই ভাল। ইহা খুবই সম্ভব যে আইন ভঙ্গ করার উগ্র আমোদ ছাড়াও, ভাবসাধকদের দশা-প্রাপ্তির চেষ্টাকে বিদ্রূপ করাও ওমরের উদ্দেশ্য। উপবাস ও নিদিধ্যাসনের ফলে যে অবস্থা তাঁহারা লাভ করিতে চান, ওমর যেন এই নিষিদ্ধ সেবন-উল্লাসের সাহায্যেই তাহা প্রাপ্ত হইতে পারেন। সুফীরা যেমন ঈশ্বরের সহিত যোগসাধনের উপযোগী একটি বিশেষ অবস্থার অনুশীলন করিয়া থাকেন, ওমরও তেমনি ঈশ্বরকে আমলে না আনিবার জন্য সেই একই অবস্থা লক্ষ্য করিবেন। ভাবপন্থিগণের অভ্যাসের হাস্যজনক অনুকরণে তিনি যেন ভাব-সাধনা-ব্যাপারটিকেই হাসিয়া উড়াইবেন। ব্যঙ্গ, বিদ্রোহ ও হতাশাময় অভিব্যক্তির ভিতর দিয়া সেই ভগবৎ অস্তিত্বেরই নিশ্চয়তার জন্য অধিকতর ব্যগ্রতা তাঁহাকে দগ্ধ করিতেছে, যে ভগবানকে অন্তভাবে অনাকাঙ্ক্ষিত মনে করিয়াও তিনি সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জন করিতে অক্ষম। নৈরাশ্যের প্রচার-বাণীতে বা দুঃখের পীড়নে যে বিষাদ-গীতি বাজিয়া উঠে নাই, ওমরের এই দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ বিদ্রোহী আত্মা তাহা ধ্বনিত করিয়া তুলিয়াছে।

"ভুবন হ'তে বাজিয়ে সপ্ত-স্বর্গ-তোরণ-বিজয়-ভেরী,
ঊর্দ্ধলোকে শনৈশ্চরের সিংহাসনও এলাম ঘেরি;
গমন-পথে কতই না সে রহস্যজাল ছিন্ন হ'ল;
খুললো না কো শক্ত বাঁধন কেবল যা' এই অদৃষ্টেরি।"

ওমরের রুবাইগুলিতে সপ্ত তোরণ বা সপ্ত স্বর্গের উল্লেখ বহুবার দেখা যায়। ঊর্দ্ধতম স্বর্গে—তপোলোকে—ঈশ্বরের আসন রক্ষিত এবং ওমর খৈয়াম উপবাস ও প্রার্থনার সাহায্যে নিজেকে এই স্বর্গে উন্নীত করিয়া-

ছিলেন। আমরা দেখিয়া আসিয়াছি যে, চিত্তের একটি বিশেষ প্রকার ভাবান্তর সংগঠনের দ্বারা ভগবানের সহিত ঐহিক যোগ-সাধনের সম্ভাবনায় বিশ্বাস ভাব-সাধন-প্রণালীগুলির অঙ্গীভূত। বেদান্ত, অবশ্য, এই যোগ দু'টি বিভিন্ন অস্তিত্ব হিসাবে ভগবানের সহিত মানবের যোগ বলিয়া স্বীকার করেন না—বরং মানুষের যথার্থ স্বরূপেরই পুনঃপ্রাপ্তি বা ঈশ্বরত্বে মানুষের বিকাশ বলিয়া মানেন। তাঁহার মতে মায়িক অজ্ঞানবশতই এই স্বরূপ বুদ্ধি লুপ্ত বা সুপ্ত হইয়া থাকে। জ্ঞানানুশীলনের ভিতর দিয়া ওমর খৈয়ামও এক অজ্ঞাত উপায়ে ভগবৎ-সান্নিধ্যলাভ করিয়াছিলেন। সে রহস্যময় ভাব-মিলন দেহ-বন্ধের ভিতর হইতে বা দেহের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া, তাহা ওমর খৈয়াম বলিতে পারেন না। তবে এটুকু তিনি জানেন যে, অনেক মিথ্যার ও ভ্রমের বন্ধন তাহাতে ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল এবং বহু বাধাবন্ধও তাহাতে দূরে সরিয়া গিয়াছিল। একটি পরমানন্দময় মিলনানুভূতিতে ক্ষণকালের জন্য তাঁহার আকারগত অস্তিত্ব যেন লয়প্রাপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু তিনি যেরূপ আশা করিয়াছিলেন, সে মিলনের ফল সেরূপ হয় নাই। চরমতম রহস্যটির মর্ম্মোদ্ধার করিতে পারিবার পূর্ব্বেই পৃথিবীতে তাঁহাকে প্রত্যাবৃত্ত হইতে হয়—সে রহস্য জীবনের, মৃত্যুর শাশ্বত-পুরুষের।

ভগবৎমিলন লাভের চেষ্টা

"দেখনু সে এক রুদ্ধ দুয়ার—গেল না তার চাবিই পাওয়া,
দুল্‌ছে কি এক কুহেলী-জাল যাহার পারে যায় না চাওয়া,
মুহূর্ত্তকাল "তোমার" "আমার" একটি দু'টি ক্ষণিক কথা—
তাহার পরে দোঁহার মাঝে বিস্মরণের বইল হাওয়া।"

সূফী অদ্বৈতবাদ

যে যবনিকা রহস্যরাজিকে আচ্ছন্ন করিয়া লম্বমান, তাহার আড়াল হইতে তোমার

আমার একটু আলাপ ঘটিল—তারপর কোথায় তুমি—কোথায় আমি !

এই রুবাইটির যথার্থ তাৎপর্য্য বুঝিবার জন্য সুফী-কবি ফরিদ উদ্দীন আত্তর হইতে দু'টি উদ্ধৃতি দিয়া ইহার উদ্দিষ্ট অদ্বৈতবাদকে কতক পরিমাণে বোধগম্য করা যাইতেছে।

"রহস্য-যবনিকা পার হইতে জগৎ-স্রষ্টা দায়ুদকে বলিলেন,—তুমি আমার প্রতীক মাত্র, যদি ইহা সেই আমি না হই, যাহার প্রতীক বা সমকক্ষ তুমি খুঁজিয়া পাইবে না। যেহেতু কিছুতেই আমার বিনিময় হইতে পারে না, সেজন্য আমাতেই বাস করা বন্ধ করিও না। আমিই তোমার অন্তরতম আত্মা; আমা হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিও না। আমি অনিবার্য্য, তুমি আমার আশ্রয় সাপেক্ষ, আমা হইতে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব কামনা করিও না।"

"নিরবধিকাল আমিই তুমি এবং তুমিই আমি—আমরা উভয়েই এক। তুমিই আমি হও অথবা আমিই তুমি হই, এ ব্যাপারে কোনো দ্বৈত আছে কি? হয় আমিই তুমি এবং তুমিই আমি, কিম্বা তুমি, স্বয়ং তুমিই। চিরদিনই যখন তুমিই আমি ও আমিই তুমি, তখন আমাদের দু'টি দেহ একই। এই শেষ কথা।

এটি ভগবানের সহিত মিলনের, সুফী মতবাদসুলভ একটি উদাহরণ এবং ভারতীয় বৈদান্তিক মতই ইহার উৎস। ওমর খৈয়ামের জন্মের বহু পূর্ব্ব হইতে খোরাসানে বৈদান্তিক মত কয়েক শতাব্দী ধরিয়া প্রসার লাভ করিয়াছিল। বেদান্তের বাণী পারস্যের জনসাধারণের মনে বদ্ধমূল হইয়াছিল। বৈদান্তিক মতের সহিত ওমর খৈয়াম নিশ্চয়ই সুপরিচিত ছিলেন এবং সম্ভবতঃ উভয় পদ্ধতির মধ্যেই সত্যান্বেষণের চেষ্টাও করিয়াছিলেন। ভারতীয় উপনিষদের জ্ঞানাভাসও ওমরের

অনেক চতুষ্পদীতে স্পষ্ট লক্ষিত হয় এবং ছান্দোগ্য উপনিষদের "তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো"র আনুষঙ্গিক উপদেশগুলি হইতেও প্রাচ্য অদ্বৈতবাদের মূল কথাটি এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যাইতে পারে। আপন স্বাতন্ত্র্য ঘুচাইয়া পুনরায় ভগবানে পরিণতি লাভের জন্য, সাধকের আত্মহারা হওয়ার ঐকান্তিক লক্ষ্যের দৃষ্টান্ত জলাল উদ্দিন রুমির প্রদত্ত এক উপভোগ্য উদাহরণ হইতে স্পষ্ট করিতেছি—

"একজন প্রিয়তমের (ঈশ্বরের) দ্বারে আসিয়া করাঘাত করিতে লাগিল। ভিতর হইতে প্রশ্ন হইল, "দুয়ারে কে?" আগন্তুক উত্তর করিল,—"আমি।" ভিতরের স্বর বলিল—"এ বাড়ীতে তোমার ও আমার উভয়ের স্থান নাই।" দ্বার খুলিল না।"

অত:পর প্রেমিক (মানবাত্মা) নিরুদ্দেশে প্রস্থান করিল এবং নির্জ্জনে প্রার্থনা ও উপবাসাদিতে মন দিল।

বর্ষ পরে পুনরায় প্রিয়তমের রুদ্ধ দ্বারে আসিয়া সে করাঘাত করিল। ভিতর হইতে প্রশ্ন হইল—"কে?" উত্তরে প্রেমিক বলিল—"তুমিই।" দুয়ার খুলিয়া গেল।

অবগুণ্ঠিতা প্রকৃতির কোলে, ওমরও জ্ঞানান্বেষণের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া কোনো এক সুলগ্নে এমনই এক ভগবৎ-সমাধিলাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু অবগুণ্ঠন আবার স্বস্থান-লগ্ন হইয়া গেল—তুমি ও আমি পৃথক সত্তায় বিচ্ছিন্ন হইল,—অদৃষ্ট-রহস্য অনাবিষ্কৃতই রহিল। সসাগরা ধরণীকে জিজ্ঞাসা করিয়া ওমর খৈয়াম কোনো উত্তর পাইলেন না। আবর্ত্তিত জ্যোতিষ্কমণ্ডলী নির্ব্বাক চাহিয়া রহিল—একাদশ ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধি স্তম্ভিত হইয়া গেল। অবশেষে নৈরাশ্যভরে,—

মৃৎ পিয়ালায় মিলিয়ে দিলুম অধরখানি
রহস্যটির অর্থটুকু প্রকাশ পথে আনতে টানি',

ওষ্ঠে ওষ্ঠে বললে সে গো—"পান ক'র ভাই যাবজ্জীবন
বারেক ম'লে ফিরবে না আর এই কথাটাই আসল জানি।

যেন বা একটি দীর্ঘনিশ্বাসের সহিত অবোধ্যকে বুঝিবার আশা ক্ষণকালের জন্য ছাড়িয়া ওমর স্থির করিলেন-"আচ্ছা, চুলোয় য'ও আপাততঃ; স্ফূর্ত্তির সাহায্যেই তোমাকে প্রমাণ করিব; অতএব "লে আও পিয়ালা।"

পিয়ালায় অধর পরশের সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু সঙ্কল্প বদল হইয়া গেল—ওমরের মনে হইল:—

'উচ্চারিল ঐ কথা যে কুহরণের আভাস ভাষায়—
ঐ পিয়ালাও ছিল সজীব দুঃখে, সুখে, ক্ষুৎপিপাসায়
হয়তো কোন অতীত যুগে; শীতল তাহার ওই অধরেই
কতই চুমার আদান প্রদানা করতো তখন দিবস নিশায়।

বাক্যহারা প্রাণহীন বস্তুর প্রতি সহানুভূতির উদ্রেকে কল্পনা-শক্তি অন্তরতম প্রকৃতিকে আঘাত করিল। "বনস্পতি ওষধিতে এক-দেবতার অখণ্ড অক্ষয় ঐক্য"-কথা তাঁহার স্মরণে জাগিয়া উঠিল; জগৎ ও জগদীশ্বরের ঐক্যবিষয়ক যে বিশ্বাস তাঁহার মধ্যে বহুকাল আছে, তাহারই সুর সুরাপাত্রের ভিতর হইতেও বাজিতে লাগিল।

ওমরকে অনেক লেখক রোমীয় কবি দার্শনিক লুক্রেসিয়াসের সহিত এমনভাবে তুলনা করিয়াছেন যে, এতদুভয়ের মতামত ও ধ্যান-ধারণার অভিন্নতা যেন একই প্রকারের। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এতদুভয়ের মধ্যে যথার্থ কোনই মিল নাই। ওমর খৈয়াম যে সব জিনিষ অতি সহজভাবেই স্বীকৃত বিষয় হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন, লুক্রেসিয়াস তাঁহার মহাকাব্যে তাহার অস্তিত্বহীনতা প্রমাণ করিবার জন্য প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ করিয়াছেন।

ওমর খৈয়াম ও লুক্রেসিয়াস

তাঁহার দার্শনিক কাব্যগ্রন্থের প্রথমতঃ দ্বিতীয় ভাগে তিনি ইহাই দেখাইতে চাহিয়াছেন যে, জগতের আদিম সৃষ্টির অথবা পরবর্ত্তী পরিচালনার মূলে কোনও প্রকৃত নায়ক ছিল না। অপরপক্ষে, ওমর খৈয়াম কখনও এ বিষয়ে সন্দেহ করেন নাই যে, তিনি ভগবানের সৃষ্ট এবং তাঁহারই হস্তের ক্রীড়াপুত্তলি। লুক্রেসিয়াস আণবিক তথ্যের ধারাগুলিকে অন্তঃ-প্রকৃতির ব্যাখ্যাকার্য্যে প্রয়োগ করিয়াছেন এবং প্রমাণ করিতে গিয়াছেন যে, দেহের বিনাশে আত্মাও বিনষ্ট হয়,—অপরপক্ষে অমরতার জন্য ওমরের ব্যাকুলতা এবং উহা প্রমাণ করিতে না পারার জন্য মর্ম্মান্তিক আক্ষেপ, এমন একটি মানসিক অবস্থার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিতেছে, যাহা নাস্তিকতা হইতে অনেক বিভিন্ন প্রকৃতির। লুক্রেসিয়াস বলিয়াছেন যে, জগৎ নিজেও যেমন দৈবী নহে, তেমনই আবার দৈবশক্তি-চালিতও নহে। সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্মবিশ্বাসেরই শত্রুতাচরণে লুক্রেসিয়াস এখানে কৃতসঙ্কল্প। ওমর খৈয়াম কিন্তু প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত এই জগতের অতি স্বাভাবিক পরিচালনায় দৃঢ়-বিশ্বাসী এবং একবারও এমন সংশয় প্রকাশ করেন নাই যে, মানুষের কোন নিয়ামক বা স্রষ্টার অস্তিত্ব না থাকিতেও পারে। এককথায়, লুক্রেসিয়াস ধর্ম্মের এই দুইটি ভিত্তিভূমিকেই অস্বীকার করেন যে, জগতের একজন নিয়ন্তা বিদ্যমান আছেন এবং আত্মার ভবিষ্য-জীবন আছে। অপরপক্ষে ওমর খৈয়াম এই যুগল ভিত্তির প্রথমটিকে সর্ব্বান্তকরণেই গ্রাহ্য করিয়াছেন এবং দ্বিতীয়টি সম্বন্ধেও একটি ক্ষীণ আশা প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছেন। বর্ত্তমান উপভোগের প্রবণতায় উভয়েই মিত্রভাবাপন্ন বটে, তবে প্রথম দৃষ্টিতে যতটা মনে হয়, প্রকৃতপক্ষে ততটা নহে। লুক্রেসিয়াস দাবী করেন যে, তিনি সাধনার উচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছেন। ওমরের আত্মশ্লাঘা এতদূর পৌঁছায় নাই। অনেকগুলি দিক আছে—যেখানে এতদুভয়ের

মিল খুব ঘনিষ্ঠ। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, জীবন মূল-কারণ, প্রকৃতির গতিপথ এবং মানবের সহিত ইহার সম্বন্ধ-নির্ণয়ে উভয়েই সমান উৎসুক; উভয়েরই দার্শনিকতায় ধর্ম্মশাস্ত্রের সহিত বিজ্ঞানের লড়াই সুস্পষ্ট; উভয়েই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিশ্বপ্রকৃতির ব্যাপারগুলি অধ্যয়নে নিয়োজিত-চিত্ত এবং উভয়েই চিন্তাশীল জীবন বাছিয়া লইয়াছেন। কিন্তু গুরু বিষয়গুলি সম্বন্ধে ধারণা ও বিশ্বাসের বিরোধগুলির তুলনায় এ সকল মিল বুঝি বা উল্লেখযোগ্যই নহে। কারণ, ওমর আর যাহাই হউন না কেন, নাস্তিক ছিলেন না। তিনি সত্যের একজন সন্ধানী মাত্র; কিন্তু যাত্রা আরম্ভ করিয়াছেন বিশ্বাসকেই বুকে লইয়া। উহা সহজাত বিশ্বাস। তিনি ইহার মূল্য প্রমাণ করিতে না পারিলেও ঐ বিশ্বাস অন্ধ দৃঢ় নহে। এ বিশ্বাস এই যে, "ভগবান আছেন।" তাঁহার সমস্ত জীবনে এই বিশ্বাসটির মূল শিথিল হয় নাই। সময়ে সময়ে ভাবনার কূল-কিনারা না পাওয়ায় তিনি বলিয়াছেন বটে,—

"দেবতা আর মানুষ নিয়ে কাজ কি মাথা ঘুলিয়ে ফেলায়,
আসছে কালের দুর্ভাবনা ভাসিয়ে দে সব হাওয়ার ভেলায়;
ঘুরুক এবার অঙ্গুলি তার এলোকেশের নিবিড় বনে,
কাঁকালে যার সুরার কলস, সুধার পরশ অধর-বেলায়।

তথাপি সুরা বা সাকী কখনও তাঁহার দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করিতে পারে নাই,—ভগবান্ই তাঁহার দৃষ্টিতে অনাদি-অনন্ত থাকায় বাধা ঘটে নাই,—অথবা মানুষও আপন অস্তিত্বের জন্য ভগবৎ-নির্ভরতা পরিহার করিতে পারে নাই। এ সম্বন্ধে ওমরের আগাগোড়াকার কথা—

"যাচ্ছে লিখে সচল, কলম, পড়ছে ঝ'রে আখর-মালা;
বৃথাই রে তোর ধার্ম্মিকতা, জ্ঞান-গরবের মশাল জ্বালা;
পিছনে হটে ঐ লেখনী কাটবে না আর একটি কথাও—
মুছতে তারে পারবে না তোর সাগর-প্রমাণ অশ্রু-ঢালা।"

অদৃষ্টের উপর হস্তক্ষেপ করিবার উপায় অভাবে অসহিষ্ণু হইয়া ওমর

বর্ত্তমান সর্ব্বস্বতার দার্শনিক যুক্তি

মধ্যে মধ্যে যেন ও সকল চিন্তা হাসিয়া উড়াইয়া দিতেই চাহিয়াছেন। এমনই একটা লঘু মুহূর্ত্তে ওমর লিখিয়াছেন,—

"বারেক যদি লভ সুরার পাত্র-অধর-পরশ-প্রীতি—
সকল 'নেতি'ই মহোল্লাসে উঠবে ব'লে—'ইতি' 'ইতি'।
তবেই দেখ যাবৎ-জীবন, ভবিষ্যতের 'নেতিই' আছো,
মধ্যে 'ইতি'র আস্বাদনে মূল্য কমার নাইকো ভীতি।"

পরিহাস-গর্ভ হইলেও এই যুক্তিটির মধ্যে গভীর চিন্তাশীলতা প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। "আমি যখন কিছুই না" তিনি বলেন—তখন স্ফূর্ত্তি না করিব কেন? আমি কিছুই ছিলাম না—ভবিষ্যতেও কিছু থাকিব না, অতএব 'অতীতের আমি' বা 'ভবিষ্যতের আমি' হইতে 'বর্ত্তমানের আমি' মন্দ কিসে?" ভবিষ্যৎ তাঁহার মানস-দৃষ্টির সম্মুখে অন্ধকারে বিলীন থাকায়, বর্ত্তমানই তাহার তুলনায় উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু নিজের অজ্ঞতা ও দৌর্ব্বল্যের প্রতি ব্যঙ্গ ছাড়া ইহার মধ্যে আরও অনেক ইঙ্গিত আছে। ইস্‌লাম-একেশ্বরবাদ ও ধরা-বাঁধা কর্ম্মপদ্ধতির বিরুদ্ধে সুফী মতবাদ অন্যতর প্রতিক্রিয়া হওয়ায়—বিশেষতঃ মহম্মদ-কর্ষিত ভূমিতে, প্রাচীন বৈদান্তিক চিন্তার, বা ব্রাহ্মণ্য 'ভূমা'-বাদেরই কলমের চারারূপে গজাইয়া উঠায়—দৃশ্যমান জগতের অলীকতা-বিষয়ক ধারণাটিকে সুফী-সম্প্রদায় সম্পূর্ণরূপেই তাঁহাদের ধর্ম্মবিশ্বাসের মধ্যে গ্রহণ করিয়াছিলেন। "মায়াময়মিদমখিলং হিত্বা, ব্রহ্মপদং প্রবিশাশু বিদিত্বা"ই, সুফী-মতবাদের মধ্যে এই জগৎকে, অনাত্মার উপর আত্মার প্রতিবিম্বরূপে দাঁড় করাইয়াছিল। ভগবানই সত্য, কিন্তু জগৎ অলীক—এই ছিল তখনকার বক্তব্য। 'ব্রহ্মপদং প্রবিশাশু'র তাৎপর্য্য অপেক্ষা

'জগতের মায়াময়ত্বই যেন শ্রেণীবিশেষের মধ্যে অধিকতর লক্ষ্যস্থানীয় হইয়া উঠিয়াছিল। এ ক্ষেত্রে ওমর যদি নিজেকে বর্ত্তমানে 'কিছুই না' বলিয়া থাকেন, তবে সে উক্তি এক শ্রেণীর প্রচারক যাহা বলিতেন, তাহারই প্রতিধ্বনিমাত্র। এ মতে অতীতের বা জন্মের পূর্ব্বে তিনি (ভগবান না হওয়ার ?) কিছুই ছিলেন না—ভবিষ্যতে বা মৃত্যুর পরে কিছুই থাকিবেন না, আর জগতের অলীকতা সম্বন্ধে উক্ত ভাবুকদিগের ধারণা যদি সত্য হয়, তবে জগতেরই অংশীভূত হওয়ায় বর্ত্তমানেও কিছুই নহেন। তিনি নিজেই যখন অলীক, তখন কাহারও আপত্তির কারণ না ঘটাইয়াই একটু আমোদ প্রমোদের অলীকত্বও উৎপাদন করিতে পারেন। আপন অস্তিত্বের মত তাঁহার পানোৎসবের অস্তিত্বও অলীক; অতএব তিরস্কারেরও অযোগ্য।

কিন্তু এ পর্য্যন্ত আমরা তাঁহাকে হয় পরিহাস, আর না হয় যুক্তি ও বিদ্রোহের তারে পর্য্যায়ক্রমে আঘাত করিয়া আসিতেই দেখিতেছি। এইবার এমন একটি পর্দ্দার পরিচয় লাভ করিব, যেখানে আশা ও সংশয় পরস্পরকে পরাভূত করিবার জন্য প্রবলবিক্রমে যুধ্যমান।

"অতল অপার গোলক মালার কক্ষ-ভ্রমন-চক্রগুলির মাঝে,
চরমতম পানের লাগি' সবার তরেই পাত্র সে এক আছে;
আসবে যখন তোমার পালা, ফেলো না কো। কলজে-কাটা শ্বাস,
অসঙ্কোচে পান করো তার, সর্ব্বাবসান অনেক দূরে রাজে।"

"ঝর্‌ঝরে তুই হোস রে যদি ধূলোর পোষাক ছেড়ে ধূলোর'পর,
নীলাম্বরের মাঝখানেতে দাঁড়াবি এক আত্মা দিগম্বর,—
বসবি বিভুর সিংহাসনে। লজ্জা তবু হয় না কি রে তোর
হেথায় এসে ব'সে থাকায়, উচ্চে ধরে তুচ্ছ মেটে ঘর?"

"অন্য কিছু নয়কো খৈয়াম, তাঁবুই বটে শরীরখানা তোর,
নৈশ-বিরাম লভেন হেথা, বাদশাহ এক-চলার নেশায় ভোর;

শয্যা যখন ছাড়েন তিনি, মৃত্যু-নকীব ভাঙতে আসে তাঁবু—
নতুন ক'রে খাটায় আবার, বিরাম সময় আসলে ওঁর।"

এই কবিতাত্রয়ে ওমর এমন এক আলোকে দেখা দিয়াছেন, যাহা অন্য কোথাও লক্ষিত হয় নাই। আমরা দেখিয়া আসিয়াছি যে ভগবদ্বিশ্বাসীর যে দুইটি প্রধান আশ্রয়, তন্মধ্যে প্রথমটি ঈশ্বরের অস্তিত্ব ওমরকে দৃঢ়ভাবেই অনুপ্রাণিত করিয়াছে। এখানে স্পষ্টতঃই দেখিতেছি যে, দ্বিতীয় ক্ষেত্রেও আত্মার অবিনশ্বরতায় তিনি আস্থাবান।

আত্মার অমরতা ও ওমর খৈয়াম

ভাব-তন্ময়তার অনুরাগী না থাকিলেও, ঐ পদ্ধতিটি যে ওমরের পক্ষে ক্ষতিকর হইতে ছাড়ে নাই, তাহার প্রমাণ—মধ্যে মধ্যে তিনি মানব-ধর্ম্মের প্রতি অবজ্ঞা ও মানুষের ব্যক্তিবিশেষত্বের প্রতি সংশয়ই প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু এখানে সে প্রবণতা সবলে পরিহার করিয়া ব্যক্তি-বিশেষত্ব—স্বীকারের আবশ্যকতাই যেন তিনি উপলব্ধি করিতেছেন। আপন চেতনার ভিতর হইতেই যেন তিনি এই মহা সিদ্ধান্তটি মানিয়া লইয়াছেন—"আমি চিন্তা করি, সুতরাং আমি আছি।" সমস্ত পারি-পার্শ্বিক মত বিশ্বাসের প্রভাব অতিক্রম করিয়া তিনি নিজেকে এখানে এক চিরন্তন ও আত্ম-সচেতন বর্ত্তারূপে জানিয়াছেন। জানিয়াছেন যে, এই আত্মাই—এই জীবে জীবে বিশেষ আত্মাই একীকরণ-মন্ত্রের মূল সূত্র এবং ইহারই অস্তিত্বের সহিত অবিনশ্বরতার রহস্য বিজড়িত।

অখণ্ডতার মধ্যে খণ্ড আত্মার নিমজ্জন-সম্ভাবনা ওমর বহুস্থলেই বিনা আপত্তিতে মানিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু এখানে সর্ব্বব্যাপী অখণ্ডতা হইতে তাঁহার আত্মা যেন পৃথক যেন বাদশাহের মতই, কিছুদিনের জন্য ছোট ঘরে বাস করিলেও, কোনও বৃহত্তর পরিণতির অভিমুখেই ধাবমান। সে পরিণতি যেমনই হউক, উহা যে একটা ভাবী-জীবনেরই

নির্দেশক, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। দেহ এখানে ব্যক্তি নহে,—মানুষটাকে (ওমরের ভাষায় তাঁবুকে) মৃত্যু আসিয়া উৎপাটন করিবে; কিন্তু তাহার ভিতরের বাদশাহ মৃত্যুর অধীন নহে—উহাই আত্মা। এগুলি বিভিন্ন সময়ের রচনাই হউক বা কোনও বিশেষ মুহূর্ত্তেই বিরচিত হউক, প্রাচ্য বিশ্বাসের উচ্চতম স্তরকেই স্পর্শ করিয়াছে।

মৃত্যুর চরম-পানপাত্র আমাদিগকে, অসঙ্কোচে, দীর্ঘনিশ্বাস না ফেলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে—কেন? কারণ, উহাই 'সর্ব্বাবসান' নহে—উচ্চতর ভবিষ্যৎ আমাদের জন্য প্রতীক্ষায় আছে। দেহবন্ধন পরিহার করিয়া তাহা লাভ করা আবশ্যক। কিন্তু বস্তু ও আত্মার পৃথক্করণ কি সম্ভব? সম্ভব নহে শুধু—ইহাই অপরিহার্য্য; দেহ (তাঁবু) মৃত্যুর অধীন. কিন্তু আত্মা (বাদশাহ) চির-গতিশীল।

কিন্তু ওমরের চতুষ্পদীতে ভাব-সামঞ্জস্য খুঁজিবার চেষ্টা করা বৃথা। রঙ্গরসিকতা তাঁহাকে ছাড়িয়া অধিকক্ষণ অনুপস্থিত থাকিতে পারে না—যেহেতু, গড়িয়া তুলা অপেক্ষা ভাঙ্গিয়া ফেলিবার দিকেই তাঁহার ঝোঁক বেশী। তবে এটি খুবই সম্ভব যে, দার্শনিকতার ক্ষেত্রে তাঁহার ব্যঙ্গ-বিদ্রূপগুলি অনেক স্থলেই রঙ্গদর্শনের জন্যই—অন্তরতম বিশ্বাসের অভিব্যক্তি নহে। এমন কি, দৃশ্যতঃ তাঁহার কাব্যের আকার ঐহিক-ভোগসুখপ্রধান মনে হইলেও, উহা কবির অন্তরের প্রতিচ্ছবি কি না, তদ্বিষয়ে সন্দেহ হয়।

"আছে কি নেই বিচার করা দার্শনিকের জ্ঞান-নিকষে,
সারাজীবন ভাসিয়ে দেওয়া বীজগণিতের সূত্র বশে,
ঢের হয়েছে এই জীবনে; পাইনি তবু এমন কিছু
মেলে না যা সব-ভোলানো, মন-মজানো দ্রাক্ষারসে।"

মূল কবিতাটিতে ওমর বলিয়াছেন যে, আত্মা ও অনাত্মার রহস্য

তিনি উহাদের ব্যবহারিক ও যৌগিক উভয় অর্থেই 'পরখ' করিয়াছেন; কিন্তু উহাদের উদ্দিষ্ট তন্ময়তার মধ্যে এমন কোনও উচ্চভাবের সন্ধান পান নাই, যাহা না কি সুরার ভাণ্ডারে নাই। ভাবের নেশাকে এইরূপে মদের নেশার তুল্যমূল্য করার উদ্দেশ্য একশ্রেণীর ভণ্ড-তপস্বীর প্রতিই কটাক্ষপাত করা। ওমর বলিতে চাহেন যে, ইহাদের লক্ষ্য লক্ষ্য হইতে উন্নততর নহে, তবে ভাবের মাতাল ও মদের মাতাল বিভিন্ন পথে অচেতন অবস্থায় উপনীত হয়, এই যা প্রভেদ।

ভাবমত্ততা ও সুরামত্ততার ভেদাভেদ

যে শান্তি কখনও আসে না, তাহার জন্য চির-অশান্ত আত্মার চরম আবেদন নিম্নোদ্ধৃত চতুষ্পদীতে প্রকাশ পাইয়াছে:—

"মুক্ত কর আমায় প্রভু, 'বেশী' 'কমের' ধন্ধ কর দূর;
ডুবাও আমায় তোমার মাঝে, তুমি-আমির দ্বন্দ্ব কর দূর,
বুদ্ধি আমার ঘুরিয়ে মারে মন্দ-ভালর গোলক-ধাঁধায়—
সব চেতনা হরণ করি' সদসতের সন্দ কর দূর।"

এই সত্যান্বেষীটি সেই প্রকৃতির লোক—যিনি জীবনের সকল পথই পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন—জগতের উদ্বেগ ও উল্লাস, আশা ও নৈরাশ্যের সকল মর্ম্মই চরম করিয়া জানিয়াছেন—এবং জানিয়াও অবসাদ ও নৈরাশ্য-জনিত তিক্ততার সহিত সকলকে বিদ্রূপেরই সামগ্রী করিয়া তুলিয়াছেন। নিজের সমস্ত পাণ্ডিত্য, সমস্ত উদ্যম নিয়োগ করিয়াও তিনি যাহা পাইলেন না, তাহা নিশ্বাস-প্রশ্বাসেরই মত সহজভাবে পাইয়াছে বলিয়া যাহারা মর্য্যাদার দাবী করে, তাহাদিগকে ব্যঙ্গবিদ্ধ করিতে কখনও তিনি ক্লান্তি অনুভব করেন নাই। তাহাদিগের ধারণা ও বিশ্বাস স্বভাবতই ন্যায় বা যুক্তির সর্ব্বপ্রকার সম্পর্করহিত, সুতরাং ওমরের নিকট সম্পূর্ণ

ওমরের প্রকৃতি

মূল্যহীন। আপন বীজগণিতের ভূমিকায় স্পষ্টাক্ষরেই এই ব্যাপারের প্রতি ইঙ্গিত করিয়া তিনি বলিয়াছেন—

"আধুনিককালে যাঁহারা পাণ্ডিত্যের অভিমান রাখেন, তাঁহাদের অধিকাংশই মিথ্যাকে সত্যের ছদ্মবেশে সাজান এবং শিক্ষার অহঙ্কার ও অভিনয়ের গণ্ডী ছাড়িয়া কখনও এক-পা'ও অগ্রসর হন না। যৎসামান্য বিদ্যার পুঁজিকে নীচ স্বার্থসিদ্ধি ও ব্যক্তিগত লাভালাভের জঘন্য ক্রীতদাস করিয়া তুলাই তাঁহাদের অভ্যাস। যদি এমন একটা মানুষ তাঁহাদের চোখে পড়ে, যে মুখোস পরিবার বা প্রতারণা চালাইবার চেষ্টাকে সর্ব্বপ্রযত্নে পরিহার করিয়াই চলিতে চাহে, তবে তাহার উপর এই সমস্ত পণ্ডিতের ঘৃণার আর অন্ত থাকে না: এবং শরাঘাত-ক্ষত বক্ষে বহন করাই দাঁড়ায় সে বেচারীর ভাগ্যলিপি।"

নিম্নোদ্ধৃত কবিতাটিতে ওমর নিজেকে এই বলিয়া প্রবোধ দিয়াছেন—

আত্ম-সান্ত্বনা

'জীবন তোমার মন্দ ব'লে কেন খৈয়াম দুঃখে মর?
অনুতাপে ফল কি শুনি? বরং কসে ফুর্ত্তি কর।
পাপী যে নয় বিভুর দয়ায় নেইকো তাহার কোনই দাবী,
করুণা তো পাপীর তরেই এই আশাতে জীবন ধর।'

এ আত্ম-প্রবোধ যেমন করুণ—তেমনই সুন্দর।

জ্ঞানের বিষয়ে ওমরের শেষ কথা সংশয়বাদীরই কথা। তাঁহার মতে

জগতের জ্ঞান-ভাণ্ডার সম্বন্ধে ওমরের মতামত

অজ্ঞেয়বাদ, অনিশ্চয়তা এবং চির সংশয়ই, সকল প্রকার যুক্তিতর্ক সত্ত্বেও, মানব-জগতের অলঙ্ঘনীয় নিয়ম হইয়া থাকিবে:—

"দেখছো খাসা জগৎ, তবু কিছুই না-ও দেখ্‌ছো যা-সব;
বলছো ব'তা, অসার সবই, কিছুই নহে শুনছো যা-সব;

বিশাল ধরার চতুঃসীমায় যা'-কিছু পাও, স্বপ্ন শুধু—
ফক্কিকারী,—রত্ন ভেবে যত্নে বুকে লুকাও যা'-সব।"

মানুষের বোধি ও বুদ্ধি যে সমস্ত ভাব ও যুক্তির জাল বুনিয়া চলে, আসলে তাহা অসার বাগ্‌বিন্যাস ছাড়া অন্য কিছুই নহে। সত্যের আবরণ উহা কোনও কালেই উন্মোচন করিতে পারিবে না। যত কিছু প্রচলিত বিশ্বাস, যাবতীয় প্রথা-পদ্ধতি, প্রত্যেকটিই দ্বিধাশূন্য চিত্তে বর্জ্জন করা আবশ্যক—

"কেউ বা 'প্রথায়' সত্য খোঁজে, কেউ বা 'আচার-ব্যবহারে'
'নানান মুনির মত' ঘেঁটে কেউ, ভাবে যাচাই কর্বে তারে;
ঘোমটাখানির আড়াল থেকে এদের ডেকে বলছে বাণী—
'পথের আভাস নেই রে মূঢ়, এই দু'পথের কোনো ধারে'।"
"মন্দিরে বা মঠের মাঝে, মসজিদে বা শিক্ষাশালায়,
স্বর্গ-লোভ আর নরক-ভীতি, বক্ষে জাগে পালায় পালায়;
প্রাণের আলোয় বিধির বিধি উঠ্‌লে জলে জ্ঞানের মূলে,
অসার ও-সব গল্পকথা হৃদয় থেকে ছুটে পলায়।"

সমস্ত বিশ্ব-ব্যাপারের মধ্যে যাহা সুনিশ্চিত, তাহা এই যে, ধর্ম্মমতমাত্রই অসত্য। ইহা সত্য নহে, বা সত্য হইতেও পারে না যে, মানুষ কোনও এক দ্যুলোক-বাসী খেয়ালী জগদীশ্বরের লীলা-উপভোগের জন্য, গোড়া হইতেই বিভিন্ন ললাট-লিপি লইয়া দেখা দিয়াছে। কিন্তু কি জন্য আমাদের জীবনধারণ, কি জন্য আমরা সচেতন এবং কি জন্যই বা মনে করি যে, জড় ও শক্তির সমবায়ে একটি স্বপ্নময় অস্তিত্বের মধ্যে ক্ষণকালের জন্য ফুটিয়া যাহা অনুভব করিতেছি, তাহার কারণ বুঝিতেও সমর্থ—এ সমস্যার নিরাকরণ সম্বন্ধে কবি কোনও সম্ভাব্য সমাধানের ইঙ্গিত করেন নাই। স্বর্গ-নরক সম্বন্ধে অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন—

"জল ঢেলে দে নরক-শিখায়, আগুন জ্বালা স্বর্গ জুড়ে।
সত্য যা' তা' এইটুকু যে জীবনখানা চল্‌ছে উড়ে;
সত্য শুধু এইটুকু, আর বাদবাকী সব নিছক মিছে
বারেক ফুটে মরে রে ফুল চিরকালের চিতায় পুড়ে।"

ভয় দেখাইয়া বা লুব্ধ করিয়া যে-সকল জ্ঞানী ধর্ম্মাচরণের প্রবৃত্তি জাগাইয়াছেন, ওমরের দৃষ্টিতে তাঁহাদের উদ্দেশ্যের দৈন্য তিরস্কারযোগ্য। ওমর ভারতীয় দর্শনের দ্বারা প্রভূত পরিমাণেই প্রভাবান্বিত হওয়ায়, ভয় বা লোভকে কোনও মহৎ উদ্দেশ্যের সহকারী শক্তি-হিসাবে সহ্য করা দূরে থাকুক, অবজ্ঞা করিতেই বাধ্য। জ্ঞানী কখনও স্বর্গ-কামনা করেন না, বা নরকের ভয়ও রাখেন না। শুধু ভারতীয় কেন, অন্যত্রও এ সত্য সমান গ্রাহ্য। জেরেমী টেলার কর্ত্তৃক বিবৃত এক আখ্যায়িকা হইতে এ বিষয়ের একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত স্মরণযোগ্য :—

"সেন্ট আইভো কোনও উপলক্ষে সেন্ট লুইসের উদ্দেশে যাত্রা করিয়া পথের মাঝখানে দেখিলেন যে, একটি বিষণ্ণ-গম্ভীর প্রৌঢ়া রমণী এক হাতে জলপাত্র ও অপর হস্তে প্রজ্বলিত মশাল লইয়া চলিয়াছে। স্বাভাবিক কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া আইভো তাহাকে কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন; উত্তরে রমণী বলিল,—আমার উদ্দেশ্য এই মশাল দিয়া স্বর্গকে দগ্ধ করা এবং এই জলের নিষেকে নরকের আগুন নিভাইয়া দেওয়া; এরূপ না করিলে মানুষ ভয় বা আশা পরিত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র ভগবৎ-প্রীতির জন্যই, তাঁহাকে নিষ্কামভাবে চাহিবে না।"

"ব'লে গেছেন যে-সব-কথা দূর অতীতের তত্ত্ব-জ্ঞানী
আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষ ভক্তগণের আপ্ত-বাণী,
গল্প সবই—ঘুমের ফাঁকে সঙ্গী জনে গুছিয়ে বলা,—
শেষকালেতে পড়তে ঢুলে ঘুমটুকুকেই চরম মানি!"

মৃত্যুর রহস্য—মহা মহামনীষী ও সাধুগণের যুগ-যুগান্তরের চেষ্টার বিরুদ্ধেও রহস্যই থাকিয়া গিয়াছে। দার্শনিক সমাধানই বল, আর ঋষিদের আপ্তবাক্যই বল, সমস্তই সমান মূল্যহীন এবং নিতান্তই রূপকথা। জগতের অন্ধকাররাজির ভিতর হইতে কোনও নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত পথ বাহির করিতে অক্ষম হইয়া সকলেই নিজের নিজের গল্প গাঁথিয়া গিয়াছেন এবং নিজেরাও ঐ মৃত্যুর অন্ধকারে মিশাইয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের সমাধান যে সত্য, এইটুকু বলিবার জন্য—মহা মহা জ্ঞানী হওয়া সত্ত্বেও—ফিরিয়া আসাটুকু পর্য্যন্ত সকলেরই সাধ্যাতীত।

ওমরের দুঃখবাদ

সংশয়বাদ ও জাতীয় চরিত্রের উৎসমুখ হইতে একটি বিষণ্ণ সুর সমুত্থিত হইয়া ওমরের সমস্ত রঙ্গ-রসিকতার উপর ছড়াইয়া পড়িয়াছে এইটি তাঁহার রোবাইয়াতের কেন্দ্রীয় সুর। কড়ি ও কোমল উভয় পর্দ্দাতেই এই দুঃখবাদ বাজিয়া উঠিয়াছে। বিপুল বিশাল ও বুদ্ধির অনধিগম্য ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যস্থলে নিঃসঙ্গ মানবের অপরিসীম নিরাশায় একদিকে যেমন এই দুঃখবাদ অভিব্যক্ত—অপর দিকে আবার জীবনের শোক-তাপ-মৃত্যুর ভিতর দিয়াও উহা উচ্ছ্বসিত। একমাত্র সংশয়কে সঙ্গিরূপে লইয়া বিশ্বাসহীন মানবের জীবনধারণ যে কি হতাশাময়, তাহা নিম্নোদ্ধৃত চতুষ্পদীটিতে স্পষ্টীভূত :—

"গির্জ্জা-ঘরের বৈরী আমি, মসজিদে মোর প্রবেশ মানা,
কোন্ মাটিতে জীবন-স্বামী গড়লে এমন বরাতখানা ?
গেরুয়া-হারা সন্ন্যাসী বা কুশ্রী বারনারীর মতন,
ভবিষ্যে মোর নেইকো আশা, বর্ত্তমানেও দুঃখ নানা।"

এই জাতীয় আর একটি রুবাই সাফোক্লিসেরই বাণী স্মরণ করাইয়া দেয়—

"যা' কিছু পাই আমরা সবাই দুঃখ-তাপের এই আগারে,
যখন সেটি শোকের দাহন, কিম্বা গাহন আঁখির নীরে,—
তখন শুধু তারাই সুখী, আস্‌তে যাদের হয় না হেথা ;
কিম্বা যারা এসে আবার, সকাল সকাল সরতে পারে।"

কিন্তু মানুষ সব সময়েই সন্তাপ ও বিষণ্ণতার মধ্যে ডুবিয়া থাকিতে পারে না। জীবন অন্ততঃ বিবিধ ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিকর প্রমোদের উপকরণ সরবরাহ করিতে উদার-হস্ত। অতএব সুযোগ ঘটিলে তাহাদিগের আশ্রয় গ্রহণ করা এবং উহাদিগকে ব্যবহারে লাগাইয়া জীবনধারণ ব্যাপারটিকে যথাসম্ভব লঘু করিয়া তোলা অসম্ভব নহে। সুতরাং দুঃখবাদ "যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ" ধরণের লোকায়তিক মতবাদে পরিণত হইয়া গেল এবং নৃত্য গীতের মধ্যে তত্ত্ব-চিন্তার অবসাদ নিমজ্জিত করার আবশ্যকতাও দেখা দিল। নিম্নোদ্ধৃত পংক্তিচতুষ্টয় লক্ষ্য করিলে উক্ত বিবর্ত্তন স্পষ্ট হইবে :—

ওমরের প্রমোদ-প্রিয়তা

"মরুদেশের বাত্যা বা ঐ স্রোতস্বিনীর স্রোতের মত
এই জীবনের গোণা-দিবস ফুরিয়ে আসে অবিরত ;
আমল তবু দিইনে আমি মনের কোণে দুটো দিনে,—
যে দিনখানা আস্‌ছে এবং হয়ে গেছে যে দিন গত।"

সংশয়রাজির ভিতর হইতেও কবি বলেন যে, আমাদের অনুভব করিবার যে শক্তি আছে, এইটুকুই আমাদের নিকট একমাত্র নিশ্চিত বস্তু। মানুষ মিথ্যা হইতে মিথ্যান্তরে যাত্রা করে, এ কথা যদি সত্য হয় হউক, কিন্তু শরীর সুস্থ ও মনের স্বাস্থ্য থাকিলে বেড়ার কোলের বুনো ফুলও তাহার চোখে সুন্দর হইয়া উঠে। একখানি সুন্দর মুখ, ওষ্ঠপ্রান্তের একটু টোল, একটু প্রীতি-মধুর হাসি, মানব জীবনের বিবিধ ত্রুটির সহস্র-

গুণ ক্ষতিপূরণ। হয়ত বা অনুরাগও সর্ব্বশেষে, মনের ভ্রম ছাড়া অন্য কিছুই দাঁড়াইবে না—তথাপি ইহাই আপাততঃ উত্তম ও সত্য বলিয়া অনুমিত হইতেছে এবং ইহা টেকসইও বটে। কাজেই—

"প্রাণ মন ঢালি, ভালবাসি খালি, গোলাপী-গণ্ড-দুটি ;
সুরার সঙ্গ-সোহাগ হইতে হাতের দিইনে ছুটি ;
প্রতিটি অংশে করেছি নিয়োগ তার করণীয় কাজে,
প্রতি-অংশটি এক সমগ্রে যাবৎ না উঠে ফুটি।"

নিম্নোদ্ধৃত রুবাই দুটিতে আরিস্তোতল ও প্লেতোর দার্শনিক-আত্মার বাণী এখানে কি সুন্দরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

"জীবনখানির গোপন কথা হৃদয় যদি হেথায় জানে,
মরণকালেও বুঝবে তবে ঐশীমায়ার আসল মানে ;
থাকতে জীবন চেতনাময়, আজ যদি না বুঝিস কিছুই
কেমন করে ধর্‌বি তা' কাল চেতনহারা অসাড় প্রাণে ?"

'সত্যমিছের বিভেদ রেখা—চুলের মত সূক্ষ্ম বা সে,
'থেই'টি তাহার দেখতে পাবি 'আলিফ'টিরই অর্থাভাসে ;
ধর্‌তে যদি পারিস তা'রে, জগৎ হবে আপন অতি—
পৌঁছে গেলেও যেতে পারিস, স্বয়ং জগৎ-পতির পাশে।"

'প্রেম' সম্বন্ধে কবি অতি সুন্দরভাবে বলিয়াছেন—

"প্রেমের প্রতিমা কহিল একদা ভক্তেরে তার ডাকি,—
কেন আজ তুই আমার পূজারী, জানিস, ভক্ত তা কি ?
তোর নয়নের বাতায়ন-পথে যে প্রাণ রয়েছে চাহি'
রঞ্জিত মোরে করিয়া গেছে সে নিজেরি আলোকে আঁকি।"

জীবনের পথে ওমর খৈয়াম বেপরোয়া পথিক ; মৃত্যু ও নির্ব্বাণের প্রতি

নির্ভীক তর্জনীহেলন করিয়া' জীবনের দান গ্রহণ করিতে করিতে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছেন—ওষ্ঠের প্রান্তে হাসিটুকু শেষ পর্য্যন্ত সজাগ। হৃদয়ে উদারতা, স্পষ্টবাদিতা এবং নিঃসঙ্কোচভঙ্গী তাঁহার কথাই মাত্রকেই যেন বিশেষ একটি মর্য্যাদা দান করিয়াছে। জীবনযুদ্ধে ভগ্নোত্তম সঙ্গীদিগকে প্রোৎসাহিত করিবার জন্ত সময়োপযোগী আশ্বাস-বাণী তাঁহার রসনায় নিত্য জাগ্রত :—

নির্ভীকতা ও নৈতিকতা

"সকালবেলায় শপথ করি 'রাত কাটাবো অনুতাপে,
পানশালাতে আর যাব না, থাকবো না আর কোনোই পাপে।
কিন্তু এ যে বসন্তকাল; কেমন ক'রে শপথ রাখি!
কেমন ক'রে কাঁদতে বসি, গোলাপ যখন হাস্তে কাঁপে।"

অদৃষ্টের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড বিদ্রোহবাণী নিক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে ওমরের উক্তি :—

"শক্তি যদি থাকতো আমার খোদায় সুমন্ত্রণা দিতে,
আদেশ দিতাম, আকাশ এবং ভুবনখানা ঝেঁটিয়ে নিতে;
গড়িয়ে নিতাম এমন জগৎ, থাকতো যেথায় সম্ভাবনা
পূর্ণ হওয়ার সব বাসনাই, উপ্ত যা' এই মানব-চিতে।"

একদিকে যেমন নির্ভীক পথিক, অপর দিকে মর্য্যাদা বুদ্ধিতেও তিনি জগতের অপরাপর স্বাধীন চিন্তাশীলগণের সমকক্ষ। উন্নত মস্তকে যদি মানবসমাজে বিচরণ করিতে চাও, তবে ওমরের পরামর্শ :—

"দুঃখ কারেও দিও নাকো এই কথাটি রেখো স্মরণ
জেলো নাকো রোষের আগুন করতে কারো শান্তিহরণ;
অন্যেরে না, পীড়ন ক'রে পীড়ন ক'রো আপনাকেই
সাধ যদি রে চিরদিনের আনন্দেরেই করতে বরণ!

বরং ভাল প্রফুল্লতায় মাতিয়ে তোলা একটি প্রাণী,
নয়কো তবু রোপন করা মরুর বুকে নগর আনি ;
হাজার হাজার কয়েদীকে মুক্ত ক'রে দেওয়ার চেয়ে
একটি স্বাধীন প্রাণে বরং পরাও প্রেমের বাঁধনখানি।"

নৈতিক আদর্শেও সে মনীষী নিতান্ত দরিদ্র ছিলেন না, যিনি না কি সকল দার্শনিকতার চুম্বকটুকুকে এই বলিয়াই মূর্ত্ত করিয়া গিয়াছেন,—

"খাবার মত খানিক রুটি, মাথা গোঁজার একটু কুঁড়ে,
আছে যাহার, আনন্দ তার নৃত্য করুক হৃদয় জুড়ে।
চায় না যে জন দাস্য কারো, নয়কো নিজে কাহারো দাস,
তাহার সমান ভাগ্যখানি, কে পাবি বল জগৎ ঘুরে।"

যে-সকল চতুষ্পদীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় এখানে আমরা গ্রহণ করিলাম, তাহা বহু শতাব্দী পূর্ব্বের বটে, তথাপি ইহার আধুনিকত্ব আজ পর্য্যন্ত অপরিম্লান। দেশ-দেশান্তরের শিক্ষিত সমাজে যে-সকল সমস্যা চিরন্তন, মানব-প্রকৃতির ভিত্তিমূলে যে-সকল বৃত্তি চিরনবীন, ধর্ম্ম ও দর্শনের ক্ষেত্রে সে-সকল চিন্তা মৃত্যুঞ্জয়ী ওমরের রুবাইগুলি ইঙ্গিত ও সঙ্কেতের ভিতর তাহা ধরিয়া রাখিয়াছে। ওমর তাঁহার কবিতার ভিতর দিয়া মানব-সমাজের একটি বিশেষ কল্যাণসাধন করিয়াছিলেন এই হিসাবে যে, ফির্দৌসীপ্রমুখ কবি-কুলের কাব্য, সে যুগে যে প্রভুত্বের লোভ ও লড়াইয়ের প্রবৃত্তি উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিয়াছিল, ওমরের দার্শনিকতা-গর্ভ চতুষ্পদীগুলি তাহার গতিরোধ করে ও লোকের মনের ঝোঁক অন্য দিকেই ফিরাইয়া দেয়। অনেকের বিশ্বাস যে ভারত-সম্রাট আকবরের ধর্ম্মমতের ঔদার্য্য বহুল পরিমাণে ওমরের রুবাইগুলির নিকট ঋণী। এটা অবশ্যই অনুমান-কথা, যেহেতু ইহার কোনও ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় না ; তবে "আইন-ই আকবরি"র পাঠকমাত্রেই জানেন যে, ওমরের রুবাইগুলি আকবরের এত প্রিয় ছিল যে, তিনি হাফিজের একটি করিয়া গজল

শেষ কথা

পাঠের পর ওমরের একটি করিয়া রুবাই পড়িবার ব্যবস্থা দিয়াছিলেন; কেন না, তাঁহার মতে, প্রথমের মাদকতা-পানের পর দ্বিতীয়ের অনুপান রসের সঙ্গতি রক্ষার জন্য অপরিহার্য্য।

অন্ততঃ ৫০০০ রুবাই ওমরের নামের সহিত জড়িত হইয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত আছে, কিন্তু তাহার সবগুলিই তাঁহার রচিত নহে। সঙ্কলিত রুবাই-এর প্রাচীনতম পাণ্ডুলিপিও ওমরের মৃত্যুর প্রায় সাড়ে তিন শত বৎসরের পরে গ্রন্থবদ্ধ হওয়ায়, বিশেষতঃ পারস্যের প্রায় প্রত্যেক কবিই কিছু না-কিছু রুবাই আপনাপন গ্রন্থাবলীর অন্তর্ভূত করায়, শ্রুতিধর-গণের স্মৃতির দৌরাত্ম্যে একের রচনা অন্যের নামে চলিয়া যাওয়ার খুবই সুযোগ ঘটিয়াছে। তথাপি যে বিশেষজ্ঞেরা কতকগুলি রুবাইকে ওমর-বিরচিত বলিয়া নির্দ্ধারণ করিতে পারিয়াছেন, সে শুধু উঁহাদের সরল অন্তরের সাক্ষ্য, গঠনের বৈশিষ্ট্য ও বিষয়গত ঐক্য প্রভৃতির বিচার করিয়া; এবং সেই সঙ্গে ইহাও দেখিয়া যে, ওমর খৈয়ামের চতুষ্পদী সংগ্রহের ভিন্ন ভিন্ন পাণ্ডুলিপিতে ঐ সকল রুবাই-এর উল্লেখ সাধারণ। এইরূপ হিসাব-নিকাশের ফলে ২৫০ হইতে ৩০০টি রুবাই মাত্র আসল বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে, বাকীগুলি অবশ্যই সংক্ষিপ্ত।

ওমর রচিত রুবাই-এর সংখ্যা

অনেকের ধারণা আছে যে ফিটজেরল্ডই (Fitzerald) ওমর খৈয়ামের রুবাই আবিষ্কার করিয়া ইয়োরোপের সহিত প্রথম পরিচয় করাইয়াছেন। একথা কিন্তু সত্য নহে, হিব্রু ও আরবী ভাষায় অধ্যাপক ডাঃ টমাস হাইডই (Dr. Thomas Hyde) এ সম্মানের অধিকারী। তিনি ১০০০ খৃষ্টাব্দে ওমরের কয়েকটি রুবাই আবিষ্কার করেন; ইহার পর বিখ্যাত ঐতিহাসিক এলফিনষ্টোন (Elphinstone) কাবুলের

ওমরের রুবাইয়ের প্রথম আবিষ্কারক ও পরিচালক

ইতিহাস সঙ্কলনের সময় ওমরের আরও কয়েকটি রুবাই আবিষ্কার করেন। প্রথম অনুবাদকের সম্মানও ফিটজেরল্ডেরও প্রাপ্য নহে; অধ্যাপক হাইডই প্রথম অনুবাদক। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে হামর পুর্গষ্টাল্ (Hammer Purgstal) ওমর খৈয়ামের কয়েকটি রুবাইয়ের অনুবাদ করেন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে গার্শা—দ্যা-তাসি (Garcin de Tassy) আরও কয়েকটি নূতন রুবাইয়ের অনুবাদ ও ওমর সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ রচনা করেন। ইহার পর, ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে ফিটজেরল্ড স্বয়ং অনুবাদ করেন। আজকাল ইয়োরোপে ওমর খৈয়ামের কবিতার যে অসাধারণ আদর হইয়াছে, এডওয়ার্ড ফিটজেরল্ড (Edward Fitzerold) কৃত অনুবাদ হইতে সে আদরের আরম্ভ। ইহার ফলেই ইয়োরোপের প্রায় সমস্ত ভাষাতে এবং আমেরিকাতে ওমরের রুবাইয়ের অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। বাস্তবিকই ওমরের রুবাই পাঠের জন্য ইয়োরোপ, বিশেষ করিয়া ইংলণ্ড এবং আমেরিকাতে মাদকতা আসিয়াছিল।

ইয়োরোপে ওমরের রুবাই

ইয়োরোপ, ইংলণ্ড ও আমেরিকার সহিত বাংলার সাহিত্য-শিল্পিগণও ওমরের নামে জয়ধ্বনি করেন। সুবিখ্যাত রাজেন্দ্রলাল মিত্রের "বিবিধার্থ সংগ্রহ" পত্রে ওমরের কয়েকটি রুবাইয়ের প্রথম অনুবাদ প্রকাশিত হয়। ইহার পর ওমরের রুবাইয়ের অনুবাদ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে একাধিক সচিত্র সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে। হিন্দী ও উর্দ্দু ভাষাতেও কয়েকটি অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা হইতে বঙ্গদেশ তথা ভারতবর্ষে ওমর খৈয়ামের কিরূপ আদর হইয়াছে বুঝিতে পারা যায়।

বঙ্গভাষায় ওমরের রুবাইয়ের অনুবাদ

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

পরিসমাপ্তি

জীবন-নাট্য-মাত্রেরই পরিসমাপ্তি ঘটে, মৃত্যুর যবনিকা-পাতে। সাধারণতঃ লোক-সমাজে, এই জীবন ও মৃত্যু পরস্পর-বিরোধী বলিয়াই পরিগণিত। কিন্তু যাহারা লোক-শিক্ষক, তাঁহারা এতদুভয়কে একই ধর্ম্মের পরিপোষকরূপেই দেখিয়া থাকেন; অন্ততঃ ওমর খৈয়াম, জীবন ও মৃত্যুকে বিরুদ্ধধর্ম্মী না বুঝিয়া পরস্পরের সম্পূরক হিসাবেই দেখিতে অভ্যস্ত ছিলেন। তাঁহার কোনো একটি রুবাইয়ে প্রকাশ—"মৃত্যুকে যে ভয় করি, তাহা মরণ-ভীরুতার জন্য নহে; যিনি জীবন দিয়াছেন, মরণরূপী হইয়া তিনিই উহা গ্রহণে সমাগত, অতএব মৃত্যু কোনক্রমেই ভয়ঙ্কর নয়; তবে যে ভয় পাই, সে শুধু এই জন্য যে, পুণ্যময় জীবন যাপন করিতে পারি নাই।"

ওমর খৈয়ামের প্রজ্ঞাদীপ্ত জীবন নাট্যের স্বাভাবিক বিশ্ব-নিয়ম-অনুসারে মৃত্যুতেই পরিসমাপ্ত হইয়াছিল বটে—তথাপি এ সমাপ্তি যেমন অসাধারণ তেমনি বিস্ময়কর। "দার্শনিক ওমর খৈয়াম" শীর্ষক পরিচ্ছেদে আমরা ইঙ্গিত করিয়া আসিয়াছি যে, ওমর খৈয়ামকে যথার্থভাবে বুঝিতে হইলে তাঁহার মৃত্যুকালীন উক্তিগুলির প্রতি সতর্ক লক্ষ্য রাখিতে হইবে। এইবার সেই উক্তিগুলি লিপিবদ্ধ করিবার সময় আসিয়াছে—কিন্তু তৎপূর্ব্বে তাঁহার মৃত্যুর চিত্রটি পাঠকের চক্ষে ধরিয়া দেওয়া আবশ্যক।

সাধারণতঃ, রোগই মৃত্যুর পুরশ্চর-রূপে দেখা দেয়—কিন্তু ওমরের পক্ষে এরূপ ঘটে নাই। তবে কি দৈবদুর্ঘটনাবশতঃ ওমরের, অপঘাতমৃত্যু ঘটিয়াছিল? উত্তর,—না, তাহাও নহে। তবে?

সেই কথাই বলিতেছি। প্রথমতঃ, ওমরের অন্যতম ছাত্র ও তাঁহার মৃত্যুঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী, ইমাম মহম্মদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা যাক্ :—

প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ

"ওমর খৈয়াম, আবু-সিনার দার্শনিক গ্রন্থ পাঠ করিতেছিলেন। ঐ গ্রন্থের যে অধ্যায়ে "ওহবাদত কসরৎ" (একত্ব ও বহুত্ব) আলোচিত হইয়াছে, সেই অধ্যায়টি পড়িতে পড়িতে সহসা পঠিত পাতাখানিতে কোন একটি জিনিস রাখিয়া উহা বন্ধ করেন এবং আমাকে আদেশ করেন—'সকলকে ডাক, আমি শেষ উপদেশ দিয়া যাই।' আদেশানুযায়ী আমরা সকল শিষ্য একত্রিত হইয়া তাঁহাকে ঘেরিয়া বসিলাম এবং তিনি আমাদের উপস্থিতি যেন একেবারেই বিস্মৃত হইয়া, নমাজ পড়িতে দণ্ডায়মান হইলেন। বারংবার নতজানু হইয়া নতি-সহকারে তিনি বলিতে লাগিলেন—যথাসাধ্য আমি তোমাকেই খুঁজিয়াছি ভগবন্—ক্ষমা কর আমার সে অক্ষম অন্বেষণ,—তোমাকেই যে চাহিয়াছি এইজন্যই সকল ত্রুটি, সকল অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া আমাকে শান্তি দাও,—আমি আজ তোমাকেই আত্ম-নিবেদন করিতেছি।' এই কথাগুলি বলিতে বলিতে তিনি ভগবানের উদ্দেশে প্রণত হন; অতঃপর আর তাঁহার সংজ্ঞা ফিরে নাই।"(১)

ওমরের মৃত্যু-ঘটনার দ্বিতীয় সাক্ষ্য, শহর্জুরী-লিখিত ইতিহাস। সে ঐতিহাসিক বিবরণটি এই :—

দ্বিতীয় বিবরণ

"একদিন ওমর খৈয়াম আবু-সিনার দার্শনিক গ্রন্থ "কিতাব-উস-শীফা" অধ্যয়ন করিতেছিলেন। ঐ গ্রন্থের 'ওহবাদন কসরৎ' শীর্ষক অধ্যায়টির মাঝখানে সোনার দাঁত-কাঠিটি (tooth pick) রাখিয়া তিনি উঠিয়া দাঁড়ান এবং সন্ধ্যা সমাগত দেখিয়া নমাজ আরম্ভ করেন। সেদিন তিনি সম্পূর্ণরূপে উপবাসী

ছিলেন। যে কার্পেটের উপর দাঁড়াইয়া নমাজ পড়িতেছিলেন, তাহাতেই নতশির হইয়া সহসা উচ্চকণ্ঠে বলেন—'ভগবন্, যথাসাধ্য আমি তোমাকেই চাহিয়াছি; আজ এই ভিক্ষা জানাইয়া তোমায় আত্ম-নিবেদন করিতেছি, যেন তোমার করুণা ও ক্ষমা হইতে বঞ্চিত না হই'। ইহার পর তাঁহার নতমস্তক আর উন্নত হয় নাই।"(১)

যতদূর দেখা যাইতেছে, উদ্ধৃত দুটি বিবরণই মূলতঃ এক। ইহার দ্বিতীয়টি, প্রথমটির প্রভাবে লিপিবদ্ধ কিনা তাহা বলা যায় না; তবে এই বিবরণের মূলে যে সত্য আছে, তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন বৈধ কারণ নাই। অন্ততঃ ওমরের মৃত্যুর এই বিবরণ দেশ-দেশান্তরের বিভিন্ন ভাষায় আজ প্রামাণ্য বলিয়া গৃহীত। এ বিবরণ সত্য হইলে বলিতে হয় —ওমর জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছিল মৃত্যুর যবনিকা-পাতে নহে; পরন্তু মৃত্যুর হোমানলে জীবনের স্বেচ্ছাপ্রদত্ত আহুতিতে—আর ঐ মৃত্যুর আড়ালে, ওমর তাঁহাকেই দণ্ডায়মান দেখিয়াছিলেন, যাঁহাকে তিনি আজীবন বিদ্রোহে জ্বলিয়া, বিশ্বাসে গলিয়া, বিদ্রূপে বিঁধিয়া, ভক্তিতে কাঁদিয়া, খুঁজিয়া ফিরিয়াছেন। এরূপ মৃত্যু যে-কোনো নর-জীবনেরই পরম কাম্য—আর ওমরের এই অপূর্ব মৃত্যুই তাঁহার আপাতঃ-বৈষম্যময় জীবনের যথার্থ দীপিকা। এ দীপিকা ইহাই নির্দেশ করিয়াছে, যে ব্যবহারিক জগতে জ্যোতির্বিদ, গণিতবিদ, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, ভেষজ-শাস্ত্রজ্ঞ ও কবিরূপে সম্মানিত হইলেও, আসলে তিনি ছিলেন একজন পরম ভক্ত; আর তাঁহার জীবনের এই চরম অর্থটি প্রকাশ পাইয়াছিল তাঁহার মৃত্যু-চিত্রে। ওমরের শিষ্যসম্প্রদায় তাঁহার "শেষ উপদেশ দিয়া" যাইবার প্রস্তাব কি আলোকে গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিতে

১ নুজহ-উল-আরওয়া।

পারি না—তবে তাঁহাদের উপস্থিতি বিস্মৃত হইয়া নমাজ পড়িতে দণ্ডায়মান হওয়ায় ওমর বুঝিবা ইহাই শেষে বুঝাইতে চাহিয়াছিলেন যে—

"মহা-অনারণ্য-মাঝে নিস্তব্ধ নির্জ্জনে" কেমন করিয়া, ভক্ত ও ভগবানে মিলন ঘটিয়া থাকে।

ওমর খৈয়ামের মৃত্যু-তারিখ সাধারণ্যে ৫১৭ হিজরাব্দ (১১২৩-২৪ খৃষ্টাব্দ) বলিয়া প্রচারিত। কিন্তু সমর্থনযোগ্য প্রমাণাভাবে, স্বর্গীয় অধ্যাপক ব্রাউন (E. G. Brown) ঐ তারিখটির সত্যাসত্য সম্বন্ধে সন্দিহান। তাঁহার মতে, ওমরের মৃত্যু ১১১৫—১১৩৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে, অর্থাৎ ১১৩৫ খৃষ্টাব্দেরই অধিকতর নিকটবর্ত্তী সময়ে ঘটিয়া থাকিবে।

কবি হাফেজের মৃত্যুর পর, তাঁহাকে বিধর্ম্মী বিবেচনায় অনেকে "জানাজা" (মৃত্যু-মন্ত্র) পড়িতে অস্বীকার করিয়াছিল বলিয়া শুনা যায়। ওমরের মৃত্যুতে এরূপ দুর্ঘটনা ঘটে নাই। জীবনে তাঁহার শত্রু অনেক ছিল বটে, কিন্তু এই বিষয়ে হাফেজ অপেক্ষা তাঁহাকে ভাগ্যবানই বলিতে হয়।

ওমরের ভবিষ্যদ্বাণী তাঁহার যেরূপ সমাধির ইঙ্গিত করিয়াছিল, মৃত্যুর পর তাঁহার সমাধিটি অবিকল সেইরূপ স্থানেই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। যে স্থানের পুষ্পবৃক্ষ বৎসরে দুইবার করিয়া সমাধিগাত্রে পুষ্প বর্ষণ করিবে, ঠিক সেইরূপ উদ্যানেই ওমরকে সমাধিস্থ করা হয়। এই সমাধিকে উদ্দেশ্য করিয়া ওমরের দেহমুক্ত আত্মা—রোমক-কবি হোরেসের (Horace) উক্তিগুলির অনুসরণে,—আজও বুঝিবা বলিতে পারে—

"...নিঃশেষে কভু হব না লুপ্ত, নিশ্চয় ইহা জানি—
সমাধি-আঁধার, হয়ে যাবে পার, আমার অনেকখানি ;
লাবণ্য লভি', ভাবী-মানবের, খ্যাতির ভিতর দিয়া,
বহু যাবে কাল, বাড়িয়া চলিব যৌবন বিস্তারিয়া।

মানব-কণ্ঠে জাগিব, একটি চির-পরিচিত নাম,—
ইতিহাসে আমি হয়তো প্রথম একযোগে সাধিলাম
জ্যোতিষের সাথে ভেষজ-শাস্ত্র ; বাহ্য-বিরোধ ভুলে,
গণিতে-কাব্যে পরিণয়পাশে বাঁধিলাম প্রাণ-মূলে ।

মৃতের মাঝারে, পরিচিত যা'রা, ছিল আমাদের সনে,
পাব না তাদের, নরকে অথবা নন্দন-উপবনে ;
মিলিব তবু বার বার মোরা, মরণের বাধা টুটে—
মেলে যেথা মৃত,—জীবিত লোকের রক্ত-অধরপুটে ।...

পরিশিষ্ট

রোবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম

শ্রীসুরেশচন্দ্র নন্দী

(১)

জীবের দেহ ছাউনী সম রচিত হয় দুদিন তরে,
রাজ অতিথি আত্মারে সে বসায় বারেক যত্ন করে
রাজ অতিথি বিদায় নিলেই ছাউনীকারী মৃত্যু আসে,
ছাউনী খুলে নে যায় আবার নূতন কোন পান্থবাসে।

(২)

সুদীর্ঘকাল জ্ঞানের তাঁবু সৃজন করি ওমর খৈয়াম
দগ্ধ হ'ল, ধ্বংস হ'ল, লুপ্ত হ'ল তাহার নাম;
জীবন-সূত্র ছিন্ন হ'ল অদৃষ্টেরি অস্ত্রাঘাতে,
বৃথাই সে যে বিক্রী হ'ল মৃত্যুরূপী দালাল হাতে।

(৩)

দোষ নিও না সাধুপুরুষ, মাতালের এই মদ্যপানে;
খোদার দয়া থাকলে মোরাও হ'য়ে যেতাম নিষ্ঠাবান।
[illegible] হে ধর্মধ্বজ, শুন আমার সত্য-বাণী—
[illegible] শতগুণ পাপ সাধুর দ্বারাই হচ্ছে জানি।

(৪)

তোমার আমার আগেও ছিল দিন রজনীর প্রবর্তন
তোমার আমার আগেও ছিল সৌর জগৎ বিবর্তন।
পায়ের তলায় এই যে ধূলি হ'চ্ছে দলন তোমার দ্বারা,
হয়ত' কোন সুন্দরীরই ছিল ইহা নয়ন তারা।

(৫)

খৈয়াম! কেন কেঁদে বেড়াও জীবন তোমার মন্দ ব'লে?
দুখ করে লাভ কিছু নেই, হর্ষ জাগাও মরম তলে।
নিষ্পাপ যে কোথায় তোমার ক্ষমা পাওয়ার অধিকার?
ক্ষমা শুধু পাপীর তরেই—দুঃখ কর পরিহার।

(৬)

সরাপ আনো—সরাপ আনো, হৃদয়ে আজ পূর্ণ জোয়ার,
সুখের হাসি ক্ষণিক রহে স্বপ্ন যথা গ্রীষ্ম নিশার।
জাগো জাগো, জীবনটা তো চলেই যাবে দ্রুতগতি,
যৌবন তো নদীর মতই প্রাপ্ত হবে সরিৎ-পতি।

(৭)

নীতি আমার-সুখের স্রোতে করবে শুধু সন্তরণ,
ধর্ম আমার ত্যাগ করেছে তত্ত্ব জ্ঞানের দ্বন্দ্ব-রণ।
ভার্যা আমার লক্ষ্মী দেবী, যৌতুক তার গেলুম দিতে,
নিলে না সে, বললে শুধু কাল কাটাতে হর্ষ চিত্তে।

(৮)

মসজিদ্ সে তাড়িয়ে দিলে, গির্জা হ'ল শত্রু ঘোর,
হায় রে বিধি! কোন মাটিতে গড়েছ এই চিত্ত মোর?
নষ্ট করি ভণ্ড-সাধু-নষ্ট-রূপা-ভ্রষ্টা-সম
পরকালের সুখের আশা, ইহকালের শান্তি মম।

(৯)

হায় নৈতিক! আমার প্রতি করছ কেন অবিচার
পাপের বোঝা চাপিয়ে ঘাড়ে? দোষ কি আছে অভাগার?
দ্রাক্ষাফল ও স্বর্গ-পরীর মুগ্ধ-কারী আকর্ষণে
টলে বটে চিত্ত আমার, আর ত কিছু পাপ জানি নে।

(১০)

পাপের পাঁকে যাচ্ছি নেমে, আমায় কর উত্তোলন,
ধ্বান্ত-ভরা চিত্তে কর জ্ঞানের বাতি প্রজ্বালন।
কষ্ট করে জয় করতে হয় যদি গো স্বর্গ-দ্বার,
বদান্যতা কোথায় তব? শ্রমের সে ত' পুরস্কার।

(১১)

স্বর্গ-সুখের কিংবা চির-নরক ভোগের আস্বাদন—
অদৃষ্ট মোর কোন্‌টা আছে করতে নারি নির্ধারণ।
পারব না ত করতে তবু স্বর্গ-সুখের আশায় প'ড়ে
প্রণয়, বীণা, মদের বাটী—মর্ত্য-সুখের বিসর্জন।

(১২)

সৃজনকালে আল্লা আমার ভবিষ্যতের কার্যাবলী
জানত সবি পার্‌ত দিতে এক একটি সকল বলি'।
যখনই যা করছি আমি, সে ত কেবল আদেশ তাঁরি,
তবে কেন নরক-ভোগের শাস্তি পাব বুঝতে নারি।

(১৩)

ব্যর্থ জ্ঞানের সেবায় জ্ঞানী, চির জীবন কর্‌লে দান,
অস্তি, নাস্তি—ব্যর্থ বিচার কর্‌ছে তোমার অনুধ্যান।
মস্তিকটি শুষ্ক হ'ল শুষ্ক যথা দ্রাক্ষা ফল,
সময় থাকৃতে আমার মত দ্রাক্ষারসে হও সবল্।

(১৪)

দ্রাক্ষা-সুরা পান করেছি সমস্ত এই জীবন ভোর
অন্ধকার এ কাদের* রাতেও মদ্য-হবে সঙ্গী মোর;
বাহুর ডোরে পাত্রখানির কণ্ঠ করি' আবেষ্টন,
অধরে তার চুম্বনিব, বক্ষে দিব আলিঙ্গন।

(১৫)

একটি হাতে কোরাণ কেতাব, অন্য হাতে মদ্য নিয়ে,
মন্দ-ভালর মধ্যপথে দাঁড়িয়ে গেছি থম্‌থমিয়ে।
সুনীল আকাশ বলছে মোরে "ঘৃণ্য তুমি মুসলমান,
নাই যদিও পুরো দস্তুর অধার্মিকের তুচ্ছ প্রাণ।"

* কাদের—"শক্তি রজনী", যে রাত্রে কোরাণ প্রকটিত হয়।

(১৬)

সমাজদারে সমজ কারে বল্‌ছে মোরে দার্শনিক,
আল্লা জানেন ভাল রকম একটুও তার নয়ক ঠিক ;
দুখের কথা—এইটুকুও নয়ক আমার জ্ঞান-গোচর,
কে আমি হায় ! কেনই এলুম ঘুরতে মিছে পৃথ্বীপর !

(১৭)

পূর্বভাগে উষারাণী ধূম্র রেখা অঙ্ক নিয়ে
হাস্‌ছে যখন, দ্রাক্ষা-বধূর পবিত্র সে রক্ত দিয়ে
পাত্র ভ'রো ! সবাই বলে, "সত্য বড় তিক্ত লাগে,"
এই কথাতেই প্রমাণ হবে—সত্য লোভে মত্ত-রাগে।

(১৮)

মসজিদ্ ও মন্দির হয় একজনেরই স্তবের গান,
সেই সুরেতেই ঘন্টা বাজে গির্জা করি কম্পমান ;
ক্রশের চিহ্ন কোশাকুশী, যা কিছু সব তাঁরই তরে,
বিশ্ব ভরি তাঁরই পূজা ভিন্ন ভাষায় ভিন্ন স্বরে।

(১৯)

অনিচ্ছাতেই পৃথ্বী পরে হ'চ্ছে মোদের যাওয়া-আসা,
খেলার পুতুল যেমন, মোরা তেরি করি হেলায় বাসা !
পেয়ালা সখি, কোমর বাঁধ, পাত্র ভ'রে যোগাও মদ,
ধ্বংস হবে হিংসা ঘৃণা সংসারের ঐ সব আপদ।

(২০)

আল্লা যেদিন আন্‌লে মোরে, সংশয়িত চিত্ত মোর,
জীবন হ'তে বুঝ্‌নু যা, তা ধূম্র শুভ্র ধ্বান্ত ঘোর।
করতে হবে অনিচ্ছাতেই পৃথ্বী হ'তে নির্গমন ;
জানি না হায়! কেনই মিছে আসা, যাওয়া, প্রাণ-ধারণ!

(২১)

হৃদয় আমার শঙ্কাযুত নরক মৃত্যু-ভয়ে,
জীবন-পথের শঙ্কা বেশী মরণ-পারের পথের চেয়ে।
এই জীবন, যা নিমেষ তরে দেছেন মোরে জগৎ-স্বামী,
পরিশোধের সময় হ'লেই ফিরিয়ে দিব তাঁরেই আমি।

(২২)

দ্রাক্ষা-সুধার মহৌষধি দাও আমারে সঙ্গীগণ!
পাণ্ডু-বরণ মুখটি আমার উঠ্‌বে হ'য়ে সুচিক্কণ ;
মৃত্যু হ'লে সিক্ত করি দ্রাক্ষা-সুধার সিঞ্চনেতে,
রক্ষা কর দেহটি মোর দ্রাক্ষা গাছের সিন্দুকেতে।

(২৩)

হস্ত আমার সদাই যেন দ্রাক্ষাবধূর স্পর্শ পায়,
চিত্ত থাকে সুন্দরী সে স্বর্গপরীর আকাঙ্ক্ষায়!
"প্রায়শ্চিত্ত" কয় সকলে "দিবেন তোমায়-জগৎ-স্বামী!
আল্লা নিজে দিলে পরেও পারব না তা করতে আমি।

(২৪)

ভবিষ্যতে কি হবে তাই জানতে ভাবনা ভেবে,
মিছে কেন চিত্তটাকে উদ্বেগেতে ভরিয়ে দেবে ?
দূর ক'রে দাও চিন্তা তব, আল্লা ভাবুন ভাবনা তার ;
অদৃষ্ট সে গড়লে যখন, যুক্তি নিলে কই তোমার ?

(২৫)

বিশ্ব-প্রয়াস ব্যর্থ হ'লে তোমার অনুসন্ধানেতে
অর্থ বল, দৈন্য বল, কিছুই নারে তোমায় পেতে।
তোমা'র কথা সবাই বলে, কেউ শোনে না কেমন তর ;
কেউ দেখে না চক্ষু মেলে, সবার কাছেই বিরাজ কর।

(২৬)

উচ্চতর জীবন-স্তরে করব বলে নীড়-রচনা
ঘুরে ঘুরে শূন্য-পথে কর্‌ছি শুধুই আনা-গোনা।
উচ্চ নীড়ের পথ দেখানে নাই যে কেহ হেথায় ভাই,
যে পথ দিয়ে এলুম হেথা সে পথ দিয়েই পালিয়ে যাই।

(২৭)

এই যে এমন দেহটি মোর, সৃষ্ট তোমার শক্তি-বলে,
যত্ন করে রেখেছ তাই শতেক বরষ জীবন চলে।
সারাটা এই জীবন ধরে পরীক্ষা এই চল্‌ছে মোর—
আমার পাপ কি তোমার ক্ষমা কোন্‌টা হবে অধিক জোর॥

বাঁশরী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৭।

গ্রন্থকার-পরিচিতি

১২৯৭ বঙ্গাব্দের ১৪ই ভাদ্র শুক্রবার পূর্ণিমা তিথিতে রাত্রি ১২টা ৫৩ মিনিটে (খ্রীষ্টীয় ২৯এ আগষ্ট ১৮৯০) প্রাচীন কলকাতায় এক সম্রান্ত পরিবারে সুরেশচন্দ্রের জন্ম হয়। তিনি ভূমিষ্ঠ হন চন্দননগরে মাতুলালয়ে। পিতা অধরচন্দ্র দিল্লীস্থ ডেপুটি কণ্ট্রোলার অফ পোস্ট এণ্ড টেলিগ্রাফস-এর সহকারী অডিট অফিসার ছিলেন। তিনি সাহিত্যানুরাগী ও কাব্যরসিক ছিলেন। দিল্লী প্রবাসকালে কবি হেমচন্দ্রের কাব্য গ্রন্থাবলী তাঁর নিত্যসঙ্গী ছিল। মাতা ভবতারিণী দেবী চন্দননগর-নিবাসী গদাধর পালের কন্যা।

১৯০৯ খ্রীস্টাব্দে ২৩এ জানুয়ারী পিতা অধরচন্দ্রের অকালমৃত্যু ঘটলে সুরেশচন্দ্র ভারত সরকারের ডাক ও তার বিভাগে যোগদান করেন। পিতার জ্যেষ্ঠপুত্র হওয়ায় এই সময় সংসারের সমস্ত দায়িত্বভার তাঁর ওপর পড়ে। বিধবা মা ও ছোট ছোট পাঁচটি ভাই বোনদের নিয়ে এই সময় তিনি অতি কষ্টে দারিদ্র্যের মধ্যে দিন যাপন করেন। ক্রমশ চাকুরীতে উন্নতি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সংসারের সকল অভাব, অনটন ও অসচ্ছলতা দূর হয়; সংসারের সকল দিকে পুনরায় শ্রী ফিরে আসে।

বাল্যকাল থেকেই সুরেশচন্দ্র সাহিত্যানুরাগী। ছাত্রাবস্থাতেই তাঁর কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ রচনা শক্তির উন্মেষ ও বিকাশ ঘটে। সেই সময় থেকেই তাঁর কবিতা ও প্রবন্ধ মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকে। শুধু তাই নয়, এই বয়সেই তিনি 'আশা' (১৩১২-১৩) নামে একখানি মাসিক পত্রিকা সম্পাদনা করেন। তরুণ 'আশা' সম্পাদকের অকৃত্রিম সাহিত্যপ্রীতিতে মুগ্ধ হয়ে বিখ্যাত দার্শনিক পণ্ডিত সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য তাঁকে 'অবসর' (১৩১২—১৪) মাসিক পত্রিকার কার্যালয়ে নিয়ে আসেন। 'অবসর' সম্পাদক সুরেশচন্দ্রকে সহকারী নিযুক্ত করেন। এখানে উল্লেখ্য যে 'অবসর' মাসিকের প্রকৃত সম্পাদক ছিলেন পণ্ডিত সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য,

যাঁর স্নেহচ্ছায়ায় সুরেশচন্দ্র সাহিত্য-সাধনায় প্রেরণা লাভ করেন। শুধু 'অবসর' মাসিকেই নয়, এর পর তিনি নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত সম্পাদিত 'জাহ্নবী' (১৩১৬), নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত ও ফণীন্দ্রনাথ পাল সম্পাদিত 'যমুনা' (১৩১৭), অমূল্যচরণ সেন সম্পাদিত 'অর্ঘ্য' (১৩১৮-২৩), সুরেন্দ্রনাথ রায় সম্পাদিত 'ত্রিবেণী' (১৩২৪), পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'সাহিত্য' (১৩২৮-২৯) প্রভৃতি মাসিক পত্রিকায় সহকারী সম্পাদকের কাজ করেন। এই সমস্ত পত্রিকায় সেই সময় তাঁর অনেক রচনা প্রকাশিত হয়।

'জাহ্নবী' পত্রিকার কার্যালয় ছিল মাণিকতলায় পণ্ডিত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের 'এডওয়ার্ড ইন্‌স্টিটিউশন' নামে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। এটি দিনে ছিল ভাষাশিক্ষার বিদ্যালয়; রাত্রিতে বসত সাহিত্যের আসর। অনেক নবীন প্রবীণ কবি, সাহিত্যিক, পণ্ডিতমণ্ডলী এখানে সন্ধ্যা থেকে সমবেত হতেন। সন্ধ্যা থেকে চলত গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, পঠন-পাঠন ও সাহিত্যিক আলাপ-আলোচনা। 'জাহ্নবী' মাসিক পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হয়ে সুরেশচন্দ্র অচিরে পণ্ডিত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি, পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, চারুচন্দ্র মিত্র, ব্যোমকেশ মুস্তফি, সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বাণীনাথ নন্দী, হরিসাধন মুখোপাধ্যায়, যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, অবিনাশচন্দ্র দাস, যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, মোহিতলাল মজুমদার, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, হেমেন্দ্রকুমার রায় প্রমুখ সমাগত নবীন-প্রবীণ-কবি-সাহিত্যিক পণ্ডিতদের সঙ্গে পরিচিত হন এবং পরে সকলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হন। এই সময় (১৩১৬) সুরেশচন্দ্র তাঁর অভিন্নহৃদয় সুহৃদ কবি বিজয়কৃষ্ণ ঘোষের গীতিকবিতা সংগ্রহ "অশ্রু" কাব্যগ্রন্থটি সম্পাদনা করেন।

কবি বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (পরে 'দীপালী' সম্পাদক) ছিলেন

সেকালের বিখ্যাত মাসিকপত্র 'মানসী' পত্রের অন্যতম সম্পাদক। সুরেশ চন্দ্রের মত বসন্তকুমারও ছিলেন ডাক ও তার বিভাগের পদস্থ কর্মী। সুরেশচন্দ্র তাঁকে অফিস সহকর্মিরূপে পেয়েছিলেন। বসন্তবাবুর পিতামহ বিষ্ণুচরণ চট্টোপাধ্যায় ছিলেন ব্রাহ্ম সমাজের গায়ক। সেই সূত্রে ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ও ঘনিষ্ঠতা ছিল। বিশেষ জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর তাঁকে যথেষ্ট স্নেহ করতেন। কবিবন্ধু বসন্তকুমারের সঙ্গে সুরেশচন্দ্র মাঝে মাঝে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ী যেতেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর সন্দর্শনে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তরুণ লেখক সুরেশচন্দ্রকে বিশেষ প্রীতির চক্ষে দেখতেন। এই সময় তিনি সুরেশচন্দ্রকে গী দে মোপাসাঁ, আলফঁস দোদে প্রমুখ ফরাসী লেখকদের গল্প বাঙলায় অনুবাদ করতে উপদেশ দেন। সেই উপদেশে সুরেশচন্দ্র প্রবাসী, সাহিত্য, বাঁশরী, ত্রিবেণী প্রভৃতি মাসিকে অনেকগুলি ফরাসী গল্পের অনুবাদ করে প্রকাশ করেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল এই গল্পগুলি গ্রন্থাকারে 'পূরবী' নামে প্রকাশ করবেন। এই সংবাদ 'প্রবাসী' পত্রে একাধিক গল্পের পাদ টীকায় প্রকাশিত হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি।

সুবিখ্যাত 'মানসী ও মর্মবাণী' মাসিক পত্রিকার অন্যতম সম্পাদক খ্যাতনামা উপন্যাসকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়-ও ছিলেন সুরেশচন্দ্রের অফিস সহকর্মী। প্রভাতকুমার ভিন্ন বিভাগীয় উচ্চপদস্থ বয়োজ্যেষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও সুরেশচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা হতে দেরি হয়নি। কারণ উভয়েই ছিলেন একই পথের পথিক—সাহিত্যতীর্থের পথযাত্রী। প্রভাত-কুমার একদিন 'মানসী ও মর্মবাণী'র জন্য তাঁর প্রিয় উপন্যাসকার তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের একটি জীবনী লেখার জন্য সুরেশচন্দ্রকে আদেশ-অনুরোধ করেন। এই বিষয়ে তিনি সুরেশচন্দ্রকে বিশেষ সাহায্য ও সহযোগিতা করবেন, এ আশ্বাসও দেন। সেই আদেশ-অনুরোধ ও আশ্বাস বাক্যে

অনুপ্রাণিত হয়ে সুরেশচন্দ্র তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের জীবনী রচনায় হাত দেন। তারকনাথের আত্মীয়-পরিজন, বন্ধু-বান্ধব প্রভৃতির দ্বারে দ্বারে ঘুরে কিছু দিনের মধ্যে তিনি তারকনাথের প্রায় লুপ্ত বিস্মৃত জীবনের অনেক তথ্য সংগ্রহ করতে সক্ষম হন। কয়েক বছরের আপ্রাণ চেষ্টার ফলে তিনি তারকনাথের বিস্তৃত জীবনী রচনা করেন। জীবনী রচনায় যাঁরা তাঁকে সাহায্য ও উৎসাহ দান করেন তাঁদের মধ্যে সাহিত্যাচার্য অক্ষয়চন্দ্র সরকার, স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রসরাজ অমৃতলাল বসু, তারকনাথের সহপাঠী ব্রজলাল চক্রবর্তী (হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বক্তৃতার সংকলক ও প্রকাশক), প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, জলধর সেন, মধুসূদনের জীবনীকার কবি নগেন্দ্রনাথ সোম প্রমুখের নাম স্মরণীয়। জীবনীটি 'মানসী ও মর্মবাণী'তে প্রকাশের কথা ছিল, কিন্তু একটি অপ্রীতিকর ঘটনার জন্য তা সম্ভব হয়নি। এরপর জলধর সেন 'ভারতবর্ষে' প্রকাশ করার মনস্থ করেন, কিন্তু তাও হয়নি। অবশেষে প্রখ্যাত সাংবাদিক ও সাহিত্যিক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের আগ্রহে 'তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়' জীবনীটি ধারাবাহিকভাবে ১৩২৯ সালে 'সাহিত্যে' প্রকাশিত হয়।

পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার থেকে সুরেশচন্দ্র পারস্যের অমর কবি শেখ সাদী-র 'গুলিস্তা' ও 'বুস্তা' কাব্য গ্রন্থ দুটি পাঠ করেন। গুলিস্তা ও বুস্তার নীতি উপদেশপূর্ণ গল্পগুলি পাঠ করে মুগ্ধ হন এবং অনেকগুলি গল্প অনুবাদ করেন। অনূদিত গল্পগুলি 'গুলিস্তার গল্প' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশের ব্যবস্থা করেন। পত্রপত্রিকায় বিজ্ঞাপন পর্যন্ত বেরিয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত কিন্তু এই বইটিও পাঠক সাধারণের মুখদর্শন ঘটে নি।

'গুলিস্তার গল্প'এর ভূমিকা স্বরূপ সুরেশচন্দ্র কবির সংক্ষিপ্ত জীবনী, 'গুলিস্তা' ও 'বুস্তা' কাব্য গ্রন্থদ্বয়ের পরিচয়-মূলক দুটি প্রবন্ধ রচনা করেন। লেখা দুটি মাসিক 'সাহিত্য' পত্রিকায় ১৩২৮ সনে যথাক্রমে ভাদ্র ও মাঘ

সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এই সুলিখিত প্রবন্ধ দুটি পাঠ করে তদানীন্তন বসুমতী-সম্পাদক হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, প্রবাসী-সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, আনন্দবাজার পত্রিকা-সম্পাদক প্রফুল্লকুমার সরকার প্রমুখ সুধী সম্পাদকগণ মুগ্ধ হয়ে প্রবন্ধগুলি সম্পর্কে নিজ নিজ পত্রিকায় প্রশংসা-ব্যঞ্জক মন্তব্য প্রকাশ করে লেখককে অভিনন্দন করেন। সেই উৎসাহে সুরেশচন্দ্র প্রবাসীতে "শেখ সাদীর কসিদা ও গজল,' মাসিক বসুমতীতে 'কবি শেখ সাদী ও তাঁর বুস্তা," ভারতবর্ষে 'গুলিস্তার গুল সৌরভ,' আনন্দবাজার পত্রিকায় 'কবি শেখ সাদী ও রবীন্দ্রনাথ' প্রভৃতি প্রবন্ধ লেখেন। কবি শেখ সাদীর সঙ্গে কবি রবীন্দ্রনাথের তুলনামূলক প্রবন্ধটি পাঠ করে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ আনন্দিত হন এবং একটি পত্রে লেখককে অভিনন্দন জানিয়ে উৎসাহিত করেন। এছাড়া অন্যান্য পত্র-পত্রিকায় তাঁর কবি শেখ সাদীর জীবনকথা সম্পর্কে গবেষণা-মূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।

এই প্রবন্ধগুলি সম্পর্কে প্রখ্যাত সাংবাদিক ও সাহিত্যিক স্বর্গগত পাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায়ের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখেছেন, 'সংস্কৃত, পালি, ফার্সী, ও আরব্য প্রভৃতি আর্যভাষার আলোচনার জন্য এবারকার মেদিনীপুরের সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতি অধ্যাপক ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় হিন্দু মুসলমানকে আহ্বান করিয়াছেন। বড় আনন্দের বিষয় ললিতকুমারের আহ্বানের পূর্ব হইতে শ্রীসুরেশচন্দ্র নন্দী ফার্সী কবির জীবনকথা কাব্যালোচনা করিয়া ভাষা ও সাহিত্যের প্রকৃত উন্নতিকামী হিন্দু ও মুসলমানের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। সাদীর জীবন কথা কাব্য পরিচয়, কসিদা ও গজল সম্বন্ধে সাহিত্য, প্রবাসী প্রভৃতি পত্রে সুরেশচন্দ্র যে কয়টি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, সকলগুলিই মূল্যবান, বঙ্গ সাহিত্যে অপূর্ব, সুচিন্তিত, পাণ্ডিত্যপূর্ণ, প্রথম আলোচনা ও গবেষণামূলক প্রবন্ধ। প্রত্যেক সন্দর্ভে লেখকের পরিশ্রম, তথ্য সংগ্রহ ও দক্ষতার প্রচুর পরিচয়

পাওয়া যায়। তিনিই বাঙ্গলা সাহিত্যে ফার্সী কবি ও অন্যান্য কাব্য-সাহিত্যের আলোচনায় সূত্রপাত করেন।' (সাহিত্য, বৈশাখ ১৩৩৭)।

বঙ্গাব্দ ১৩৩০ সালে ভাদ্র মাসে 'কবি শেখ সাদী' জীবনী গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। বইটির ভূমিকা লেখক ছিলেন আরব্য ও পারস্য ভাষা এবং সাহিত্যে সুপণ্ডিত শামস্-উল-উলমা, খান বাহাদুর অধ্যাপক ডঃ হেদায়েত হোসেন। প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে 'কবি শেখ সাদী' সাহিত্যক্ষেত্রে অভাবনীয় আলোড়ন সৃষ্টি করে। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় সুধী সাহিত্যিক পণ্ডিতমণ্ডলী কর্তৃক অভূতপূর্ব প্রশংসায় অভিনন্দিত হয়। সমালোচক বীরবল (প্রমথ চৌধুরী) গ্রন্থটি সম্পর্কে একটি পত্রে লেখককে লেখেন, "আপনার রচিত 'কবি শেখ সাদী' পেয়েছি। এই বই যে আপনি সাদীর মূল গ্রন্থ আলোচনা করে লিখছেন, এতে আমি যারপর: নাই সুখী হয়েছি। বাঙলা দেশের হিন্দুরা যে ফার্সী পড়েন না, এটা আমার মতে নিতান্তই দুঃখের বিষয়। হিন্দু-মুসলমানের মনের মিল তখনই জন্মাবে যখন আমরা পরস্পরের সাহিত্যকে শ্রদ্ধা করতে শিখব। তাছাড়া ফার্সী ভাষা না শিখলে আমরা মুসলমান যুগের ইতিহাসও লিখতে পারব না। শেখ সাদীর এই জীবনী বাঙালী পাঠক মাত্রেরই পড়া উচিত। আমাদের একটা অন্ধ ধারণা আছে যে মুসলমান সভ্যতা শুধু ক্ষাত্র সভ্যতা। কিন্তু এই সভ্যতার অন্তরে যে একটা মস্ত ব্রাহ্মণ্য সভ্যতা আছে এই ছোট বইখানির ভিতর তার স্পষ্টই পরিচয় পাওয়া যায়।"

ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর (অধুনা জাতীয় গ্রন্থাগার) গ্রন্থের তৎকালীন বর্ণনাত্মক তালিকায়কা বহু ভাষাবিদ পণ্ডিত সুরেন্দ্রনাথ কুমার বলেন, 'The present work has the modest pretension to give within a very small compass a popular exposition and a general survey of the life and works of one of the great poets of

Persian The name of Sadi is not altogether unknown to the literate Bengal and in the modern days of oriental research the songs of the rapt nightingale fo Iran has found a world wide appreciation. We greatly appreciate. the effort made by the author of this little volume to resent the Bengali reading public with a brief survey of the works of the great exponents of the Sufistic poetry. Mr. Nandy exhausts all the sources of information available on the subject."

এরপর সুরেশচন্দ্র পারস্যের অমর কবি-জ্যোতির্বিদ 'ওমর খৈয়াম'এর জীবনী রচনায় হাত দেন। বাঙলা ভাষায় ওমর খৈয়ামের একাধিক অনুবাদ থাকলেও একখানিও ইতিহাসসম্মত জীবনী ছিল না। সুদীর্ঘ চার পাঁচ বছর গভীর অধ্যবসায় সহকারে গবেষণা ও আলোচনার ফলে তিনি 'ওমর খৈয়াম' জীবনী গ্রন্থটি রচনা করেন। এই গ্রন্থের অন্তর্গত প্রবন্ধগুলি যখন 'প্রবাসী,' 'বসুমতী,' 'ভারতবর্ষ' ও 'কল্লোল' প্রভৃতি বিভিন্ন মাসিকে প্রকাশিত হতে থাকে তখনই সুধী সাহিত্যিক পণ্ডিতমহলে বেশ একটু সাড়া পড়ে যায়। প্রবন্ধগুলির উপর আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, স্যর যদুনাথ সরকার, হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, জলধর সেন প্রমুখের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং সেগুলি প্রভূত প্রশংসাধন্য হয়। প্রবন্ধগুলির ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক মূল্য প্রথম ধরা পড়ে সুবিখ্যাত সাংবাদিক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের পাণ্ডিত্যের কষ্টিপাথরে। তিনি বিভিন্ন মাসিক পত্রে প্রকাশিত ওমর খৈয়াম সম্পর্কীয় প্রবন্ধগুলির অংশবিশেষ কখনওবা সম্পূর্ণ প্রবন্ধটিই নিজ সম্পাদিত প্রবাসী পত্রের 'কষ্টিপাথর' বিভাগে প্রকাশ করেন। আর স্যর যদুনাথ সরকার প্রবন্ধগুলি পাঠ করে মুগ্ধ বিস্মিত হয়ে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে গ্রন্থের বিস্তৃত ভূমিকা

লিখে দেন। কবি "শেখ সাদীর" মত "ওমর খৈয়াম"ও সে যুগের কবি সাহিত্যিক সুধী পণ্ডিতমণ্ডলী ও বিখ্যাত পত্র পত্রিকা কর্তৃক অভূতপূর্ব সমাদর ও প্রভূত প্রশংসা লাভে ধন্য হয়। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক স্বর্গত রমেশচন্দ্র মজুমদার বইটি পাঠ করে লিখেছিলেন— "সুরেশচন্দ্র নন্দী প্রণীত ওমর খৈয়াম গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া সুখী হইলাম। বিশ্ববিখ্যাত কবি ওমর খৈয়ামের বহুমুখী প্রতিভার পরিচয় এবং তৎসঙ্গে খোরাসনের ইসলাম সংস্কৃতির এই রূপ বিস্তৃত আলোচনা অন্য কোন গ্রন্থে পড়ি নাই। গ্রন্থখানি বাংলা সাহিত্যের সম্পদ বৃদ্ধি করিয়াছে ইহা অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করি। কবি ওমর খৈয়ামের নাম সুপরিচিত হইলেও তাঁহার সম্বন্ধে যে বহু নূতন তথ্য এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, তাহার জন্য গ্রন্থকারের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করি।"

বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসকার আচার্য শ্রীসুকুমার সেন লিখেছেন, "ওমর খৈয়ামের রুবাই ও জীবনী সম্বন্ধে শিক্ষিত জগতের কৌতূহল অপরিসীম। আমাদের সেই কৌতূহল অনেকটা মিটিয়েছেন স্বর্গত সুরেশচন্দ্র নন্দী এই গ্রন্থটিতে। তিনি এ কাজের সম্পূর্ণ উপযুক্ত ছিলেন। তিনি শেখ সাদী প্রভৃতি গ্রন্থের লেখক, ফারসী কবিতার আলোচনায় ও অনুবাদে সবিশেষ স্বাচ্ছন্দ্য দেখিয়েছিলেন এবং তাঁর সময়ে তিনি একাধিক পত্রিকা সম্পাদনে ও প্রবন্ধ রচনায় কৃতিত্ব দেখিয়ে গিয়েছেন।"

'ওমর খৈয়াম' রচনা শেষ করে সুরেশচন্দ্র বাঙালীর গৌরব অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের বিস্তৃত জীবনী প্রনয়নে মনোনিবেশ করেন। কয়েক বছর গবেষণার ফলে তিনি 'মাসিক বসুমতী' 'হিতবাদী', 'অর্চনা', 'উদয়ন' প্রভৃতি মাসিক পত্রিকায় আট-দশটি প্রবন্ধ রচনা করে প্রকাশ করেন। এই সময় হঠাৎ তাঁকে পারিবারিক নানা কারণে ব্যস্ত থাকতে হয়। ফলে জীবনী রচনা কার্য আর অগ্রসর হয়নি। এর পর দীর্ঘকাল তিনি সাহিত্যজগৎ থেকে সম্পূর্ণ দূরে সরে ছিলেন।

১৯৪৫ খ্রীস্টাব্দের জুলাই মাসে সুরেশচন্দ্র চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণ করেন, এর কিছুকাল পর তিনি বরানগরে নিজ কৃত বাসভবনে স্থায়িভাবে বাস করতে থাকেন। এই সময় তিনি প্রচুর অবসর পান এবং পুনরায় সাহিত্যসেবায় আত্মনিয়োগ করেন। তিনি সাংবাদিক গুরু হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বঙ্গবীর কর্নেল সুরেশ বিশ্বাস, ভারতীয় ভাস্কর্যশিল্পের ইতিহাস, গান্ধার শিল্প, ও অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের জীবনী রচনায় হস্তক্ষেপ করেন। এই সকল গ্রন্থের উপকরণ সংগ্রহের ব্যাপারে তিনি দিনের বেশীর ভাগ সময় জাতীয় গ্রন্থাগারে অতিবাহিত করতেন এবং বাড়ী ফিরে গভীর রাত্রি পর্যন্ত সেইসব উপকরণ অবলম্বনে প্রবন্ধ রচনা কার্যে ব্যাপৃত থাকতেন।

এইভাবে কিছুকাল যাওয়ার পর হঠাৎ তাঁর মানসিক পরিবর্তন ঘটে। একদিন 'উদ্বোধন' অফিসে একজন সন্ন্যাসী বন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। সন্ন্যাসী বন্ধুটি ঐ দিন দীর্ঘ সময় তাঁর সঙ্গে ভক্তি ও ভক্তিশাস্ত্র সম্বন্ধে গভীর আলোচনা করেন এবং পরিশেষে সন্ন্যাসী বন্ধু তাঁকে 'ভক্তিতত্ত্ব' বিষয়ে প্রবন্ধ রচনার জন্য অনুরোধ করেন।

ভক্তিতত্ত্ব বিষয়টি সুরেশচন্দ্রের মনে গভীর ভাবে রেখাপাত করে। তিনি সকল রচনাকার্য পরিত্যাগ করে কেবল মাত্র ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন ও আলোচনায় আত্মনিয়োগ করেন। এর ফলশ্রুতিস্বরূপ কিছু কালের মধ্যেই তিনি বৈদিক শ্রদ্ধা, শ্রদ্ধাবৃত্তি, ভক্তিবৃত্তি, ভক্তিতত্ত্ব, প্রীতিতত্ত্ব, ভীষ্মের শ্রীকৃষ্ণ প্রীতি, মন ও ইন্দ্রিয় এবং বুদ্ধিযোগ প্রভৃতি অধ্যাত্মবিষয়ক দার্শনিক প্রবন্ধ প্রণয়ন করেন। এই সমস্ত প্রবন্ধ তাঁর জীবদ্দশায় ও মৃত্যুর পর 'উদ্বোধন' ও 'মাসিক বসুমতী'তে প্রকাশিত হয়।

বঙ্গাব্দ ১৩৭৩ সালের ৪ঠা মাঘ (ইংরেজী ১৮ই জানুয়ারী ১৯৫৭) সকাল নটার সময় হঠাৎ তিনি সেরিব্রাল থ্রম্বসিস রোগাক্রান্ত হয়ে পরলোক গমন করেন।

নির্দেশিকা